আ লো কি ত

বিক্রমপুর

আ লো কি ত বি ক্র ম পু র

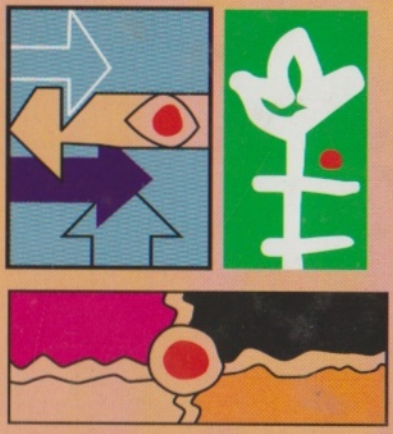

আ লো কি ত বি ক্র ম পু র

আলোকিত বিক্রমপুর

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়া
ইজামুল হক

ফিলিপনগর প্রকাশনী

www.pathagar.com

আলোকিত বিক্রমপুর

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়া
ইজামুল হক

প্রকাশক
মিজানুর রহমান দুলাল

প্রকাশনী সংস্থা
ফিলিপনগর প্রকাশনী

প্রকাশকাল
বই মেলা ২০০২

প্রচ্ছদ
শফিকুল কবীর চন্দন

বর্ণ বিন্যাস
মাসুদুর রহমান
মাসুদ কম্পিউটার্স
৯৩ আরামবাগ, দোতলা, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১০২৫১০, ০১৯ ৩৬০৭৯৪

মুদ্রণে
ডট প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৭১০২০৬৩, ৭১০২০৭৪
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৪২৪৬৩

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

এক ঐতিহাসিক জনপদের নাম বিক্রমপুর। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এই বিক্রমপুর সময়ের প্রয়োজনে অনেক সুসন্তানের জন্ম দিয়েছে। বিক্রমপুরের এই কাদা মাটিতেই জন্মেছে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের মতো আরো অনেক কৃতি সন্তান। আমাদের গর্বের ধন, এদের অনেকের পরিচয়ই আমরা জানিনা। জানিনা তারা কবে, কখন বিক্রমপুরের কোথায় জন্মেছেন। এদের নিয়েই প্রকাশিত হলো আলোকিত বিক্রমপুর।

চেষ্টা করেছি, তার পরও এমন অনেকে বাদ পড়েছেন যাদের শূন্যতা এ আয়োজনকে অনেকটা নিস্প্রভ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। তবে একথা সত্যি যে, আমাদের প্রতি অনেকের আগ্রহও ছিল কম। কারো কারো উদাসীনসতা সত্যি পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। সবকিছুর পরও আমরা বিনীতভাবে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যাদের তুলে ধরা সম্ভব হলো না। সেই সাথে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি খুব শীঘ্রই তাদের নিয়ে বর্ধিত কলবরে আলোচিত বিক্রমপুর আবার প্রকাশিত হবে।

যে বিষয়টি না বল্লেই নয়, বইটির কাজ শুরু হয়েছিল আজ থেকে বছর সাতেক আগে। দীর্ঘ এ সময়ের ব্যবধানে অনেকের তথ্যেই পরিবর্তন এসেছে। এ বিষয়টি আমরা কিছুতেই এড়াতে পারিনি।

আলোকিত বিক্রমপুর নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর একটি কাজ বলা যাবেনা। ক্ষুদ্র এ কাজটি করতে গিয়েও অনেকের সাহয্য সহযোগিতা নিতে হয়েছে। এ ব্যাপারে যাদের অবদান উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন দক্ষ সংগঠক, তরুণ সমাজসেবক ও বিক্রমপুর গণপাঠাগার ও সিজুয়ে কিন্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ শাহ আলম, মাদক বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আহ্বানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট আমিনুর রহমান শিপু, পাকিস্তানী বোরকা হাউজের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মেদ, শ্রীনগর বাবুর দীঘির পাড়ের মোঃ নজরুল ইসলাম, চিত্র কোর্টের মোঃ মনির হোসেন ও কয়কীত্তনের দেওয়ান আঃ আজিজের কথা।

বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব জনাব মিজানুর রহমান দুলাল। এদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন থাকলো।

অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়া
ইজামুল হক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল কাদির খান
ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ডাঃ মোঃ হেদায়েত হোসেন খান
মজিবুর রহমান সিকদার
সবসময় যাদের সহযোগিতা পেয়েছি

www.pathagar.com

যা কিছু নিয়ে আলোকিত বিক্রমপুর

বিক্রমপুর নামকরণের ইতিহাস
বিক্রমপুর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য
যাদের পদধুলিতে ধন্য বিক্রমপুর
বিক্রমপুরের ভৌগলিক পরিচয়

বিক্রমপুরের জলবায়ু, উদ্ভিদ,
অধিবাসী, ধর্ম ও প্রশাসনিক পরিচিতি

বিক্রমপুরের স্থাপত্য কীর্তি মিরকাদিমের ইটের পুল

মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন
দরগাহ বাড়ি মসজিদ

মুঘল আমলের স্থাপত্য কীর্তি
টেঙ্গরশাহী জামে মসজিদ

ইদ্রাকপুর কেল্লা
শ্রীনগরের শ্যামসিদ্ধির মঠ
বিশ্ব বরেণ্য মনীষীর কথা
শিক্ষাক্ষেত্রে বিক্রমপুরের কৃতিত্ব
সাহিত্যে বিক্রমপুরের অবদান
শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনে বিক্রমপুরের অবদান
সাংবাদিকতায় বিক্রমপুর
চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিক্রমপুরের অবদান
উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা
আইন ব্যবসায় বিক্রমপুরের কৃতিত্ব
ক্রিড়াঙ্গনে বিক্রমপুর
রাজনৈতিক অঙ্গনে বিক্রমপুরের অবদান
শিল্প-বাণিজ্য

www.pathagar.com

বিক্রমপুর নামকরণের ইতিহাস

প্রায় পাঁচ হাজার বছর বয়সী বিক্রমপুরের নামকরণ নিয়ে রয়েছে অনেক মতভেদ। কেননা অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বিক্রমপুর নামটি কত শতাব্দীর প্রাচীন তা সঠিক করে বলা মুসকিল হলেও প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন এক জনপদের নাম পাওয়া যায় বিক্রমপুর। যেসময়ে নবদ্বীপ, সোনারগাঁও, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলো সাধারণের নিকট পরিচিত হয়ে উঠেনি তারও বহু পূর্ব থেকেই বিক্রমপুর ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য ও ভাস্কর্য শৈলিতে দেশ-বিদেশে খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেছিল। প্রাচীনকালে নিম্নগাঙ্গেয় অববাহীকায় অসংখ্য নদীর সঙ্গমস্থলে যে অঞ্চলটি বহুল মিঠা পানির স্রোতস্বিনী খাল-বিল, নদ-নদীর জালে আবৃত সেখানেই ছিল প্রাচীন বিক্রমপুরের রাজ্য। প্রাচীন বাংলার বিশাল জলপ্রবাহের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ার জন্য সে যুগে এ অঞ্চলটির ছিল অপরিসীম গুরুত্ব। বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব, নামকরন ও চৌহদ্দি নিয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও এর খ্যাতি কিংবদন্তী তূল্য। বিক্রমপুর নামের সঙ্গে জরিয়ে আছে হাজার কিংবদন্তী। কথিত আছে রাজা বিক্রমাদিত্য দেশ ভ্রমণে বের হয়ে তৎকালীন সাগর তীরবর্তী স্থান বিশেষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানেই তার রাজ্য স্থাপন করেন এবং এর নাম দেন বিক্রমপুর। ১০৭৬ হতে ১১২৬ সালের মধ্যে বিক্রমাদিত্য বিক্রমান্ক নামে বাংলায় এক রাজার কথা জানা যায়। তার সঙ্গে বিক্রমপুর নামোৎপত্তির কোন যোগসুত্র আছে বলে মনে হয়না। কারণ বিক্রমপুর বিভিন্ন তাম্রলিপিতে ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে নবম শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া তিব্বত সংরক্ষণ ও তিব্বত বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্ববরেণ্য মহাপন্ডিত অতীশ দীপঙ্করের জীবন বৃত্তান্ত দু'টি কবিতার মধ্যে বর্ণনা দিয়ছেন অতীশের দু'জন শিষ্য। ব্রোম তোলপা ও ছুলধিম জলবা অতীশের জন্ম স্থান বিক্রমপুর বলে উল্লেখ করেছেন। ভারত উপমহাদেশে মধ্য যুগে নিজের শৌর্য - বির্য বিক্রমের অধিকারী প্রকাশের জন্য অনেক রাজাই নিজের নামের সঙ্গে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছেন। শুধু বিক্রমাদিত্য নামে সুনির্দিষ্ট কোন রাজার নামে নাম করণের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না। আবার অনেকে মনে করেন বিক্রমপুরের বিহার হতেই বিক্রমপুর নামকরণ হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন বিক্রম সেন নামে গৌড়ে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। আর এ নাম হতেই বিক্রমপুর নাম হয়েছে।

পাল সাম্রাজ্যের প্রথম মহারাজা গোপালের পুত্র ধর্মপাল, পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। সেকালে তিনি ভারত বর্ষের ইতিহাসে একমাত্র বাঙালি বীরবিক্রম যোদ্ধা রাজা। যিনি চারদিকে অভিযান চালিয়ে রাজ্য বিস্তার করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ধর্মপাল ৭৭৫ হতে ৮১০ সাল পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। আর এই

www.pathagar.com

ধর্মপালই বাংলাদেশের একমাত্র রাজা, যার অপর নাম ছিল বিক্রমশীল দেব। ধর্মপাল ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তিনি মগধ, বরেন্দ্র ও বঙ্গে তিনটি বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। বিক্রমপুরের কোন এক স্থানে বিক্রমপুরী বিহার নির্মাণ করা তারপক্ষেই সম্ভব। ধর্মপালের অর্থাৎ বিক্রমশীল দেবের নামানুসারেই এ বিক্রমপুরী বিহার বা বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের নিকট জোর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেননা ধর্মপালের নামানুসারে ভারতে মগধে যে বিহার ছিল তার নামও বিক্রমশিল বিহার। পাল শাসন আমলে চারশ বছরের বেশি সময়ই বঙ্গজনপদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল স্বাধীন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিক্রমপুরেরই অংশ বিশেষ।

বিক্রমপুর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য

এমন এক ভূখণ্ডের নাম বিক্রমপুর যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আতিথেয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন যা বিক্রমপুরকে করেছে সমগ্র বিশ্বের কাছে সম্মানিত ও সুপরিচিত।

১৯১৫ সালে লর্ড কারমাইকেল বিক্রমপুর ঘুরে এসে বিক্রমপুর সম্বন্ধে বলেছেন, "বিক্রমপুর আমার নিকট প্রতিভাত হয় স্কটল্যান্ডের মতো, আর ইহার বিখ্যাত সন্তানেরা কর্ম ব্যাপদেশে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।" রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোম্বেল বলেছেন, "হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে দি হোল অব ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। অর্থাৎ বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করছে সম্পূর্ণ ভারত তা চিন্তা করছে আগামীকাল। বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করেই এই মূল্যবান উক্তি করেছিলেন তিনি। সুন্দর বনের ইতিহাস প্রণেতা এএফ এম জলিলের ভাষায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস মূলত বিক্রমপুরের ইতিহাস। বিশিষ্ট সাংবাদিক আলহাজ্ব শামসুল হুদার কথা- বিক্রমপুর হচ্ছে ইতিহাসের একটি খনি। দেশ বরেণ্য সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরীর মতে, "ঐতিহাসিক বিক্রমপুর হচ্ছে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র।" বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসিক জরা সন্ধ তার উপন্যাস লৌহকপাটের এক জায়গায় লিখেছেন, বাংলার রত্ন ভান্ডারে বিক্রমপুর দিয়েছে মনীষী। বিক্রমপুর সম্পর্কে লর্ড কাউন "বিক্রমপুর ইজ টু দি বেস্ট অব ইন্ডিয়া হোয়াট এডিনবার্গ ইজ টু দি বেস্ট অব ইউরোপ।" ঈশ্বর বৈদিক বিক্রমপুরের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : বীরেশ্বর শংকর বসতি ব্রহ্মপুত্র জল কল্লোল বলায়িত বিবিধ মনোহর মন্দির নগরতরু---ভূষিত ও বিবিধ বধুগন সেবিত। বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ যুগে যুগে পৃথিবীর সব দেশে বয়ে নিয়ে গেছেন তাদের জন্মভূমির গৌরব বার্তা। লর্ড কার্জন বিক্রমপুরকে ভারতবর্ষের এডিনবোরা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বিক্রমপুরকে ব্রিটিশ মুকুটের কোহিনূর বলেও

www.pathagar.com

তৃপ্তি পেতে চেয়েছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতবর্ষে বঙ্গভূমি শ্রেষ্ঠ এবং বঙ্গদেশের মধ্যে বিক্রমপুর শ্রেষ্ঠ।

যাদের পদধুলিতে ধন্য বিক্রমপুর

বিক্রমপুরের ইতিহাসের গুরুত্ব বিবেচনা করেই বাংলার এক সময়ের শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং ডি পি আই অব বেঙ্গল জে এম বটমলি এদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বিক্রমপুরের ইতিহাস রাখার বাধ্যতামূলক নির্দেশ দিয়েছিলেন। মিশরে পাঁচ হাজার বছর আগের জনৈক রাজার মমিতে যে মসৃন নীল বস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা সে সময় বিশ্বের একমাত্র বিক্রমপুরেই প্রস্তুত হতো। মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর থেকে রাজধানী প্রথমে সোনারগাঁও এবং পরবর্তীতে ঢাকায় স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এই মানে বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত ছিলো। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই বিক্রমপুর যুগে যুগে দেশ-বিদেশের অনেক গুণি ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করেছে।

যে সব মনীষীদের পদস্পর্শে বিক্রমপুরের মাটি ধন্য হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গৌতম বুদ্ধের নাম।

হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়ের চার খন্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ বিক্রমপুরের ইতিহাসে উল্লেখ আছে, বুদ্ধদেব দু'তিন বার এসেছিলেন এই বিক্রমপুরে। বিক্রমপুরের সাধারণ মানুষের পর্ণ কুটির দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজ শ্রমণদিগকে এরূপ গৃহে বসবাসে উৎসাহিত করেছিলেন। বিক্রমপুরের যে স্থানে বসে তিনি জনগণের কাছে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন পরবর্তীকালে সেখানে বুদ্ধের ৮ ফুট উঁচু একটি প্রস্তুর মূর্তি স্থাপন করা হয়। বলি রাজার আমন্ত্রণে এসেছিলেন অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা মুণি এসেছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি মহাকবি কালিদাস। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে এখানে এসেছিলেন গ্রীকদূত মেঘাস্থিনিশ। এক সময় এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক য়ু এন চুয়াং। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে এসেছিলেন হযরত বাবা আদম শহীদ (রঃ) যিনি এখন আবদুল্লাহপুরের সিপাহী পাড়ায় চির নিদ্রায় শায়িত। বিক্রমপুর সফরে এসে এখানকার পন্ডিতদের মাঝে প্রায় দু'বছর অবস্থান করেছেন শ্রী চৈতন্য। রাজনৈতিক কারণে বারবার আসতে হয়েছে ইশা খাঁ ও মানসিংহকে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন ইংরেজ ভ্রমণকারী রালফফিটক। তিনি এখানকার শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা লিখে গেছেন। ইংরেজ আমলে এসেছেন ডাঃ জেমস ওয়াইজ, জেমস টেলর, উইলিয়াম হান্টার ও ব্রাডলী বার্টের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ। তারা স্টোপেটিস্টিক্যাল একাউন্স অব ঢাকা ডিস্ট্রিক, পল্লী বাংলার ইতিহাস, টপোগ্রামী অব ঢাকা, দি রোমাঞ্চ অব এন ইস্টার্ন ক্যাপিটাল প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্রমপুর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিক্রমপুরের মাটিতে পা রেখেছেন বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী, একে ফজলুল হক, মওলানা আকরাম খাঁ, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আকরাম খাঁ, আবুল হাশেম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার, আতাউর রহমান খান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা।

কাজী নজরুল ইসলাম, কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, লর্ড কারমাইকেলের মতো সনাম ধন্য ব্যক্তিত্ব ও এসেছেন এই বিক্রমপুরে।

বিক্রমপুরের ভৌগলিক পরিচয়

রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কারণ ও পদ্মার ভাঙনের ফলে বিক্রমপুরের মানচিত্র বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন বিক্রমপুরের সীমা ছিল বিস্তৃত। আদিকালে বিক্রমপুর এলাকা বলতে বর্তমান ঢাকা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দক্ষিণাঞ্চল মিলেই বিক্রমপুরের সীমানা ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত নদ-নদীর ভাঙনে বিক্রমপুর কতটুকু রয়েছে তা আদি এবং বর্তমান মানচিত্র পাশপাশি রাখলেই বুঝা যায়। পূর্বে বিক্রমপুরের পরিধি ছিল অনেক বড়। কালক্রমে নদী ভাঙনের ফলে সেই পরিধি সংকুচিত হয়ে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বর্তমানে উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পদ্মা এবং পূর্বে মেঘনা এই চতুর্সীমার অন্তর্গত ভুখন্ডই বিক্রমপুর হিসাবে চিহ্নিত। পদ্মা ও ধলেশ্বরীর ভাঙনে প্রতি বছর যে হারে ভূখন্ড নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাতে আশংকা করা হচ্ছে বর্তমান বিক্রমপুরের কতটুকু টিকে থাকবে। গত কয়েক শত বছরে নদ-নদীর ভাঙনে কত সমৃদ্ধ পল্লী, কত হাট-বাজার, গঞ্জ, বাড়ী,ঘর, মসজিদ, মন্দির, মঠ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ কত এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তার হিসাব মিলানো কঠিন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই বিক্রমপুরের সীমা পরিবর্তন হয়নি। নদ-নদীর গতি পরিবর্তন ছাড়াও হিন্দু বৌদ্ধ, রাজাদের রাজত্ব কালে, পাঠান মোঘল, বিভিন্ন মুসলমান শাসনামলে এবং পরবর্তীতে ইংরেজদের রাজত্বকালে বিভিন্ন সময়ে বিক্রমপুরের সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে পদ্মা এবং আড়িয়াল বিলের অপর পারে দোহার গালিমপুরের প্রভৃতি স্থান ও দক্ষিণে ইদিনপুর। বর্তমান অবকাঠামোয় গজারিয়া থানা ও মন্সীগঞ্জ সদর থানার পূর্বাংশ মুন্সীগঞ্জ জেলা তথা বিক্রমপুরের সঙ্গেই সন্নিবেশিত রয়েছে। তাই পূর্বে মেঘনা নদীর পরিবর্তনে চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলা বলতে হবে। উত্তরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা। পশ্চিমে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার থানা এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী। মুন্সীগঞ্জ জেলার ছয়টি থানা নিয়েই বর্তমান বিক্রমপুর চিহ্নিত।

www.pathagar.com

বিক্রমপুরের জলবায়ু, উদ্ভিদ, অধিবাসী, ধর্ম ও প্রশাসনিক পরিচিতি

জলবায়ু ঃ বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থানের জলবায়ুই উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্য সম্মত। **এখানকার** জলবায়ু প্রধানত গ্রীষ্মকালে আর্দ্র এবং শীতকালে শুষ্ক থাকে। তবে ঋতু বিশেষে এখানকার জলবায়ুর মাঝে মধ্যে পরির্তন ঘটে থাকে। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত বিক্রমপুরের সব স্থানেই প্রায় একই রকম পরিলক্ষিত হয়। ফলে জীবন যাত্রার মান প্রায় একই রকম। বিক্রমপুর পদ্মা, মেঘনা, ইছামতি ও ধলেশ্বরী বিধৌত নদী বেষ্টিত বলে বিক্রমপুরের জনগন গ্রীষ্মকালিন মৌসুমি বায়ুর সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করে থাকে। এসব নদ-নদীর তীরে বিক্রমপুরের যে সকল জনপদ রয়েছে সেখানকার জলবায়ু সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই অনুকূল।

বিক্রমপুরবাসির জীবন জীবিকা : বিক্রমপুরের জনসাধারণের পেশা কৃষি ও ব্যবসায়ী প্রধান। এছাড়া প্রাচীন কাল থেকেই এলাকার অধিবাসীরা বহুমুখী পেশার সন্ধানে বেরিয়ে গেছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কৃষি ও ব্যবসা এই দুই প্রকার পেশা ছাড়াও চাকুরিজীবির সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তাছাড়া এলাকা বিশেষে বিভিন্ন পেশার লোকও রয়েছে বিক্রমপুরে প্রচুর। এদের মধ্যে জেলে, বেদে, কুমার, ছুতার, কামার, শংখবণিক, কাসারী, স্বর্ণশিল্পী, তাতী, পাটিয়াল, শীল ও ধোপাসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন নিয়োজিত রয়েছে স্ব স্ব পেশায়। চাকুরিজীবিদের মধ্যেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পদ দখল করে আছে বিক্রমপুরবাসী। বিমান বাহিনী, সামরিক বাহিনী ও নৌ-বাহিনীতেও বিক্রমপুরের বেশ কিছু কৃতি সন্তান গুরুত্বপূর্ণ পদে বিক্রমপুরের মুখ উজ্জল থেকে উজ্জলতর করেছে।

বিক্রমপুরের কৃষি: বিক্রমপুর এলাকার অর্থনীতি প্রধানত কৃষিভিত্তিক। অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও জনসংখ্যার আধিক্য খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীল। বিক্রমপুর মূলত রবিশস্যের এলাকা বলেই চিহ্নিত। এখানকার প্রধান ফসল হলো আলু। সারা বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক আলু এখানেই উৎপাদন হয়। তাছাড়া ধান, পাট, বিভিন্ন জাতের ডাল, শীতকালীন শাক-সব্জি পান, সরিষা, মরিচ, তিল ও তিসির চাষ হয়। একটি জনপ্রিয় প্রবাদ আছে রামপালের কলা, ধাইদার ভাংগি গাওদিয়ার পটল, পদ্মার ইলিশ লৌহজং এর ঘোল এবং মিরকাদিমের মিষ্টির জুরি নেই।

বিক্রমপুরের যাতায়াত : বিক্রমপুরের প্রধান সমস্যা হলো যাতায়াত ব্যবস্থা। চারদিকে নদী বেষ্টিত হওয়ায় এবং এর ভিতরে জালের মত ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খাল বিল থাকার কারনে এখানকার যাতায়াত নৌকা এবং মোটর লঞ্চের ওপরই অধিকাংশ

www.pathagar.com

সময় নির্ভর করতে হয়। যে সড়কগুলো রয়েছে তার অধিকংশ বিপদজ্জন অবস্থা বিরাজ করছে। শুধু ঢাকা খুলনা মহাসড়কে ধলেশ্বরী ১ ও ২ সেতু নির্মিত হওয়ায় ঢাকা মাওয়া সড়কে উন্নয়ন হয়েছে। সরকার পদ্মা সেতু নির্মানের উদ্যেগ গ্রহন করেছে। অপরদিকে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর সেতু নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যেই এ সেতুর সয়েল টেস্টের পুর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে এ দুটি সেতু নির্মিত হলে বিক্রমপুরের যাতায়াতে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হবে বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন।

ধর্মীয় পরিচিতি ঃ পাল শাসন আমলে চারশ বছরের বেশি সময়ই বঙ্গজনপদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল স্বাধীন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিক্রমপুরেরই অংশ বিশেষ। পাল শাসন আমলে বিক্রমপুর থেকে হিন্দু ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ ছিল রাষ্ট্রধর্ম। পাল বংশ পতনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নামনিশানা বিক্রমপুর থেকে এমনভাবে মুছে যায় যে, কোন কালেই এর অস্তিত্ব আর কখনো টের পাওয়া যায়নি। কিভাবে বিক্রমপুর থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হয়েছিল এবং সেন রাজ বংশের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল সে সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কিছুই জানা যায় না। কিংবদন্তী মতে, পাল শাসনের দূর্বল মুহূর্তে আদিশুর বাহু বলে বৌদ্ধ রাজাদের বিতাড়িত করে বিক্রমপুরে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ভারতের কনৌজ শহর থেকে পাঁচটি ব্রাহ্মণ পরিবার এনে বিক্রমপুরে বাহ্মণ্যবর্ণের সংস্কার সাধনের জন্য আদিশুর খ্যাতি অর্জন করেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে রাজধানী রামপালে এনে তাদের পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। সেই গ্রাম আজও পঞ্চসার নামে খ্যাত। কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে যে, সে পাঁচ ব্রাহ্মণ রামপাল দীঘির উত্তর তীরে অবস্থিত একটি গজারী গাছকে তাদের আশীর্বাদ দিয়েছিল সে গজারী গাছের অংশ বিশেষ এখনও আছে। উল্লেখ্য যে, এ গজারী গাছের সারা বিক্রমপুরে এত খ্যাতি ছিল যা লোকমুখে ছড়িয়ে আছে আজও। প্রতিবছর এখানে একটি মেলারও আয়োজন হতো এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেয়েরা নানা উপলক্ষে তাতে অর্ঘ্য দিত। সেন বংশ সম্বন্ধে জানা যায় যে, সেন বংশের বল্লাল সেন (১), বীর সেন, সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন, (২) এবং লক্ষণ সেন রাজত্ব করেছে। সেন বংশের খ্যাতিমান রাজা বল্লাল সেন নিজ রাজ্যে কৌলীণ্য প্রথার সৃষ্টি করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি এক ডোম কন্যাকে বিবাহ করে রাজধানীতে আনলে তার পুত্র লক্ষণ সেনের সাথে তার বিরোধ হয় এবং এতে ব্রাহ্মনরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বল্লাল সেনের পর লক্ষণ সেন রাজা হন এবং লক্ষণাবতিতে তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করতে থাকেন। এরই এক সময় ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী অতর্কীতে তার রাজধানী আক্রমন করলে তিনি পরাজিত হয়ে পালিয়ে বিক্রমপুরে চলে আসেন। আদিশুরের পর বল্লালসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। বিক্রমপুরের রাজাদের মধ্যে তার খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। তাকে কেন্দ্র করে বহু কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। এসব

www.pathagar.com

কিংবদন্তী এখনও বিক্রমপুরে বেঁচে আছে। তার খ্যাতি এত বিপুল ও বহুদূর বিস্তৃত ছিল যা এখনো লোক মুখে প্রচার হয়ে আসছে। এই সেন বংশে দুজন বল্লাল সেন নামের রাজা ছিলেন। তাদের একজন আদিশুরের পুত্র বল্লাল সেন, অপরজন এই বংশেরই বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন শেষ রাজা। বিক্রমপুরের সেন রাজবংশের শেষ রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল রামপাল। তিনি বহু ইমারত ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং দীঘি খনন করেছিলেন। রামপালের রাজধানীতে আজও তার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়। প্রায় তিন হাজার বর্গফুট এলাকা জুরে তার রাজধানী গড়ে উঠেছিল। দু'শ থেকে তিন'শ বর্গ ফুট চওড়া পরিখা বেষ্টিত এ রাজধানীর একটি মাত্র প্রবেশ পথ ছিল। পরিখা ঘেরা এ রাজধানী যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে এখন ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কথিত আছে যে, বল্লাল সেন জনৈক মুসলিম সাধক বাবা আদমের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেও ভাগ্য দোষে পরিবার পরিজন সহ জলন্ত অগ্নিকুন্ডে আত্মাহুতি দেন। কিংবদন্তীর মতে বল্লাল সেনের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে বিক্রমপুরের হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। সেনবংশ অবসানের পর বিক্রমপুর মূলত সামন্ত ভূস্বামী ও জমিদাররাই শাসন করতে থাকেন। পাঠান রাজত্বের অবসান ও বারো ভূইয়ার চাঁদ রায়, কেদার রায়ের পর বিক্রমপুরে মোঘল রাজত্বের সূচনা হয় এবং বিক্রমপুর একটি মহাল বা পরগনায় পরিণত হয়।

প্রশাসনিক পরিচয়ঃ বিক্রমপুর মোঘল শাসন আমল থেকেই একজন ফৌজদার থাকতেন। মোঘলদের সময় মুন্সি হায়দার হোসেন নামে একজন ফৌজদারের নামেই মুন্সীগঞ্জ নামকরণ হয় বলে অনেক ঐতিহাসিকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার মুন্সি এনায়েত আলীর নামানুসারে মুন্সিগঞ্জ নামকরণ করা হয়েছে বলে অপর একটি অভিমত রয়েছে। মুন্সি এনায়েত আলী রাম পালের অর্ন্তগত কাজী কসবা গ্রামের একজন জমিদার ছিলেন। তার ছিল এক পুত্র তিন কন্যা। ইদ্রাকপুর মুন্সী এনায়েত আলি সাহেবের জমিদারির অন্তর্ভূক্ত বলে এর নাম মুন্সিগঞ্জ নামে অভিহিত হয় এবং ব্রিটিশ আমলে রাজত্ব বিভাগের সকল নকসা, পর্চা মৌজা, খতিয়ান, দস্তাবেজ এবং সরকারি সকল সেরেস্তায় মুন্সিগঞ্জ নামেই দেখা যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন বজ্রযোগিনী, ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামের মুন্সী উপাধি হিন্দু জমিদারদেরকে কেন্দ্র করেই মুন্সিগঞ্জের নামোৎপত্তি হয়। এ সম্পর্কে সঠিক কোন ব্যাখা পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৭৬৫ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শাসন কায়েম করে এবং জেলাকে কেন্দ্র করে শাসন কাঠামো রচনা করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই এ জেলার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তার আঙ্গিক ছিল কিছুটা ভিন্নতর। স্থানীয় প্রশাসন তখন আমির, ফৌজদার ও কাজীর উপর ন্যাস্ত ছিল বলে এ তিন কর্তৃপক্ষের ছিল তিন রকম ভৌগলিক সীমানা। আমিন বা তহশিলদের সীমানাকে বলা হতো পরগনা। আইন-

www.pathagar.com

শৃঙ্খালা রক্ষাকারী ফৌজদারি এলাকাকে বলা হতো জেলা। অবশ্য পরগনা সরকার জেলা ছিল একে অপরের ভিতর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক হিমাংশু মোহন ভিন্নতর পদ্ধতির কথা উল্লেখ্য করেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্ভূক্ত ১৮১১ সালে মি. ডে ঢাকার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর এবং ডান কেনসন প্রথম জর্জ নিযুক্ত হন। তাদের সময় থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর প্রশাসনিকভাবে পৃথক হয়ে যায়। ১৮৬৬-৬৭ সালে প্রশাসনিক বিন্যাস হয় মহকুমা মুন্সীগঞ্জ চৌকি : ১) নারায়ণগঞ্জ ২) বহর থানা, ১) নারায়ণগঞ্জ ২) রাজবাড়ী ৩) শ্রীনগর ফড়ি খানা: ১) বৈদ্যের বাজার ২) রোহিতপুর ৩) মুন্সীগঞ্জ। কোম্পানি সরকার চেষ্টা করে পরবর্তী পর্যায়ে পরগনা সরকার উঠিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র জেলাকে আঞ্চলিক প্রশাসন ইউনিট করে প্রশাসনিক কাজ চালিয়ে যান। হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলাকে সর্ব প্রথম ১৯ টি জেলায় সমন্বিত করেন।

কোম্পনি শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে জেলাগুলোকে মহকুমায় ভাগ করা হয়। বর্ধিষ্ণু গ্রাম জনপদ, গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানে ছোট খাট শহর, হাট বাজার ও বন্দর এলাকাকে কেন্দ্র করেই এসব মহকুমা সদর গড়ে উঠে। এভাবেই ১৮৪৫ সালের মে মাসে মুন্সীগঞ্জে একটি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নারায়ণগঞ্জ থানাটিও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৮২ সালে নারায়ণগঞ্জ থানা মুন্সীগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। বিক্রমপুর তথা মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় প্রথম মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর, রাজবাড়ী এবং মুলফতগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৯ সালে পদ্মার গতি পরিবর্তনের ফলে বিক্রমপুরের দক্ষিণ বিক্রমপুর বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ বিক্রমপুরে রাজবাড়ী মুলফতগঞ্জ থানা মুন্সীগঞ্জ মহকুমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। অবশিস্ট মুন্সিগঞ্জ ও শ্রীনগর থানা দুটি ১৯১৪- ১৫ সালের দিকে পাঁচটি থানায় পূণর্বিন্যাস হয়ে মুন্সীগঞ্জ সদর, টঙ্গীবাড়ী, লৌহজং, শ্রীনগর এবং সিরাজদিখান থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেঘনার রূপান্তরে ভৌগলিকভাবে গজারিয়া অঞ্চলটি মুন্সীগঞ্জের নিকটতম হওয়ায় ভারত বিভাগের পর তৎকালিন পাকিস্তানী আমলের শুরুতেই মহকুমার প্রসাশনিক অন্তর্ভূক্ত হয়। ফলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা থানার সংখ্যা দাড়ায় ৬টি। বর্তমানে এ ৬ টি থানা নিয়ে গঠিত মুন্সীগঞ্জ জেলার লোক সংখ্যা দাড়ায় বাংলাদেশ আদম শুমারি ১৯৯১ সূত্র মতে ১১,৮৮,৩৮৭ জন, আয়তন ৯৫৫ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৪৪ জন, শিক্ষার হার ৩৫.৭% ইউনিয়নের সংখ্যা ৭০ টি, মৌজার সংখ্যা ৬৬২ টি, গ্রামের সংখ্যা ৯৫৭টি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মহকুমাগুলোকে মান উন্নীত করে জেলায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নতুন জেলার নাম বিক্রমপুর রেখে বিক্রমপুরবাসীর লালিত স্বপ্নকে সফল করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ রাষ্ট্রপতি এরশাদ মুন্সীগঞ্জ মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করেন এবং বিক্রমপুরবাসী তাদের প্রতি প্রাচীন

www.pathagar.com

নামটি হারিয়ে ফেলেন। এভাবেই বিক্রমপুর নামটি সরকারী নথিপত্র থেকে আড়াল হয়ে যায়।

শস্য ও উদ্ভিদ ঃ নদী পরিবেষ্টিত হওয়াতে বিক্রমপুরের উর্বরা শক্তি খুবই বেশি। প্রতি বর্ষায় এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমানে পলি জমে। এখানে ধান পাট সহ বিভিন্ন রকম রবি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে কৃষকদিগকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করে। এ অঞ্চলের উৎপাদিত আলু দেশে সর্বত্র চলে যায়। ভূমির উর্বরতার কারণে এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী হয়ে ওঠে। অবশ্য বর্তমানে বিক্রমপুরবাসীর প্রধান পেশা ব্যবসা। যারা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল তারাই কেবল কৃষি কাজে নিয়োজিত আছে।

উদ্ভিদের মধ্যে আম, জাম, কাঠাল, নারিকেল, সুপারী, বড়ই, গাব, তেতুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে তুলা চাষ নাই বললেই চলে। ফলে বাইরে থেকে তুলা আমদানি করতে হয়। আম গাছ শুধু ফলের চাহিদাই মিটায় না এর কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করা হয়।

অধিবাসী ও ধর্ম ঃ অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় আকার আয়তনের তুলনায় বিক্রমপুরের লোক সংখ্যা অধিক। এর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অধিক মনে হতো। অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন শ্রেণীই পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দুরা বিক্রমপুরের আদি অধিবাসী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কোন সময়ে তারা এ ভুখন্ডে আগমন করেছে তা নির্ণয় করা সুকঠিন। হিন্দুদের মধ্যে আবার বৈদ্য ও শুদ্র সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হতে অধিকতর। দ্বিজ নিচয়ের অধিকাংশই যাজন ব্যবসায়ী। কায়স্থ ও শুদ্ররা বেশ চাকরি প্রিয়। বিদ্যা, বুদ্ধি ও চাকরিতে হিন্দুরা বেশ এগিয়ে ছিল। বল্লাল ভূপতি হিন্দুদের মধ্যে যাদের আচরণ নবগুণ বিশিষ্ট মনে করতেন তাদেরকে তিনি কুলিন উপাধিতে ভূষিত করে গেছেন।

হিন্দুদের মধ্যে যারা কুলিন হিসেবে পরিচিত তাদের সাথে সাধারণের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্ভব ছিল না। কিন্তু একবার যারা তাদের উদর পূর্ণ করিয়া একটি ক্রিয়া করাতে পারতেন তিনি ক্ষমতাশালী সকলের নিকট সম্মানভাজন হতেন। এদের প্রণয় স্থাপন ছিল অর্থের জন্য। এক সময় কৌলিন্য প্রথা অনেকেরই জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানের কোন কোন মহাপুরুষ ধন কার্যে বিমোহিত হয়ে শত শত কুলবালার পানি গ্রহণ করে কিছুকাল পর তাদের পরিত্যাগ করত। তৎসময়ে কৌলিন্য প্রথার এতটা প্রাধান্য ছিল যে, কুল ভয়ে পঞ্চদর্শী এক সুন্দরীকেও এক অশতীপর বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করা হতো। ফলে এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে শত শত মেয়ের বৈধব্য বরণ করতে হতো।

www.pathagar.com

হিন্দুদের আরেক শ্রেণীর লোক ছিল যারা ঘটক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। পরের গুণকীর্তন ইহাদের একমাত্র জীবিকা ছিল। এরা কুলীনদিগের বংশাবলী গ্রন্থাকারে লিখে রাখতো। তখনকার সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কঠিন ও কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল। কেউ যদি অন্য ধর্মের আলাপ করত, তাকে নানা প্রকার অবমাননা সহ্য করতে হতো। এমনকি তাকে দেশান্তর করাও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। প্রাচীন সম্প্রদায়ের দ্বিজ গ্রামের মধ্যে কোন মহাত্ব এমন গোড়া ছিল যে, তারা চর্ম পাদুকা ও সেলাই বস্ত্র ব্যবহারে ঘৃণা বোধ করতো। বচন সর্বস্ব সংস্কৃত ব্যবসায়ী টোলের পন্ডিতগণ এ শ্রেণীর লোক। এরা আসামবাসীদিগের ন্যায় পেন্টুলন পরিধান এবং তাদেরকে প্রণাম না করাতে ধর্ম চ্যুতির লক্ষণ মনে করতেন। আধুনিককালে এইসব ধর্মীয় গোড়ামী থেকে হিন্দু ধর্ম অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

এককালে বিক্রমপুরবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা ছিল এক চতুর্থাংশ। এদের অধিকাংশের জীবিকাই ছিল কৃষি। দু'একজন পারশী ও দু'একজন মুন্সী মানুষ দেখা গেলেও প্রায় সকলেই ছিল বিদ্যাশিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ। চাষাবাদ গোচারণ ও হালচালনাই নিজেদের গুণাবলী বলে মনে করতেন। কেউ কেউ ব্যবসাকে প্রিয় মনে করলেও বিদ্যাশিক্ষার অভাবে তাতে বেশি দূর উন্নতি লাভ করতে পারেনি। তাই অধিকাংশ মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল।

হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি খৃষ্টানরাও বিক্রমপুরের আদি অধিবাসী। প্রাচীণ আমলের দু'একটি গীর্জা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের স্মৃতি ধারণ করে আছে। এরা ধর্ম বিস্মৃত হয়ে যায় নাই। তারা প্রতিদিন প্রাতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে উপাসনায় মিলিত হতো।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন ও অন্যান্য কারণে বর্তমানে বিক্রমপুরে হিন্দুদের সংখ্যা কমে আসছে। উচ্চবৃত্তের হিন্দুরা প্রায় এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মুসললমানদের মধ্যেও উচ্চবৃত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে অবস্থান নেওয়াতে বিক্রমপুরের স্থায়ী জনসংখ্যা ক্রমই কমে যাচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই বিক্রমপুরের শিল্প উৎকৃষ্টতার প্রমাণ রেখে আসছে। এখানকার কর্মকার, স্বর্ণকার নিজস্ব নিপূণতার জন্য জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করেছে। এ কথা স্বীকার্য যে, বিক্রমপুরের স্বর্ণকারের দ্বারাই ঢাকা নগরী বিশেষভাবে খ্যাত। সাম্যসিদ্ধি ও ষোলঘরের কর্মকারদের উৎকৃষ্টতা অনেকেই স্বীকার করে থাকেন। এখানকার তাম্র, পিতল, টিন ও লৌহময় বস্তু অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কম প্রশংসনীয় ছিল না। বিক্রমপুরের কাষ্ঠ নির্মিত পদার্থ অনেকের কাছে আদরনীয়।

www.pathagar.com

বিক্রমপুরের স্থাপত্য কীর্তি মিরকাদিমের ইটের পুল

বিক্রমপুরের অসংখ্য স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে মিরকাদিমের ইটের পুল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যা পুলঘাটার 'ইটেরপুল' নামে খ্যাত। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত বিক্রমপুরের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহারাজ হরিবর্ম ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহন করেন। বর্তমান বিক্রমপুরের রামপাল গ্রামের পশ্চিমে সুখবাসপুর নামক গ্রামে হরিবর্মনের রাজধানী ছিল বলে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডা. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মত প্রকাশ করেছেন। মহারাজ হরিবর্মের স্বীয় রাজধানী হতে তার মাতা পদব্রজে কাশি যাওয়ার মনোবাসনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে দু'টি ইট নির্মিত ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তিতে অপরূপ দু'টি পুল নির্মান করেন। একটি মিরকাদিম খালের উপর এবং অপরটি তালতলা খালের উপর। কাশি যাওয়ার জন্য তিনি একটি রাস্তাও তৈরি করেন। যা এ ব্রিজ থেকে সোজা পশ্চিমমূখী হয়ে তালতলা ব্রীজ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং ব্রিজের অপর প্রান্ত থেকে রাস্তাটি আরো অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে ধলেশ্বরী নদীর ভাঙনে তালতলার পুলটি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। কিন্তু আব্দুল্লাপুর মৌজার মিরকাদিম খালের উপর আটশ বছরের প্রাচীন পুলটি আজও যাত্রী পারাপারের সাক্ষী হয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের অপরূপ কীর্তি বহন করে চলেছে। এ পুলটি একশ তিয়াত্তর ফুট লম্বা। এ পুলটির দু'পাশে তিনটি করে ছয়টি খিলান আছে। মধ্যের খিলানটি আঠাশ ফুট উঁচু। চৌদ্দ ফুট চওড়া ও বাকী দুটির একটি সাত ফুট তিন ইঞ্চি এবং অপরটি সতের ফুট উঁচু। প্রতিটি খিলান ছয় ফুট পুরু। এ পুলটি খুবই উচু এবং পৃষ্ঠদেশ মসৃন বিধায় বৃষ্টি হলেই লোক চলাচল বিপদসঙ্কুল হয়ে পরে। ফলে পুরাকীর্তি সংরক্ষন ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থানীয় লোকজনের অনুরোধে পুলটির দ'পাশে রেলিং সংলগ্ন দু'ফুট প্রশস্ত করে লোকজন চলাচলের সহায়ক হিসেবে দু'টি সিঁড়ি পথ তৈরি করে দিয়েছে। বর্তমানে এ পুলটি দিয়ে লোক চলাচল ছাড়া ট্যাক্সি ও রিকশা যাতায়াত করে থাকে। তাই পুলটি রক্ষণাবেক্ষন এবং সংস্কার সাধন করা এখন অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পরেছে। পুলটির ভিত্তি খুবই মজবুত এবং জাফরি ইটের খিলানো পদ্ধতিতে তৈরি। তাই স্থাপত্যগুলো অনেক সেন রাজত্বের সম-সাময়িক কালের বলে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ ধারণা করেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ এ পুল দু'টি বল্লাল সেনের জনহিতকর কর্মের অনন্য কীর্তি বলেও উল্লেখ করেছেন। ইষ্টক নির্মিত এ পুলটি কালের সাক্ষী হয়ে অদ্যাবধি দাঁড়িয়ে। পুলটির পূর্বদিকের মধ্যভাগে একটি বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। আর দিন দিন এ ফাটলের পরিমান বেড়েই চলেছে।

www.pathagar.com

পুলের কেন্দ্রীয় দু'টি খিলানের মাঝ দিয়ে অসংখ্য ইঞ্জিন চালিত ট্রলার চলাচল করে থাকে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যাতায়াত করার লক্ষ্যে ট্রলার চলাচলের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ফলে পুলটির মধ্যভাগের খিলান গুলোর উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে তা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খিলানগুলোর রক্ষার জন্য যে লোহার বেড়ি দিয়েছিল তা অনেক আগেই ট্রলারের আঘাতে ভেঙে গেছে। ফলে নৌযানের আঘাতে খিলানগালোর ক্ষতি সাধিত হচ্ছে পর্যায়ক্রমে। বর্তমানে জরুরীভাবে নৌযানগুলো থেকে এ খিলানগুলো রক্ষা করা না হলে অচিরেই খিলানগুলো ধসে পুরো পুলটিই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন দরগাহ বাড়ি মসজিদ

বিক্রমপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপশি ধর্মীয় ইতিহাসও কম সমৃদ্ধ নয়। গগনচুম্বি মঠ, মন্দিরের সঙ্গে মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব কারুকার্জ মন্ডিত মসজিদের ইমারতও লক্ষ্য করা যায় কোথাও কোথাও। তেমনি বিক্রমপুরের মুন্সীগঞ্জ উপজেলার রামপালের অদূরে কাজী কসবা গ্রামে রয়েছে বঙ্গীয় মুসলিম ইতিহাসের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম মসজিদ 'বাবা আদম মসজিদ'। ঐতিহাসিকরা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করেছেন ভারতের সর্ব প্রথম বৃহৎ মসজিদ এই বাবা আদম মসজিদ। মসজিদের গায়ে যে বিশাল শিলালিপি পাওয়া গেছে প্রখ্যাত ভাষাবিদ পন্ডিত হরিনাথ দে এম এ মহাশয় তার র্মম উদঘাটন করেন। উক্ত শিলালিপির অনুবাদ "আল্লাহ সর্বশক্তিমান"। এই জামে মসজিদ সুলতান আমলে জালাল উদ্দিন আবু মুজাফর সাহর পুত্র মহান মালিক কাফুর তৈরি করেন। সুলতান জালাল উদ্দিন আবু মুজাফর শাহ ছিলেন বাদশা মোঃ শাহের পুত্র। হিজরি ৮৮৮ সালে ও ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে রমজান মাসের মধ্য সময়ে তৈরী করা হয় এই মসজিদ। এ মসজিদটি ইতিহাসে বাবা আদম মসজিদ নামে খ্যাত।

বাবা আদম মসজিদটির গঠন শৈলী খুবই মনোরম এবং সুন্দর। বাংলায় মুসলিম আমলে পাতলা পোড়া ইট দিয়ে তৈরী নানা কারুকার্জে অলংকৃত করা হয়েছে। মসজিদটি তেতাল্লিশ ফুট দৈর্ঘ এবং ছত্রিশ ফুট প্রস্থ। এর পূর্ব প্রান্তে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের গম্বুজগুলোর চুড়া অন্যান্য মসজিদের মতোই। আটকোণা বিশিষ্ট চারটি বুরুজ ইটের গাথুনি দিয়ে মজবুত করা হয়েছে। মসজিদের উপরের অংশ খাজ কাটা নকশায় অংকিত। মসজিদের ভিতরের মধ্য ভাগে দু'টি শ্বেত পাথরের অত্যন্ত দৃঢ় স্তম্ভ রয়েছে। যা স্থানীয় লোকজনের মনে ভয় মিশ্রিত অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় লোকজন এ দু'টি স্তম্ভকে বল্লাল সেনের গাদা বলে অভিহিত করে থাকেন। বেশীর

www.pathagar.com

ভাগ লোক একে মামা ভাগ্নের স্তম্ভ বলেও উল্লেখ্য করে থাকেন। একসময় বর্ষাকালে এ স্তম্ভ দু'টি থেকে শ্বেতবিন্দু নির্গত হতো। কথিত আছে হিন্দু রমনিরা এ মসজিদে এসে স্তম্ভ দু'টি প্রণাম করতো। এক সময় ভুমিকম্পে এই মসজিদের বেশকিছু অংশ নষ্ট হয়ে পড়ে। পড়ে তা সংস্কার করা হয়। এ ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি ঢাকা যাদু ঘর ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহন করেছে। শুধু প্রাচীনত্বের দিক থেকেই নয় পূন্যস্মৃতিবাহী বাবা আদমের এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে এক হৃদয় বিদারক ইতিহাস। এ ইতিহাসের পেছনে রয়েছে এক হৃদয়স্পর্শী ধর্মীয় বিশ্বাসে ভরপুর অভিনব ঘটনাবহুল কাহিনী। যার নামে এই মসজিদটি নির্মাণ হয়েছে সেই বাবা আদম (রাঃ) বাংলাদেশের মুসলমানদের ভিত্তিমূল রচনা করেছিলেন তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা। তার পরবর্তী সময়ে হযরত শাহ জালাল (রাঃ) হজরত শাহ আলি বোগদাদি (রাঃ) সহ চট্টগ্রাম বার আউলিয়া ও অন্যান্য বুজুরগানেদীন পূর্ববাংলায় ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে রেনেসাঁর সৃষ্টি করেছেন। তাদের পথিকৃত ছিলেন হযরত বাবা আদম (রাঃ)। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রচারক হিসেবে হযরত বাবা আদম (রাঃ) এক ঐতিহাসিক মহাপুরুষ। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এফবি ব্রাডলে বার্ট ও জেমস ওয়াইজ তাকে বাংলার প্রাক মুসলিম যুগের বিখ্যাত আউলিয়া এবং অতিশয় আধ্যাত্বিক ক্ষমতা সম্পন্ন দরবেশ বলেও উল্লেখ করেছেন। কবে কখন হযরত বাবা আদম (রাঃ) এদেশে এসেছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত বাবা আদম (রাঃ) আগমন সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল হযরত সুলতান ইব্রাহীম বলখী মাহী সাওয়ার (রাঃ) সাহেবের মহাস্থানগড় বিজয়ের কয়েক যুগ পরে বিক্রমপুরে বল্লাল সেন নামক এক হিন্দু রাজার আবির্ভাব ঘটে এবং সে সময়ই হযরত বাবা আদম (রাঃ) এদেশে আসেন। অসীম আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন হযরত বাবা আদম (রাঃ) এর মুজাহিদ বাহিনীর সাথে ঘটনা চক্রে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েই বিক্রমপুরে সেন বংশীয় শাসনের অবসান ঘটে।

বঙ্গ ভারতে উৎকট তান্ত্রিক গুরুবাদের প্রভাব ছিল এক সময়। কালী সেবা, রুরাপায়ী তান্ত্রিকবাদের বিভৎস নরবলির ভয়ে যখন সারাদেশ আতঙ্কগ্রস্ত, সে সময় অলৌকিক শক্তিশালি সুফি বাবা আদমের দলটি এদেশে আগমন করে। তাদের নিকট তান্ত্রিকদের মারণ, উচাটন ও বশীকরণ সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র নিস্ফল প্রমাণিত হয়। তারা আউলিয়াদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব অলৌকিক দৃশ্য দেখে তখন অনেক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। এভাবে সুফি সাধকের প্রভাবে এদেশের তান্ত্রিক শক্তি বিলুপ্ত হয় এবং ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয়। বিক্রমপুরের খানকা ছিল ধীপুরে। এই খানকার ধর্মাধক্ষ্য মজদুস আল-মওয়াস সিস এর- ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আব্দুল্লাহপুর নিবাসী নিঃস্তান হেলাল উদ্দিনের মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রদান করলে সে প্রাণ ভয়ে স্বপরিবারে দেশ ত্যাগ করে। সম্ভবত গরু জবাই করার উৎসাহ প্রদানের আপরাধেই ধীপুর খানকার কর্মাধ্যক্ষ মখদুম আল

www.pathagar.com

মাওয়াস সিসকে বল্লাল কারারুদ্ধ করায় বিক্রমপুরে ইসলাম প্রচার ব্যহত হয়। কথিত আছে রাজা ঈর্ষান্বিত আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে ১১৭৩ সালে বাবা আদম বিক্রমপুর আগমন করেন এবং খানকা বল্লাল বাড়ির সন্নিকটে কাজী কসবা গ্রামে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। বল্লালের প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা করে খানকা নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বল্লালের শতাধিক লাঠিয়াল খানকা নির্মাণকারীদের উপর আক্রমন চালায়। কিংবদন্তীতে জানা যায়, লাঠিয়ালদের আক্রমনের সময় সহসা প্রবল ধুলিঝড় ওঠে। ধুলিঝরের কবলে পরে সরদার ভীমদাশ সহ শিসেস শিস্য সোবায়েমের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ও শুশ্রুষার ফলে মৃত্যু পথযাত্রী লাঠিয়ালগণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় এবং সম্পুর্ণ সুস্থ হয়। লাঠিয়ালগণকে বল্লাল বাড়ি ফেরত পাঠানোর সময় ভীমদাস চিৎকার করে জানায়, ইসলামের শুশিতল ছায়া ছেরে তার কোন লাঠিয়াল ঐ নরক বাসে যাবে না। লাঠিয়ালদেরকে ইসলামি শিক্ষা দেয়া হলো। করোতোয়া নদীর তীরবর্তী মহাস্থানে উগ্র নামক শিবলিঙ্গ রক্ষিত মন্দিরের পুরোহিত বল্লাল সেনের দ্বারা বিতারিত হয়ে বাবা আদমের আশ্রয় নিয়েছেলেন। তিনি ও তার ভাগনি মাধুরী সেন ইসলামের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলামী দীক্ষা গ্রহন করেন। কথিত আছে মানিকেশ্বর গ্রামে খানকা নির্মাণের পরের বছর ১১৭৪ সালে গউসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ)-এর অষ্টম মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গরু জবাই করা হয়। ত্রিবেনী খানকার ধর্মাধ্যক্ষ শহীদ মুয়াবিন আল বসরী এই অনুষ্ঠান পরিচালনার পুরোধায় ছিলেন। গরুজবেহ করার অপরাধে শহীদ মুয়াবিন আল-বসরীকে জয়পানির আদেশ দিয়ে অন্ধ কুপে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। অন্ধ কুপের নিচ থেকে শহীদ মুয়াবিন আল বসরীর আর্তস্বর ভেসে আসে 'তৌহিদের বাণি' প্রচারের দুর্বার গতি রোধ করা যাবেনা। এটা সর্বকালের সর্বব্যাপী আল্লাহর অমোঘ বিধান'। সম্ভবত মগদুম আল মওয়াসসিস অন্ধকুপে নিক্ষেপ করে এই হত্যার প্রতিবাদে মুসলমানদের সংগঠিত করেন বল্লালের বিরুদ্ধে। ব্যাটল অব কানাইচং এর বর্ণনা মতে, নৌবাহিনী মিলিয়ে বাবা আদমের ফৌজ সংখ্যা ছিল সাত হাজার এবং বল্লালের ফৌজ সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। কানাই চং ময়দানে একটানা ১৩ দিন রক্তক্ষয়ী প্রাণান্ত যুদ্ধে বল্লালের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমনের মুখে দিশেহারা বল্লাল সেন রক্তক্ষয় রোধের জন্য বাবা আদমকে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব দেন। সেনাপতি ইরশাদুদ দীন মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের প্রাক্কালে দুর্বিনীত বল্লালের কুচক্রী প্রস্তাব প্রত্যাখান করার জন্য বাবা আদমকে অনুরোধ জানান। কিন্তু রক্তক্ষয় রোধের জন্য সরল বিশ্বাসে বাবা আদম বল্লালের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেন। যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ পেয়ে বল্লালের সেনাপতি সুখসেন অবশিষ্ট সৈন্যসহ শিবিরে ফিরে যান। ১১৭৮ সালে ২০ সে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতির দিন খানকা শরিফে বাবা আদম এশার নামাজান্তে মোরাকাবায় তন্ময় ছিলেন। তখন বল্লাল হীন মতলব চরিতার্থে পেছন দিক থেকে তরবারি দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকেন। কিন্তু

www.pathagar.com

তরবারির কোন আঘাতই বাবা আদমের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। মৃত্যুর অন্তিম সময় নিকটবর্তী ভেবে বাবা আদম বল্লালকে উদ্দেশ্য করে বললেন বির্ধমীর তরবারি আমার শোণিত স্পর্শ করবেনা। এসময় তার নিজের তরবারি ধারণ করতে নির্দেশ দেন। বল্লাল সহসা বাবা আদমের তরবারি তুলে নিয়ে সজোরে আঘাত করে বাবা আদমের শিরশ্ছেদ করেন। বল্লাল শোণিত ধোয়ার জন্য নিকটতম সরোবরে নামে। এই সময় তার পৌষ্য কবুতর বস্ত্রাভ্যন্তর হতে উড়ে যায় রাজ প্রাসাদে। কবুতর ফিরে আসায় প্রাসাদের সকল লোকজন রাজা পরাজিত হয়েছেন ভেবে আগে থেকেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে প্রাণ বির্সজন দেয়। বল্লাল পরিবারের অগ্নিদাহের কুন্ডলীকৃত কালো ধোয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। শোকে মূহ্যমান বল্লালের কানে ধ্বনিত হল বাবা আদমের অন্তিম শয্যার কথাগুলো 'তৌহিদের শাশ্বত বাণী প্রচার আল্লাহর ইচ্ছা। আর তা কখানো ব্যাহত হতে পারেনা।' যুগে, যুগে এমনি ভাবে ধ্বংস স্তুপের উপর তৌহিদের ঝান্ডা উড়বেই। স্ত্রী, পুত্র পরিজন হারিয়ে বল্লাল সেনও অগ্নিকুন্ডে প্রান বির্সজন দেয়। এমনিভাবে সত্যের জয় হল। কথিত আছে কানাই যুদ্ধে বাবা আদমের সহযোগী বার আউলিয়ার মধ্যে শাহবন্দেগী গাযী দেওয়ান, গাযী রহমত, গাযী আশাদ্দল আকাবিয়া এবং গাযী রিফাতুদ দ্বীন শিরজানী যুদ্ধ বিজয়ের পর মহাস্থান গড়ে গিয়ে আস্তানা করে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। বাবা আদমের খানকা শরীফেই তাকে দাফন করা হয়।

মুঘল আমলের স্থাপত্য কীর্তি টেঙ্গরশাহী জামে মসজিদ

ঐতিহ্যবাহী বিক্রমপুরের হাজারো ঐতিহ্য আর অসংখ্য স্থাপনার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার অন্তর্গত মিরকাদিম পৌর সভার টেঙ্গর গ্রামের শাহী জামে মসজিদটি একটি অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি। এই মসজিদটি মুঘল আমলে ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পাঠান সুলতান কররানীর শাসন নামলে মালেক আব্দুল্লাহ নামক জনৈক কাজী নির্মাণ করেন।

বিক্রমপুরে পাল বংশের শাসনামলে বিক্রমপুর থেকে হিন্দু ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে রাষ্ট্র ধর্ম বৌদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পাল বংশ পতনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নাম নিশানা বিক্রমপুর থেকে মুছে যায়। এমনি ভাবে মুছে যায় যেন কোন কালেই এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পাল বংশের পতনের পর সেন রাজ বংশ উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল সে সম্পর্কে আইন-ই আকবরীতে উল্লেখ রয়েছে। সেন বংশীয় রাজাদের সর্ব

www.pathagar.com

শেষ রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল রামপাল। কোন এক কিংবদন্তী ঘটনার মধ্য দিয়ে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মুসিলম রাজত্বের আবির্ভাব হয়। সেন বংশের অবসানের পর বিক্রমপুর মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত ভূস্বামী ও জমিদাররাই শাসন করতে থাকে। বিক্রমপুরে পাঠান রাজত্বের অবসান ও বার ভূইয়া, চাঁদ রায়, কেদার রায়ের পরাজয়ের পর বিক্রমপুরে মুঘল রাজত্বের সূচনা হয়। তখন সমস্ত বিক্রমপুর একটি মহাল বা পরগনায় পরিণত হয়। তৎকালীন সময়ে বিক্রমপুর জেলার অস্তিত্ব ছিল, তবে আঙ্গিক ছিল কিছুটা ভিন্ন। আঞ্চলিক তথা স্থানীয় প্রশাসন তখন অমির, ফৌজদার ও কাজীর উপর ন্যস্ত ছিল। কাজীর এলাকাকে বলা হতো জেলা। কাজী ছিলেন জেলা প্রধান।

১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ৯৭৬ হিজরী সালে পাঠান সুলতান তাজখান কররানীর রাজত্বকালে মালিক আব্দুল্লাহ নামক জনৈক কাজী টেঙ্গরশাহী জামে মসজিদটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে একটি প্রাচীর বেষ্টিত ভূমিতে এ মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের পূর্বে চারটি, পশ্চিমে চারটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে দু'টি করে মোট বারটি খিলানের উপর মসজিদটি নির্মিত। মসজিদের দেয়াল সাতষট্টি ইঞ্চি পুরু চর্তুদিকে বেষ্টিত একটি মজবুত স্থাপনা। বর্গাকৃতি এই মসজিদের প্রতিটি বাহু দুশ তিয়াত্তর ইঞ্চি। বহির্ভাগে প্রতিটি বাহু চার'শ সাত ইঞ্চি বিদ্যমান। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের মূল আকর্ষণ গম্বুজেই অনেকটা নিহিত রয়েছে। মসজিদের মূল কাঠামো উপরিভাগে এক হাজার ছাপ্পান্ন ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট গম্বুজটির ভিত্তি ছয়'শ ইঞ্চি একটি অবকাঠামোর ওপর দন্ডায়মান। গম্বুজের মূল মসজিদের উপরিভাগ থেকে দু'শ পঞ্চাশ ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন। এটির সর্বোচ্চ শিখরে একটি কারুকার্য মন্ডিত শিখর দন্ড বিদ্যমান। গম্বুজের উপরের গোলার্ধে ও নিচের অংশে চিনামটির মধ্য যুগের কারুকাজ এখনো চোখে পড়ে। মসজিদের মূল স্থাপনা মাটি থেকে মাটির তলদেশে ভিত্তি প্রায় দেড়শ ইঞ্চি। ভূপৃষ্ঠ থেকে গম্বুজ পর্যন্ত মসজিদের উচ্চতা চারশত ছাপ্পান্ন ইঞ্চি। মসজিদের ভিতরে বর্গাকৃতি অবকাঠামোতে এক একটি খিলানের নব্বই ইঞ্চি উপর থেকে গম্বুজের স্থাপনা শৈলি পর্যায়ক্রমে গম্বুজের কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। অপরূপ কারুকার্যমন্ডিত মসজিদের ভিতরে মধ্যযুগীয় ত্রিভুজাকৃতির বরফিকায় শোভা লক্ষ্যনীয়। পূর্বদিকে মসজিদের একটি মাত্র প্রবেশ পথ রয়েছে। দু'পাশে দু'টি করে জানালা এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে আরো মোট দু'টি জানালা রয়েছে। মসজিদের ভিতরের পশ্চিম দিকে মধ্যভাগে একটি বড় মিম্বর এবং দু'পাশে অনুরূপ দু'টি ছোট মিম্বর রয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে জানালার দু'প্রান্তে দু'টি করে মোট চারটি চুড়ঙ্গী রয়েছে। এগুলোতে মসজিদের সংরক্ষিত কোরআন, কিতাব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এ জামে মসজিদটি সুদীর্ঘকাল থেকে স্থানীয় মুসল্লিদের একমাত্র নামাজ আদায়ের পীঠস্থান। প্রতিদিন অসংখ্য লোক এখানে নামাজ আদায় করে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকেও ঐতিহ্যবাহী এ মসজিদটি দেখার জন্য বহুলোকের সমাগম ঘটে।

www.pathagar.com

ইদ্রাকপুর কেল্লা

ঐতিহাসিক ইদ্রাকপুর কেল্লা বিক্রমপুরের আরো একটি প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যদের দমন এবং বাংলার রাজধানী ঢাকাকে দস্যুদের আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য ১৬৬০ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবেদার মীর জুমলা এই দুর্গটি নির্মাণ করেন। ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত এ কেল্লাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

টেইলর তার বিখ্যাত গ্রন্থ টপোগ্রাফি অব ঢাকায় এ দুর্গটির কথা উল্লেখ করে গেছেন। দুর্গটি ইদ্রাকপুর কেল্লা নামে পরিচিত। কোন শক্তিশালী ফৌজদারের নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ করা হয় ইদ্রাকপুর। বর্তমানে জনসাধারন দুর্গটিকে এই নামেই চিহ্নিত করেছে। দুর্গটি সংস্কারের সময় দুর্গটির দক্ষিণ-পূর্ব দেয়ালে ইংরেজিতে ইদ্রাকপুর কোর্ট কথাটি লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকদের মতে কোন মুসলমান জমিদারের পদবী হতে এ নামের উদ্ভব হয়েছে। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে মি. টেইলর মুন্সীগঞ্জে আসেন এবং দুর্গ পরির্দশন করেন। তখন দুর্গটির পাশ দিয়ে ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিত হতো। তিনি দুর্গ সংলগ্ন ঘাট এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইদ্রাকপুর তৎকালে পূর্ববাংলার একটি বিশেষ বন্দর ছিল। দুর্গটি মুন্সীগঞ্জ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য এর প্রতিটি ইট কাঠের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। রক্ষিত কীর্তি হওয়া সত্বেও রক্ষণা-বেক্ষনের অভাবে এ দুর্গটির সম্পুর্ণ অবয়ব অক্ষত নেই। অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। দুর্গের প্রধান অংশটুকু আজও দাঁড়িয়ে আছে সময়ের সাক্ষি হয়ে। প্রাচীর বেষ্টিত এ অংশটুকু দেখে সহজেই বোঝা যায় এটি একটি দূর্গ। দূর্গটি মূলত মুন্সীগঞ্জ শহরের একটি উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত। দুর্গটির চারদিকে আগে কি ছিল তা জানা নেই। কিন্তু বর্তমানে দুর্গটির উত্তরে, পূর্ব-পশ্চিমে একটি রাস্তা চলে গেছে। দক্ষিণে গ্রাম পূর্বে শহীদ ময়দান পশ্চিমে সরকারি এভিজি এম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। দূর্গের সম্পূর্ণ অংশ এখন আর নেই। যে অংশটুকু অবশিস্ট আছে তা সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি সম্পূর্ণ দূর্গের মতই মনে হয়। ১৯০৭-১০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন মহকুমা হাকিম শ্রী সুরেশ চন্দ্র শিং মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দুর্গের এ অংশের সংস্কার করা হয়।

এর উত্তরে ও পশ্চিমে আধ মাইল পর্যন্ত সৈন্যবাসের উপযুক্ত নাতিদীর্ঘ কুঠুরি ও অট্টালিকার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো এর পরও দুর্গ আরো প্রসারিত ছিল। দুর্গের বর্তমান ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীর শ্রেনীর অস্তিত্ব যদি সম্পুর্ণ ধ্বংশ হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতের

www.pathagar.com

মানুষ এ দুর্গটি যে এত দীর্ঘ প্রসারিত ছিল তা বিশ্বাসই করবে না। এ থেকেই বুঝা যায় দুর্গটি বর্তমান অবস্থার চেয়েও আরো অনেক বড় ছিল। দূর্গটি ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত তবে পূর্বে ইছামতি নদী বর্তমানে তা ধলেশ্বরী নামে পরিচিত। ইছামতি নামটির কোন ব্যবহারই এখন আর নেই। সর্বগ্রাসী নদী দুর্গটি গ্রাস করার জন্য থাবা উদ্যত করেছিল : কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে নদীতে চড় পড়ে যাওয়ায় ঐতিহ্যবাহী দুর্গটি রক্ষা পায়।

দুগর্টির দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তা খুবই আধুনিক বলে প্রতীয়মান হয়। এ দুর্গ এলাকার মাটির মাঝে বালুর ভাগই বেশি। এতে প্রমাণিত হয় যে দুর্গটি এক সময় নদী তীরবর্তী এলাকায় ছিল। এখন নদীটি দুর্গ থেকে বহু দুরে সরে এসছে।

দুর্গটির বর্তমান অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে যখন দুর্গটি অক্ষত ছিল তখন বর্তমান অংশটি মূল দুর্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। দুর্গের মধ্যভাগে মসজিদ আছে। আনুমানিক আশি পঁচাশি বছর পূর্বে এর সংস্কার করা হয়েছিল। দুর্গের চারদিকে পরিখা বেষ্টিত ছিল তা এখনও স্পষ্ট বোঝা যায়। এর পূর্ব দিকের পরিখার উপস্থিতি এখনও বিদ্যমান আছে। তবে পরিখা থেকে তা রূপান্তরিত হয়েছে একটি পুকুরে। এই জলাসয় থেকেই দুর্গের পূর্ব দিকের প্রাচীর উত্থিত হয়েছে। দুর্গটির চারিধার মজবুত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের শীর্ষভাগ পদ্ম পাপড়ির মতো। তার মাঝে রয়েছে ছিদ্র। ঐ ছিদ্র মুখে কামান বন্দুকের নল স্থাপন করা হতো। দুর্গটি বর্তমানে যে উচ্চতায় অবস্থান করছে পূর্বে তার চেয়ে বেশি উচুঁ ছিল। প্রাচীন দুর্গটি যুগ যুগ ধরে মাটির নিচে বসে যাচ্ছে। দুর্গটির চার কোণে প্রাচীর সংলগ্ন বৃত্তাকার চারটি মঞ্চ রয়েছে। এই মঞ্চগুলোর দেয়ালও ছিদ্রযুক্ত। এই অংশের প্রাচীর উচ্চতায় বার ফুট এবং পূর্বাংশের উচ্চতা মাটিতে দেবে তিন ফুটে পরিণত হয়েছে। এই উঁচু মঞ্চগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এই মঞ্চগুলো হতে শত্রুর নৌবহর পর্যবেক্ষণ করা সহজ ছিল। দুর্গটির চারধারে প্রাচীর এক গজ পুরু এবং এর উপরিভাগ সমতল না হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ধ বৃত্তাকারে সংঘবদ্ধ হয়েছে। এই দুর্গের প্রবেশ পথ একটি। দ্বারটি দুর্গের উত্তরদিকে অবস্থিত। এই তোরণ উচ্চতায় তের ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে সাত ফুট। এ দুর্গটি নিতান্তই সামরিক শৈলীতে নির্মিত। এতে স্থাপত্য সৌন্দর্যের তেমন নির্দশন না থাকলেও এর গঠন প্রণালী অত্যন্ত দৃঢ়। তদুপরি এর মাঝে এমন একটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য রয়েছে যা অনন্য।

দুর্গটির মাঝে পূর্বদিকে ইটের তৈরী একটি টিলা আছে। এই টিলা পূর্বে খুবই উচুঁ ছিল। এর উপর হতে প্রহরিরা শত্রু পক্ষের রণতরীর আগমন লক্ষ্য করতো। এই টিলাটিও ক্রমশ মাটির নিচে প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে টিলাটির উচ্চতা ষোল গজ। অনেকেই মনে করেন দুর্গটির একাধিক তল ছিল। সে তলগুলো ক্রমশঃ মাটির নিচে দেবে গেছে ।

www.pathagar.com

একাধিক তলা থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। কারণ সামরিক দিক থেকে এ দূর্গটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এস্থানেই শত্রু পক্ষের সাথে প্রথম সাক্ষাত ঘটত। তাই প্রথম দর্শনেই শত্রুকে উচিৎ শিক্ষা দেবার মতো প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্র এবং গোলা বারুদ মজুদ রাখার জন্য একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই দুর্গ থেকেই আফগান, মগ, ফিরিঙ্গি ও আরাকানী প্রভৃতি শত্রুদের আগমন প্রতিহত করা হতো। সুতরাং এখানে এটি স্বল্প আয়তনের দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন মীর জুমলা। এ টিলাটির গঠন প্রণালি অত্যন্ত সুন্দর। এরূপ সুউচ্চ ইটের তৈরী টিলাটি দেখতে বৃত্তাকার। আরোহনের জন্য টিলাটিতে বিশাল সোপান শ্রেণী রয়েছে। সোপানমালা টিলা থেকে এসে একটি ছোট জলাশয়ে শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য সোপান শ্রেণী পশ্চিম মুখি। আর দুর্গের সিংহ দ্বার উত্তর মুখি। এ সোপান শ্রেণী কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত। একটি স্তর শেষ হবার পর আরেকটি বিশাল সোপান। তারপর আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার সোপান গুচ্ছ। পরবর্তী পর্যায়ে আরেকটি বিশাল সোপান। এভাবে সোপান মালা নির্মিত হয়েছে। সোপানের দু'টি দ্বারই উচুঁ। টিলার উপরিভাগ খিলানের ওপর স্থাপিত। পূর্বে টিলাটিতে শূন্য গর্ত ছিল। পরে তা বিষাক্ত শাপের আবাস স্থলে পরিণত হলে মাটি ও বালি দ্বারা গর্তটি পূরন করা হয়। টিলার মধ্যে প্রবেশের একটি মাত্র দ্বার ছিল। দুর্গটির সংস্কারের সময় ঐ দ্বারটিও বন্ধ করে দেয়া হয়। ঐ টিলা থেকে তলদেশ পর্যন্ত সিঁড়ি ছিল। কিন্তু এ টিলার আয়তন কত বড় হবে তা আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এই টিলার ব্যাস হবে ২৫ গজ। এ টিলাটিতে অস্ত্র সস্ত্র এবং ধনরত্ন রক্ষিত হত বলে অনেকেই ধারনা করেন। সে জন্য টিলাটিকে দুর্গ ক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে স্থাপন করা হয়। কিংবদন্তী এইযে, এ টিলার মধ্যে বিশাল ধনাগার ছিল। সোপানাবলি সংলগ্ন উত্তর দিকে একটি গোলাকৃতির কুঠুরি আছে। অনেকেই মনে করেন ঐ কুঠুরীতে বারুদ সঞ্চিত থাকত। টিলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নিম্ন আয়তনের এক সরু সিঁড়ি পথ আছে। এই গুপ্ত দ্বারটি নির্মাণ করার পেছনে তাদের নিশ্চই কোন উদ্দেশ্য ছিল। অনেকেই মনে করেন,হঠাৎ কোন সময় আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলে এই গুপ্ত পথ দিয়ে পলায়ন খুবই সহজ ছিল। যে দুর্গ একদিন শত শত সৈন্যের হুঙ্কারে গর্জে উঠত গোলা বর্ষী কামানের গগন বিদারি শব্দে এবং অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মুখরিত ছিল আজ তা সরকারি কর্মচারীদের আবাসস্থল, জেলখানা এবং পুলিশ কোয়ার্টারে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে মুন্সীগঞ্জে যখন মহকুমা স্থাপিত হয় তখন এ দুর্গ ছিল পরিত্যক্ত এবং অবহেলিত। সময়ের বিবর্তনে সব পাল্টে গেছে।

বর্তমানে তা সংস্কার হয়ে মনোরম আবাসে পরিণত হয়েছে। ইদ্রাকপুরের ভৌগলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বুঝা যায় বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীকে নৌ আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গ নির্মাণ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মীর জুমলা উক্ত স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে তাই উচ্চমানের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান

www.pathagar.com

করেছেন। কেননা ইদ্রাকপুর, মেঘনা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষা এই তিন নদীর মাঝখান দিয়ে শত্রু যেভাবেই আগমন করুক না কেন তাদেরকে ইদ্রাকপুর কেল্লার অতন্দ্র প্রহরীদের সম্মখীন হতেই হবে। কারণ পূর্ববাংলা নদী বহুল দেশ। তাই পূর্ববাংলা আক্রমন করতে হলে শত্রুদের নৌ যুদ্ধের সম্মুখীন হতেই হবে। ঢাকা নগরীর সুরক্ষিত এলাকা ছাড়াও দুর্গ স্থাপনের আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদেশ্য ছিল। মগ ও আফগানীরা সুযোগ পেলেই পূর্ববাংলার উপর হামলা চালাত। পূর্ব বাংলার নদী তীরবর্তী এলাকায় ফিরিঙ্গি ও মগদের অত্যাচার, উৎপীরন, লুণ্ঠণ হরহামেসাই করতো। এদেরকে দমন করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহন করতে হতো। এই বর্বর দস্যুদের সমুচিত শাস্তি দেবার উদেশ্যে ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে দুটি দুর্গ স্থাপন করাই মীর জুমলার আরো একটি উদেশ্য। তবে জলদস্যুদের আক্রমন প্রতিহত করাই এই স্থানে নির্মাণের সর্ব প্রধান কারণ বলে অনেক ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। মি. টেইলর লক্ষ্যা ও ইছামতির তীরে যে দুটি দুর্গের কথা উল্লেখ করেছেন তা ইদ্রাকপুর ও হাজীগঞ্জের দূর্গ।

ইদ্রাকপুরকে অনেক ঐতিহাসিকগণ ঢাকার তোরন বলে চিহ্নিত করেছেন। কেননা ঢাকাকে আক্রমনের এটাই ছিল একমাত্র জলপথ। ঢাকা নগরীকে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব ছিল ইদ্রাকপুর কেল্লার। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জলদস্যু ছাড়াও আফগান, মগ, ফিরিঙ্গি, প্রভৃতি শত্রুদের হামলা প্রতিহত করেছে ইদ্রাকপুর কেল্লার অকুতোভয় বীর সৈনিকেরা। বর্তমানে যদিও বয়সের ভারে মাটির নিচে প্রোথিত হয়ে গেছে ইদ্রাকপুর কেল্লার অনেকটাই। ভেঙ্গে গেছে অনেকাংশ, হারিয়ে গেছে এর বিস্তৃত গঠন শৈলী তবুও নতুন সাজে সংস্কারের আদলে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রমপুরের ঐতিহ্যমন্ডিত ঢাকার সিংহ তোরন ইদ্রাকপুর কেল্লা কালের নিরব সাক্ষী।

শ্রীনগরের শ্যামসিদ্ধির মঠ

বিক্রমপুরের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের মধ্যে **শ্যামসিদ্ধির মঠ** আজও ঐতিহাসিক নির্দশন হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। গৌরবোজ্জল এ প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনটি বিক্রমপুরের প্রাণকেন্দ্র শ্রীনগর উপজেলা থেকে এককিলোমিটার পশ্চিমে শ্রীনগর গাদীঘাট সড়কের পাশে শ্যামসিদ্ধি নামক গ্রামে অবস্থিত। এই এলাকায় ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধিপত্য। সপ্তদশ শতাব্দিতে এলাকার ধনী অধিবাসি ছিলেন শম্ভুনাথ মজুমদার। উল্লেখ্য যে, শম্ভুনাথের পিতার মৃত্যুর পর তিনি একদা স্বপ্ন যোগে পিতার সমাধির উপর মঠ নির্মাণের আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পিতার দাহ করার স্থানে সমাধির উপর এক বিড়াট মঠ নির্মাণ করেন। ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে শুবিসাল এ মঠ নির্মিত হয়। যার উচ্চতা দু'শ ৪২ ফুট। মঠের ভিত্তি ও প্রস্থের দৈর্ঘ একুশ ফুট ও প্রস্থ একুশ ফুট।

www.pathagar.com

বিশাল এ মঠটির গঠন শৈলী অষ্টভুজাকৃতির। এ মঠটির দরজার উচ্চতা সাতাশ ফুট। মঠের মূল স্তম্ভের ভিতরে মেঝের কেন্দ্রফল তিনশ ২৪ বর্গ ফুট। ভেতরের উচ্চতা প্রায় আশিফুট। তৎকালীন ইট, শুরকির তৈরি অতিপ্রাচীন এ মঠের ভিত্তি অতন্ত্য মজবুত ও সদৃঢ়। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে উপমহাদেশের মধ্যে শ্যামসিদ্ধির মঠটি সবচেয়ে উঁচু স্মৃতি স্তম্ভ। সুবিশাল এ মঠের উচ্চতা দু'শ ৪২ ফুট। অথচ অপরদিকে ভারতের দিল্লির কুতুব মিনারের উচ্চতা দু'শ ৩৬ ফুট। মঠের ভিতরে ও বাইরে বেশ কারুকাজ করা নয়ানাভিরাম দৃশ্য একসময় সবাইকে মোহাবিষ্ট করলেও বর্তমানে তা রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। এ মঠের বাইরে আরো ছিল মুল্যবান কাঠের নকশা। মঠের বাইরে বারন্দায় আজও পক্ষীর কারুকাজ দেখা যায়। এক সময় মঠটি অপরূপ শোভায় দন্ডায়মান ছিল। এখন মঠের সে রুপ আর নেই। দরজার মূল্যবান কাঠ আর পাথর চুরি হয়ে গেছে আনেক আগেই। উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ উচুঁ বিশাল এ মঠের দেয়ালে ও চুড়ায় প্রচুর ফাটল ধরেছে। যার পরিণতিতেই ঐতিহাসিক র্নিদশন এ মঠটি বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। মঠের ভিতরের মধ্যভাগে প্রায় তিন ফুট উঁচু কষ্টি পাথরের তৈরি অতি মূল্যবান একটি শিবলিঙ্গ ছিল। যেখানে সারা এলাকাবাসি প্রতিনিয়ত শিবপূজা দিত। ৯৫ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে এক সংঘবদ্ধ পুরাকীর্তি চোর মহা মূল্যবান এ কষ্টি পাথরের লিঙ্গটি চুরি করে নিয়ে যায় । এ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ দিনে এ মঠে শিব পূজা করে। পূজা উপলক্ষে শিবরাতে এ মঠের আঙ্গিনা ধোয়ামোছা করে পরিস্কার পরিছন্ন করা হয় । নব রুপে সাজানো হয় এর চতুর্দিক। দুধ কলা ও নানা রকমের ফল মুলে মঠের ভিতর ও দরজার সম্মুখে বিশাল স্তুপ হয়ে যায়। পূজার দিনে শ্রীণগর, ষোলঘর, রাঢ়ীখাল, পার্শ্ববর্তী থানা সিরাজদিখান, লৌহজং থেকেও শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলারা বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা এসে ভিড় জমায় পূজা উপলক্ষ্যে। কুমারী মেয়েরা সারিবদ্ধভাবে মঠের চারদিকে সাত পাক ঘুরে পাক খায় এবং সবশেষে মঠের ভিতরে শিব লিঙ্গে পুজা দেয়। শোনা যায়, কুমারী মেয়েরা এই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে পূজা দিলে তাদের শীঘ্রই বিয়ে হয় এবং সুপুরুষ স্বামী তাদের ভ্যাগে জোটে। মঠের সম্মুখে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তার সম্মুখে একটি বিশাল মাঠ।এ মাঠে এক সময় ফুটবলের বিশাল আসর বসত। এ আসরে দেশের বিভিন্ন নামকরা খেলোয়াড় ছারাও ভারতের ফুটবল একাদশ খেলোয়াররাও খেলে গেছে বিভিন্ন সময়। মঠটির সম্মুখে দরজার দিকে উপরে মার্বেল পাথরে ১৮X২৪ বর্গাকৃতির একটি নাম ফলক রয়েছে। সেখানে লেখা সম্ভুনাথের বাসার্ধ মঠ। নীচে শকাব্দ ১৭৫৮ সালে ১২৪৩। শম্ভুনাথ মহাশয় তার পৌত্র শ্রীযুক্ত কুমুদিনি কান্ত মজুমদার ওয়ারিস সুত্রে মালিক হয়ে পূজার কার্জাদি পরিচালনা করছেন। শ্রী উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ওরফে কালু,সন ১৩৩৬,১৯ আষাঢ়। বেশ কিছু কাল থেকেএ তথ্য খচিত মার্বেল পাথরের প্লেটটির মধ্য ভাগে ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোন মুর্হুতে

www.pathagar.com

সেটি খসে পড়ে এ মঠের তথ্য ভান্ডার থেকে হারিয়ে যেতে পারে। মঠটির চুড়ার চারদিকে রয়েছে অসংখ্য ছিদ্র আর ছিদ্রের মুখে রয়েছে ঢাকনা। এ ছিদ্র গুলোতে প্রচুর টিয়ে,শালিক,ও কবুতর সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বাস করে আসছে। সুবিশাল মঠ ও মাঠকে কেন্দ্র করে প্রতি বৈশাখের দুই তারিখে বৈশাখি মেলা বা গলোয়া বসে। প্রাচীন এ মেলায় অদ্যাবধি মেলা শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই প্রচুর পণ্য নিয়ে হরেক রকম পসরা নিয়ে এসে দোকানিরা দোকান সাজাতে থাকে। খেলনা, প্রসাধনী সামগ্রী থেকে শুরু করে সংসার জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতিটি সামগ্রী, সাপুরে, বংশিবাদক, জাদুকর, এমন কি নাগরদোলা সহ বিভিন্ন আনন্দ উপভোগের বিশাল আয়োজনে গণমানুষের এক মহা মিলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে এ মেলা।

www.pathagar.com

অতীশ দীপঙ্কর

অসামান্য প্রতিভার অধিকারী পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর ৯৮২ খৃষ্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ জেলার (বিক্রমপুর) বজ্রযোগিনী গ্রামে গৌরীয় রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কল্যান শ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। অতীশের ছোট বেলার নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। তিনি শৈশবে মায়ের কাছে বিদ্যালাভ করেন। মা ছিলেন একজন বিদূষী মহিলা। সে সময়ের প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অবধূত জেত্যারির কাছে তিনি বিদ্যা লাভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হস্তশিল্প, ব্যাকরণ ও অংক শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। অল্প বয়সেই তিনি পাঁচজন কুমারীর পানি গ্রহণ করেন। জেত্যারির আশ্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পিতার আদেশে হীনযান, মহাযান, ত্রিপিটক, ভৈভাষিক দর্শন ও তান্ত্রিক শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় তার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পরে এবং একজন ব্রাহ্মন পণ্ডিত তাকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান জানান। তরুণ অতীশ তর্কের মাধ্যমে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মনকে পরাজিত করেন এবং তার পাণ্ডিত্য আরো বিস্তার লাভ করে। এর পর তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র সাধনার জন্য উদন্তপুরী বিহারে জ্ঞানী ভিক্ষু রাহুল গুপ্তের কাছে গমন করেন। বিদ্যালাভের পর রাহুলগুপ্ত তাকে 'গুহ্যজ্ঞান বজ্র' পদবীতে ভূষিত করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে মহাসান্নিক আচার্যশীল রক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীপঙ্করকে শ্রী জ্ঞান নামে নাম করন করা হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শন আলোচনায় তিনি এখানে আরো দশ বছর অতিবাহিত করেন। প্রাজ্ঞ পারমিত্য ও তন্ত্র সম্বন্ধে আরো পাঠ গ্রহণের জন্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিক্ষকবৃন্দ তাকে সুবর্নদ্বীপ যাবার জন্য পরামর্শ দেন। সুবর্ন দ্বীপ ছিল তখন বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার বিশিষ্ট তীর্থ ভূমি। সেখানকার সবচে বড় গুরু চন্দ্রকীতির কাছে তিনি দীর্ঘ বারো বছর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পদচারনা করে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পথে সিংহল ভ্রমন করেন এবং গৌড় মগধ বঙ্গাধিপতি পাল রাজ নবপালদের কর্তৃক বিক্রমশীল মহা বিহারের প্রধান আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। এসময় তার সুনাম দিগবিদিক ছড়িয়ে পরে। মূল্যবান সারগর্ভ বক্তৃতা দেয়ার জন্য বিভিন্ন বিহার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডাক আসতে থাকে। তার সুনাম তিব্বতীয় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তিব্বতেও পৌঁছে যায়। তিব্বতের রাজার বার বার ঐকান্তিক প্রার্থনায় আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৪০ সালে কতিপয় শীষ্যসহ তিব্বতের রাজধানীতে উপস্থিত হন। তখন তাকে রাজকীয় সম্বর্থনা দেয়া হয়। তিনি তিব্বতের নানা স্থান ভ্রমণ করে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করেন।

চীন সম্রাট দীপঙ্করের পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে অতীশ বা শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ ইতালীর টুচি ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিস্কার করেন। দীপঙ্কর ১৭৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শুধু ধর্ম বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করেননি, চিকিৎসা বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে একটি ছিল মাথার অসুখ

www.pathagar.com

সারাবার উপর লেখা। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, প্রকৌশলী ও শব্দ বিজ্ঞানী। তিব্বতে দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তার দেহ ভেঙ্গে পরে। অবশেষে ১০৫৪ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরীর অদূরে নেআঙ্গ অঞ্চলে তারই নির্মিত তারাদেবীর মন্দিরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তার ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীসহ দেহভস্ম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে রক্ষা করা হয়।

অতীশ দীপঙ্করের গ্রন্থ গুলোর মধ্যে (১) বোধিপদ্য প্রদীপ (২) চর্যা সংগ্রহ প্রদীপ (৩) মধ্যমোপদেশ (৪) সংগ্রহ গর্ভ (৫) মহাযান পথ সাধন (৬) মহামানব পথ সাধন (৭) দশ কুশল কর্ম উপদেশ (৮) বর্ন বিভঙ্গ (৯) সুত্রার্থ সমুচ্চয়য়োপদেশ (১০) সপ্তক বিধি ইত্যাদি।

এই মহাজ্ঞানী মহাজনের হাজার বছর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকারসহ এখানকার বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থাগুলোর সহায়তায় এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং দেশ বিদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের মহা পণ্ডিতের ভিটায় সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে চীন বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে সোনার কাসকেটে করে অতীশের দেহ ভস্ম এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য উপহার হিসাবে পাঠান যা কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে পরম শ্রদ্ধার সাথে রক্ষিত আছে।

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু

বেতার যন্ত্র ও গাছের প্রাণ আবিষ্কারক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ঐতিহ্যবাহি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে ইউরোপে নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রচার করে জয়মাল্য নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তার গবেষণার প্রধান দিক ছিলো উদ্ভিদ ও তড়িৎ চৌম্বক। প্রথম জীবনে তড়িৎ চৌম্বকের উপর ব্যাপক গবেষণা করেন এবং এর প্রধান আবিষ্কারগুলোর মধ্যে বেতার যন্ত্র অন্যতম। ১৮৮৭ সালে জার্মান পদার্থবীদ হাইনারখিশা হেরৎস তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপরই এই তরঙ্গের মাধ্যমে বিনা তারে প্রেরণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ইংল্যান্ডে অলিভলজ, আমেরিকায় মুয়ারহেড, রাশিয়ার পোপ আর ইতালির মার্কুনি এদের মধ্যে জোর প্রতিযোগীতা চলছিলো কে কার আগে বিনা তারে তড়ঙ্গ পাঠাতে পারে। এর মধ্যে বসু তিন মাস রাত দিন পরিশ্রম করে তৈরি করেন অনু তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রটি। তারপর আরো এক বছর যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করেন। তিনি ১৮৯৫ সালের মে মাসে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় তার অনুতরঙ্গ যন্ত্রের কলাকৌশল ও কার্যবিধির বর্ননা দেন। অবিশ্বাস্য বলে সবাই উড়িয়ে দেয় এবং এর কার্যবিধি জনসম্মুখে দেখার আহ্বান জানানো হয়। সকলকে বিস্মিত করে তিনি তার আবিস্কারকে সকলের সম্মুখে প্রদর্শিত করে প্রশংসিত হন।

www.pathagar.com

এতকিছুর পরও বসুর আবিষ্কার উপেক্ষিত রয়ে গেল। ইতালির তরুণ বিজ্ঞানী মার্কুনি একই বিষয়ে গবেষণা করে সফল হয়ে প্যাটেন্ট করে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। এই ঘটনার পর পরই তিনি আত্মভোলার মতো উদ্ভিদ জগতে ঢুকতে থাকেন এবং সেখানেও তিনি সফলকাম হন। এক্ষেত্রে তার আবিষ্কারের যন্ত্রপাতি হলো উদ্ভিদের বৃদ্ধিমাপক যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ, উদ্ভিদ দেহের উত্তেজনার বেগ নিরুপক সমতল তরুলিপি যন্ত্র রিজোনাষ্ট রেকর্ডার। তার গবেষণার বিষয় ছিল ডিফ্রোকশন গ্রেন্টিং অদৃশ্য আলোক ও বিনা বাধায় বার্তা।

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু শুধু একজন সফল বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের মতো জটিল বিষয়ও মাতৃভাষায় চর্চা করে গেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'সপ্রান ও নির্জীবে সাড়া', 'বৃক্ষের সাড়া শারীরিক অনুসন্ধানের উপায় হিসেবে', 'বৃক্ষের উত্তেজনা সংক্রান্ত গবেষণা 'অবাক্ত' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জীবনে তিনি বহু খেতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বহু দেশ ভ্রমন করেছেন। ১৮৯৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বসুকে ডি.এস.সি দেন। ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী লন্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটিউটে তিনি প্রদর্শনীসহ বক্তব্য রাখেন। ১৯০০ সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক পদার্থ বিজ্ঞান সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। সেখানে তিনি 'জীব ও জড় জগত এবং বৈজ্ঞানিক ধারা'র ঐক্য এর উপর বক্তব্য রাখেন। ১৯০২ সালে লিলিয়ানা সোসাইটিতে তার বক্তব্যকে হাতে কলমে ধরে দেখান। ১৯০৭ সালে জগদীশ চন্দ্র বসু ইউরোপে যান। যান আমেরিকায়। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'নাইট' খেতাব দেয়। ১৯১৯ সালে এভারডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দেয় ডি.এস.সি। ১৯১৭ সালে তাকে দেন এল.এল.ডি। ১৯২০ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং বেলজিয়ামের রাজা কমান্ডার অফ দি অর্ডার অব লিওপোল্ট দিয়ে ভূষিত করেন তাকে ১৯২৬ সালে। ১৯২৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি.এস.সি প্রদান করেন।

এই গুণি ব্যক্তি যেসব বিশ্ববরেণ্য বক্তিত্বের সাথে বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ হয়েছিল তাদের মধ্যে আলবার্ট আইনষ্টন, নাট্যকার ঔপন্যাসিক জর্জ বানার্ডশ, অধ্যাপক সর্ড র‍্যালী, অধ্যাপক গইনসর, মাঈকেল কষ্টার, ফ্রান্সিস বালকুর, ফ্রানসিস ডারউইন, আলেক জাণ্ডার গ্রামবেল, বিজ্ঞানী ওয়ালার, গনিতজ্ঞ ঔপন্যাসিক রোমা রোঁলা'র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর বিক্রমপুরের এ শ্রেষ্ঠ সন্তান পরলোক গমন করেন।

www.pathagar.com

শিক্ষাক্ষেত্রে বিক্রমপুরের কৃতিত্ব

সেই বৃটিশ আমল থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে এই উপমহাদেশে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছেন বিক্রমপুরবাসীরা। একসময় বিক্রমপুরের একটি গ্রামে যে সংখ্যক গ্রাজুয়েট ছিলেন অনেক জেলায়ও ঐ সংখ্যক গ্রাজুয়েট ছিল কিনা সন্দেহ করা হয়। ইতিহাস খ্যাত বিক্রমপুরের সেই গৌরবময় শিক্ষার ইতিহাস আজও প্রবাহমান করে রেখেছেন বর্তমান সময়ের অনেক কৃতি সন্তান। এদের অনেকেই দেশ বিদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে নিয়োজিত আছেন। আমাদের গর্বের ধন, অতীত ও বর্তমানের সেই সব কৃতি সন্তানদের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আশুতোষ গাঙ্গুলী

হরগঙ্গা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দানশীল শিল্পপতি আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় বিক্রমপুরের টঙ্গীবাড়ি থানার ধীপুর ইউনিয়নের রাউতভোগ গ্রামে বাংলা ১২১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরমোহন মহাশয় ইংরেজী শিক্ষিত একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। আশুবাবু বাল্যকালে তার ছোটমামা ২৪ পরগণার জেলা জজ রসিক মোহন ভট্টচার্যের স্নেহ যত্নে পড়ালেখা শেখেন। ১৯১১ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করার পর রাজশাহী সরকারী কলেজে বিএ অধ্যয়ন করেন। বিএ পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে এমএ ভর্তি হন এবং ১৯১৬ সালে এম এ পাশ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। এরপর তিনি বোম্বের পুণাতে যান এবং ১৯১৬ সালেই সামরিক একাউন্ট বিভাগে চাকুরী নেন। পরে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সরকারী চাকুরী ছেড়ে কলিকাতায় এসে লোহার ব্যবসা শুরু করেন। কিছুকাল পর ব্যবসায়ে উন্নতি হতে থাকে। এসময়ে লক্ষাধিক টাকা লাভ হওয়াতে তিনি ভোগ বিলাসে গা এলিয়ে না দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এমন সময় তার মামা বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ঢাকা সারস্বত সমাজের সভাপতি রাজমোহন বিদ্যারত্ন ও মামাত ভাই মুন্সীগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের পরামর্শে ১৯৩৮ সালে হরগঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি যে শুধু হরগঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা-ই নয় তার দানে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

তিনি বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। 'মেটেল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া' নামক কোম্পানী তারই প্রতিষ্ঠিত ভারতের নামকরা লেদ কোম্পানী। এর মূলধন ১৯৪৭ সালেই ছিল ১০ কোটি টাকা। তিনি ঢাকেশ্বরী কটন

www.pathagar.com

মিলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯২০ সালে ইণ্ডিয়া ষ্টীল ওয়ার প্রোডাক্টসের এজেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯২০–১৯২৫ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া সোপ এ্যাণ্ড কেমিক্যাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় তিনি নিখিল ভারত সাবান প্রস্তুতকারক সমিতি গঠন করেন এবং সাবান বিষয়ক একটি জার্নাল সম্পাদনা করেন। মেটাল কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া পরে "হিন্দুস্তান জিংক" হয়। তাছাড়া তিনি ন্যাশনাল ষ্টীম নেভিগেশন, আসাম মাইনিং কোম্পানী, ক্যালকাটা ল্যান্ড ট্রাষ্ট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস এর ডাইরেক্টর ছিলেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (বর্তমানে যাবদপুর ইউনির্ভাসিটি), উইমেনস কলেজ, কলিকাতা লেক স্কুল ফর গার্লস, সাদার্ন একাডেমী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং উইমেনস কলেজের আজীবন সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ, সারদেশ্বরী নারী আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির সাথেও জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি তার দানে প্রতিষ্ঠিত কলেজ দেখতে আসেন। তখন তাকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। ১৯৭৫ সালের ১০ই অক্টোবর পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

পদ্মলোচন ঘোষ

পণ্ডিত পদ্মলোচন ঘোষ ১৮৩৯ সালের ৩রা জুন শ্রীনগর থানার হাঁসাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নবকিশোর ও মাতা জয়লক্ষ্মী দেবী।

শিক্ষা বিভাগে সামান্য একটা চাকুরির মাধ্যমে পদ্মলোচনের কর্মজীবন শুরু হয়। নিজ জন্মভূমি বিক্রমপুরের জন্য কিছু একটা করার জন্য তিনি সবসময় বিচলিত থাকতেন। কিন্তু সামান্য এ চাকুরির টাকায় কিছু একটা করা সম্ভব হবে না ভেবেই তিনি শিশু পাঠ্যপুস্তক লিখতে শুরু করেন। সৃষ্টিকর্তা তার এ মহৎ কাজের সহায় হন। তার প্রণীত গ্রন্থগুলো সরকার কর্তৃক পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। এতে প্রচুর অর্থ আসে। তার স্বপ্নের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি এই কষ্টার্জিত সমস্ত অর্থে হাঁসাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পদ্মলোচনের এই দান টাকার অংকে মাপা সম্ভব নয়। কারণ এ পরিমাণ অর্থে অনেকেই অনেক কীর্তি স্থাপন করেছেন। কিন্তু পদ্মলোচনের দানে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তার মূল্য নির্ধারণ করা চলে না। ১৯১৫ সালের ১ আগস্ট কমিশনার ফ্রেঞ্চ সাহেব, ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট জকি সাহেব, গর্ভনমেন্টের সেক্রেটারিসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হাঁসাড়া গ্রামে গিয়ে এ দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করেন।

www.pathagar.com

প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন

প্রসন্ন চন্দ্র ১৮৪২ সালে আটপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম স্বরূপ চন্দ্র চক্রবর্তী। টোলে কলাপ ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করে কিছুদিন ঢাকায় জমিদারের নকলনবীশের কাজ করেন। এই কাজ ভাল না লাগায় আবার পড়া শুরু করেন। ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজে সংস্কৃতে অধ্যাপনা করেন। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তার সহযোগিতায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ হত। ১৯০৯ সালে সরকার তাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কয়েকটি স্কুল পাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ' এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ৮ই নভেম্বর ১৯১৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

চাঁদ খাঁ মুন্সী

চাঁদ খা মুন্সী অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময় বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানাধীন খৈয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আফিজুল্লাহ খাঁ। বিক্রমপুরের মুসলিম পরিবারের মধ্যে এ খাঁ পরিবার এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। পরিচিতিও ছিল ব্যাপক। চাঁদ খাঁ'র বংশধরগণের দিল্লীর সম্রাটের সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় বাংলাদেশে চলে আসেন। চাঁদ খাঁ একজন অতুলনীয় ভাষাবিদ, বিদগ্ধ গুণীজন, যার বহু পান্ডুলিপি এখন কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত, তার অধিকাংশই ফার্সী ভাষায় লিখিত এবং হস্তলিখিত। বিভিন্ন বিষয়ের উপর এ গ্রন্থরাজি অনুবাদ করলে চাঁদ খাঁ সম্বন্ধে আরও ব্যাপক জানা যাবে। এ জন্য গবেষণার প্রয়োজন। তৎকালীন চাঁদ খাঁ মুন্সীর যারা ছাত্র ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীনগরের প্রতাপশালী জমিদার লালা কৃষ্ণ কুমার বসু, ষোল ঘরের স্যারসিএম বসুর পিতা, মালখানগরের অশ্বিনী কুমার বসুর পিতা ও মান পাড়ার মনোরঞ্জন রায়ের পিতা অন্যতম। তার পান্ডিত্যএতই সুনাম কুড়িয়েছিল যে, বিক্রমপুরের সবাই তখন চাঁদ খাঁ মুন্সীকে চিনত এবং সম্মান করত।

সোমেশ চন্দ্র ঘোষ

বীজ গণিত অংকের মতো দুরুহ ও জটিল বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জনকারী কে.সি. ঘোষও সোমেশ চন্দ্র ঘোষ বিক্রমপুরেরই কৃতি সন্তান। এ দুই পণ্ডিতের লেখা বীজগণিত ও পাটিগণিত বহুদিন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হাই স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ছিল।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৫০ সালে বর্তমান লৌহজং থানার ব্রাহ্মণগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে লেখাপড়া

www.pathagar.com

করেন। পরবর্তীতে 'গিল ক্রাইসট' বৃত্তি নিয়ে বিদেশ যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এস সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থ বিদ্যায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের কারণে রসায়ন বিদ্যায় 'হোপ' পুরস্কারও অর্জন করেন। ১৮৭৭ সালে ডিএসসি উপাধি লাভ করে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং নিজামের আমন্ত্রণে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষা সংস্কারের ভার গ্রহণ করেন। তার চেষ্টায় সেখানে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। তিনিই ঐ রাজ্যে নিজাম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে হায়দ্রাবাদের জনগণ তাকে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি কাব্যচর্চা করে কবি খ্যাতিও লাভ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সদাশয় পরোপকারী এ মহান পুরুষ বহু দরিদ্র যুবককে লালন পালন করে গেছেন। তার পুত্র কন্যাদের মধ্যে কবি হীরেন্দ্র নাথ, বিপ্লবী বীরেন্দ্র নাথ এবং দেশ নেত্রী কবি সরোজিনী নাইডুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকের ব্রাহ্মনগাঁও হাই স্কুল তাদেরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী অঘোর নাথের জীবনাবসান ঘটে।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

১৮৫২ সালের জুলাই মাসে পশ্চিমপাড়া গ্রামে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতা কাশীকান্ত। তিনি ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত ইউরোপে থাকাকালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং পরে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি পান। ইউরোপে তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পিএইচডি। রুশ দেশে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা কর্মেও তিনি ইউরোপে প্রথম ভারতীয়। ১৮৮৩ সালে স্বদেশে ফেরেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে কাটে। হায়দ্রাবাদ, মজঃফপুর ও মহীশূর কলেজ সমূহে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় রচিত তার পুস্তক বিশেষ আদৃত হয়েছে। বাল্যবিবাহ ও নিবারণী সভা স্থাপন ও অবলা বান্ধব পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করে সমাজ সংস্কারের ভূমিকাও গ্রহণ করেন। তার নারী জাতির হীন অবস্থা বিষয়ক একটি ও বাল্যবিবাহ বিষয়ক একটি গান তৎকালে পূর্ববঙ্গে শিক্ষিত সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্ম সাধনা করে জীবনযাপন করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশের, এমনকি ইংল্যান্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকার সুধী মহলে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী বহু গুরুত্বপূর্ণ মতামত চেয়ে তার নিকট পত্র

www.pathagar.com

লিখতেন। তার রচিত 'কামিকা বিবরণ পঞ্জিকা', 'ভাষাবৃত্তি', 'ঋতু প্রদীপ' বহু ভাষায় অনুদিত হয় এবং তা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই গুণী ব্যক্তির বাড়ি বিক্রমপুর। ১৮৬৪ সালে শ্রীনগর থানার শ্যামসিদ্ধি গ্রামে তার জন্ম। শিশুকালে পিতামাতা হারিয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠেন। বাল্যকাল থেকেই বৃত্তির টাকা ও প্রাইভেট পড়িয়ে সেই টাকা দিয়ে পড়ালেখা চালান।

অমরেশ্বর ঠাকুর

১৮৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর অমরেশ্বর ঠাকুর বিক্রমপুরের ভাগ্যকুল গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা রামকৃষ্ণ ছিলেন ভাগ্যকুলের কুণ্ড জমিদার বংশের কুল পুরোহিত শ্রীচৈতন্যের মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের অধস্তন দ্বাদশপুরুষ। ৫ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে আর্থিক অনটনে পরলেও প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়াতে উচ্চ শিক্ষা লাভে কোন অসুবিধা হয় না। ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দাদার কাছে চলে যান। ১৯০৮ সালে সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করার পর রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। পালি, দর্শন ও সংস্কৃতের অন্য একটি বিভাগে এম.এ পাশ করেন ও দুইবার স্বর্ণপদক পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সংস্কৃত বিভাগে যোগ দেন। সুদীর্ঘ ৩৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর নেন। গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের জন্য 'যোগেশচন্দ্র গবেষণা পুরস্কার' পান। ১৯২৭ সালে হিন্দু ল' অব এভিডেন্সের উপর গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. পান। পরে 'বেদান্তশাস্ত্রী' উপাধিও পেয়েছেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই সম্পাদনায় ঐ পরিষদের পত্রিকা বের হয়। ১০ বৎসর পরিশ্রম করে যাস্কাচার্যের নিরক্ত ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদনায় বাল্মীকি রামায়ণ ৬০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। Calcutta Sanskrit Series-এর প্রায় ৪০ খানি দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ টীকা ও অনুবাদ সহকারে প্রকাশ করেছেন। মম্মট ভট্রের কাব্য প্রকাশের ইংরেজী ভূমিকা তাঁর একটি বিশেষ অবদান। ২৪ জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক ধীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ১৮৮৮ সালে বিদগাওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিশচন্দ্র। বিদগাও সংলগ্ন বানারী গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ১৯০৮ সালে এন্ট্রান্স, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এফ এ এবং কলকাতা সিটি কলেজ থেকে ১৯১২ সালে সংস্কৃতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। অল্প কিছুদিন অন্য চাকরি করার পর শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি সেবা কার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত 'দরিদ্র ভান্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য তার প্রেরণায় ছাত্ররা শ্রমদান করতো। ধনীদের প্রদত্ত অর্থ ও সম্পদ তিনি দরিদ্রদের দানস্বরূপ না

www.pathagar.com

দিয়ে তার দ্বারা তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতেন। তারই অনুরোধে স্বগ্রামের ডাঃ সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত বিদগাঁওয়ে হর গৌরী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে দেন। তিনি বিনামূল্যে হোমিও প্যাথি চিকিৎসা করতেন। ছাত্রদের দেশ কর্মীরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'বিদ্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি ঢাকায় ১৯২৪ সালে 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি ও ১৯২৭ সালে বিধবাদের জন্য ঢাকার নিজ বাসভবনে 'কল্যাণ কুঠির' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃহ হন। ১৯৩২ সালে গ্রেফতার হয়ে ২ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি বিক্রমপুর ছেড়ে জলপাইগুড়ির ধুপগুড়িতে বিদ্যাশ্রমটিকে স্থানান্তরিত করেন এবং তিনি ১৯৮৬ সালের ৮ জানুয়ারী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কিরণ শঙ্কর রায়

কিরণ শঙ্কর রায় ১৮৯১ সালে তেঁওতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিশঙ্কর। কলকাতা হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ পাস করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। ১৯১৯ সালে আবার বিলেত যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে দু'বছর পর দেশে ফিরে আসেন। ১৯২১ সালে তিনি ন্যাশনাল কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ও পরে ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদন্ড ভোগ করেন।

সুভাষ চন্দ্রের এক সময়ের সহকর্মী ছিলেন। পরে এডহক কংগ্রেসের সম্পাদক হন। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভার কংগ্রেস দলের নেতা হন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারতে ফিরে যান এবং বিধান চন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ১৯৪৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী মারা যান। সন্তর্পণ তাঁর অবিস্মরণীয় একটি সাতিহ্য কীর্তি।

মেঘনাদ সাহা

এক আশ্চর্য প্রতিভার নাম মেঘনাদ সাহা। পিতা মুদি দোকানী জগন্নাথ সাহার মেধাবী ছেলে মেঘনাদ পড়ালেখা চালাবার জন্য গৃহস্থ বাড়িতে বাসন মাজার কাজও করেছেন। জেলা ভিত্তিক মধ্য-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেঘনাদ ঢাকা জেলা থেকে প্রথম হয়েছিলেন। পরে সরকারী বৃত্তি পেয়ে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে' অংশগ্রহণ করায় বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায় এমনকি স্কুল থেকেও নাম কাটা যায়। পরে বেসরকারী কিশোরী লাল জুবলি স্কুল থেকে ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং পূর্ববঙ্গের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। ১৯১১ সালে আইএসসিতে তৃতীয় এবং ১৯১৩ সালে গণিতে

www.pathagar.com

অনার্সসহ বিএসসি ও ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে এম এস সি করেন। উভয় পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় হন। ১৯১৬ সালে সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এর মাঝে ছাত্র অবস্থায় জার্মান ভাষা শিখে ফেলেন ফলে তার বিজ্ঞান চর্চার পরিধি বেড়ে যায়। তিনি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান চর্চায় নিজেকে এ সময় গভীরভাবে নিয়োজিত করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখতে শুরু করেন। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডিএসসি ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। ১৯১৯ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি নিয়ে বিলেতে লেখাপড়া করতে যান। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডে তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা কর্মগুলো প্রকাশ পেলে দেশ-বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত অধ্যাপকের পদ পান এবং ১৯২৩ সালে যোগ দেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে। ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ডের রয়েল সোসাইটি তাকে ফেলো মনোনীত করে। ১৯২৫ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিজ্ঞান এবং গণিত শাখার বিভাগীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে কার্নগি ট্রাস্টের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে ৬০ বছর বয়সে অবসর নেন। বর্তমানে ভারতে তার প্রতিষ্ঠিত "সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" পরমাণু গবেষণার নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। এই গুণি ব্যক্তি ১৮৯৩ সালে বিক্রমপুরের শেওড়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মেদ খাঁ (ইন্তু খাঁ)

মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মেদ খাঁ (ইন্তু খাঁ) ১৮৯৭ সালে শ্রীনগর থানার কামারগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী মোঃ লাল খাঁ। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন ১৯১২ সালে ভাগ্যকুল হরেন্দ্রলাল হাই স্কুল থেকে। আই,এ পাস পরেন ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে। বি, এ পাস করেন সিটি কলেজ কলিকাতা থেকে ১৯১৭ সালে। এম, এ পাস করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ সালে।

এর পরই অস্থায়ী অধ্যক্ষ হন কলিকাতা কর্পোরেশন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে। সি, আর দাসের সাথে স্বদেশী আন্দোলন করায় সে সময় ঐ সরকারী চাকুরী ছাড়তে হয়। পরে সি আর দাস ও সুভাষ বোসের সহায়তায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনস্থ সমস্ত স্কুলসমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ভাগ্যকুল হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন। সমগ্র বিক্রমপুরের মুসলমানদের ভিতর প্রথম তিন জনের তিনি একজন এম, এ। বাংলা, ইংরেজী ছাড়াও উর্দ্দু, আরবী, ফার্সী ও হিন্দি ভাষায় লিখতে পড়তে পারদর্শী ছিলেন। আজীবন তিনি কোরান শরীফ ও হাদিস শরীফের উপর গবেষণা করে গেছেন।

www.pathagar.com

আদিনাথ দত্ত

আদিনাথ দত্ত বাংলা ১৩০৭ সনের ২৮ শে ফাল্গুন দেওভোগ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মহিমচন্দ্র মাতা নব কুমারী। তিনি ১৩২৭ সনে কয়েকটি লেটারসহ মেট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন। আর্থিক দুরাবস্থার জন্য তিনি পড়াশুনা করতে না পারলেও ব্যায়াম, কুস্তি ও ক্রিয়া প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এক বিরল ব্যক্তিত্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ৪৩ বছর ক্রীড়া শিক্ষকের পদ অলংকৃত করে ১৩৭৫ সনে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন সত্যপ্রিয় সত্যভাষী ছিলেন। সাধনা গুণে শেষ জীবনে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেন। তিনি সত্য গুরু সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথা বিশ্বাস করতেন না। অসংখ্য ভক্তবৃন্দের মাঝে ১৩৮৮ সনের ৬ই ফাল্গুণ তিনি কলিকাতার শ্যামনগরে দেহত্যাগ করেন।

এ কিউ এম বজলুল করিম

ভারতের শিবপুর প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর মরহুম এ কিউ এম বজলুল করিম ১৯২০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী লৌহজং এর কলমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভের পর ১৯৪২ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম এস সি তে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং ১৯৪৮ সালে দেশে ফেরেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের (প্রথম) চেয়ারম্যান, তৎকালীন পাকিস্তানের সয়েল সার্ভে প্রজেক্টের মহাপরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও এফএইচ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে কৃষি গবেষণায় জাতীয় পুরস্কার হিসেবে নগদ দশ হাজার টাকা ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ভারত থেকে সংসদ পুরস্কার ও অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তার অবসর জীবন কাটাবার মধ্যেই তাকে কিছুদিনের জন্য মিল্ক ভিটা জাতীয় দুগ্ধ সমবায় সমিতি (লিঃ)-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিক্রমপুরের এই কৃতি শিক্ষাবিদ ১৯ সালে তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

মফিজুল ইসলাম চৌধুরী

শিক্ষাবিদ মফিজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর লৌহজং থানার নওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ১৯৪৩ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ, (অনার্স), ১৯৪৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

থেকে এম, এ তে প্রথম স্থান লাভ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে বৃটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এস, সি (থিসিস) ডিগ্রী লাভ করেন।

প্রফেসর চৌধুরী বিভিন্ন দেশে এগারোটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অনেকগুলো মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়।

প্রফেসর চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্টও ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পানি ও সেচ মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। জনাব চৌধুরী দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা ও সমিতির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাহফুজা খানম

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মাহফুজা খানম ১৯২০ সালে শ্রীনগর থানাধীন কোলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা আজিজুর রহমান ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী মানুষ। স্বামী আবদুল আজিজ চৌধুরী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসি বিভাগের অধ্যাপক।

মাহফুজা খানম শিশু বয়স থেকে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। পিতা চাষারা নারায়ণগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বলেই এই প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন মুসলমান মেয়ের মধ্যে তিনি একজন - যিনি বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা বিভাগের স্কুল পরিদর্শক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এর পর রাজশাহী বিভাগের ডি,ডি,পি, আই হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বই পড়াকে তিনি শখ ও নেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সদস্য ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অনাড়ম্বর পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করতেন। নারী সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করে তিনি আনন্দ পেতেন। তার আর্থিক অনুদানে প্রতি বছরই কিছু দুস্থ মেয়ে লেখাপড়া করতো। এছাড়াও তিনি মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ম্যাগাজিনে বহু শিক্ষামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। উল্লেখ্য তার ২ কন্যা ও ৩ পুত্র প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। জ্যেষ্ঠ কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র বর্তমানে আমেরিকায় প্রবাসী। বড় পুত্র ব্যবসায়ী, মেঝো পুত্র ইসলাম গ্রুপে কর্মরত, কনিষ্ঠ কন্যা শামীম জাহান আহসান ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। এই নিরাভরন, শিক্ষা ব্রতী, কুসংস্কার মুক্ত নারী ১৯৮৮

www.pathagar.com

সালের ৩রা জুন মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ তার পরিবার, আত্মীয় পরিজন তথা সমাজের কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শ হিসাবে বেঁচে আছে।

মোহাম্মদ আবু নাসের

অসাধারন প্রতিভার অধিকারী প্রফেসর মুহম্মদ আবু নাসের ১৯২১ সালে শ্রীনগর থানার দামলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি কাজির পাগলা এ,টি, ইনষ্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিভাগে বি,এস, সি (অনার্স) এবং ১৯৪৩ সালে এম, এস, সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের জনস্হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম, এস ডিগ্রী নেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ১৯৫৫-৫৬ সালে লণ্ডনের নাফিল্ড ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপ অর্জন করেন। ১৯৬৬ সালে টেক্সাস এ এণ্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি লাভ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ট কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ট কমিশনের চেয়ারম্যান পদেও নিয়োজিত ছিলেন।

প্রফেসর নাসের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর অনেকগুলো মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত। বর্তমানে অবসর যাপন করছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন।

এ কে এম আবদুল আলীম

অধ্যাপক এ কে এম আবদুল আলীম ১৯২৭ সালের ৭ই জুন বিক্রমপুরের শমসপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুদিনের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

জনাব আলীম দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। সূর্যসেন হলের প্রভোষ্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জার্নালে তার অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

আবুল হোসেন সাহাদাৎ উল্লাহ

ডঃ আবুল হোসেন সাহাদাৎ উল্লাহ ১৯২৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর বিক্রমপুরের শমসপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম হাবিব উল্লাহ। তিনি ১৯৪৪ এ মুন্সিগঞ্জ হাই ইংলিশ স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন ১৯৪৬-এ হরগঙ্গা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। তিনি স্নাতক (বি এস সি) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (এল,এস,ই) এবং স্নাতকোত্তর (এম এ) ডিগ্রী লাভ করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৮) থেকে। ১৯৭৪ সালে পি এইচ ডি করেন অর্থনীতিতে।

কর্ম জীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৩), বিভাগীয় প্রধানসহ (বর্তমান) বিভিন্ন সময়ে নানা কমিশনের সাথে জড়িত ছিলেন, কোন সময় কমিশনের প্রধান হিসেবেও কাজ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও ছিলেন।

এ কে রফিকুল্লাহ

এ কে রফিকুল্লাহ ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীনগর থানার শমস্‌পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, হরগঙ্গা কলেজ থেকে আই এস সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় বিএসসি (অনার্স) ও এম এস সি ডিগ্রী লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি এবং পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

জনাব রফিকুল্লাহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তার অনেকগুলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশ পায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের প্রথম নির্বাচিত ডীন, ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ এবং বিজ্ঞান যাদুঘরের পরিচালকের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইন্যান্স কমিটি, সিন্ডিকেট, একাডেমিক পরিষদ, বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ ও সিনেট এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। রফিকুল্লাহ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের সায়েন্স সিনে ক্লাবের উদ্যোক্তা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দেশ-বিদেশে বহু সোসাইটির সদস্য হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৯৭৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন।

ডঃ ইয়াজউদ্দিন

দেশের একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ এক সময়ের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ১৯৩১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী মুন্সীগঞ্জের নওগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

মেধাবী এই মানুষটি ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী এবং ১৯৫৪ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি আমেরিকার উইস্কিন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস এবং ১৯৬২ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

অধ্যাপক আহমেদ ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৭৩ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। এছাড়াও তিনি ১৯৭৫-৮৩ সাল পর্যন্ত সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ, ১৯৬৮-৬৯ ও ১৯৭৬-৭৯ সালে বিভাগীয় প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও বোর্ড অব এডভান্স স্টাডিজ-এর সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ছিলেন।

অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ১৯৮৩ সালে জার্মান টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি বার্লিন এবং জার্মানীর রিসার্চ সেন্টার বন্টেইফ গাটিনজেমস্ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্মিলিত শিক্ষক সমিতি আন্দোলনের আহবায়ক এবং শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ১৯৮৭-৮৮ সালে ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক এবং ১৯৯০ সালে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক ও ১৯৯৫ সালে একুশে পদক লাভ করেন। একসময় তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

এ কে এম শামসুল ইসলাম

এ কে এম শামসুল ইসলাম টঙ্গীবাড়ী থানার ধামারণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ১৯৪৯ সালে হরগংগা কলেজ থেকে আইএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বিএ অনার্স এবং ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রেডিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

১৯৬৪ সালে গাইবান্ধা কলেজের অধ্যাপক রূপে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৬ সালে সামরিক বাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। ১৯৭৪ সালে লেঃ কর্নেল হিসেবে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।। ১৯৭৬ সামরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক। ১৯৭৮ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মহাপরিচালক রূপে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন তার উল্লেখযোগ্য কর্ম।

www.pathagar.com

মোঃ আবদুর রশীদ

অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশীদ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী। তিনি ১৯৩২ সনের ১লা জানুয়ারী বিক্রমপুরের উত্তর মেদিনীমণ্ডল গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে জড়িত আছেন। একজন মেধাবী ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেও তার একটা পরিচিতি ছিল।

উল্লেখ্য তিনি শ্রীনগর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং কলেজটিকে বর্তমান পর্যায় উন্নীত করার পেছনে তার অসামান্য অবদান রয়েছে। জনাব মোঃ আবদুর রশীদ একজন কবি। মনের মুকুরে তার একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম।

সিরাজ খান

সিরাজ খান ১৯৩২ সালের ১০ই অক্টোবর শ্রীনগর থানার কবুতরখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৫০ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এবং ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল গ্রুপে বি.এস.সি ডিগ্রী নেন। দু'বছর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করার পর স্বাস্থ্যগত কারণে মেডিক্যাল পড়া ছেড়ে দেন। পরে ১৯৬২ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। বৃটেনের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জনাব খান উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে তার প্রচুর খ্যাতি রয়েছে। জনাব খান একজন বিশিষ্ট কবি এবং গীতিকার। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ "পলাশ বিংশতি"। মনোবিজ্ঞানের ওপর তাঁর বেশ কিছু নিবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

আনোয়ারুর রহমান খান

ডঃ আনোয়ারুর রহমান খান ১৯৩২ সালে শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে পদার্থবিদ্যায় এম এস সি ডিগ্রী নেন এবং একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে গোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি লণ্ডনের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করেন। পরে ১৯৬২ সালে

www.pathagar.com

লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিদ্যা ও ইলেকট্রনিক বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের রয়েল মাইক্রোসকোপিয়াল সোসাইটির একজন ফেলো।

ডঃ মোশারফ হুসাইন খান

যে ক'জন শিক্ষাবিদ বিক্রমপুরকে দিয়েছে গৌরবের আসন অধ্যাপক ডঃ মোশারফ হুসাইন খান তাদের একজন। ১৯৩৩ সনের ১৭ই জুলাই সিরাজদিখান থানার গোয়াল নগর গ্রামে তার জন্ম। বাবার নাম আলহাজ্ব আলী আহমেদ খান।

অধ্যাপক মোশারফ ১৯৪৯ সনে ভারত থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫১ সনে ঢাকা কলেজ থেকে আই,এস,সি, ১৯৫৫ সনে ঢাকা থেকে বি,এস,সি ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৫৮ সনে টেক্সাস থেকে এম,এস,সি ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৬৪ সনে পিএইচ ডি ও ১৯৭৬ সনে অতিসম্মানের সাথে কমনওয়েলথ ষ্টাফ ফেলো (ইউকে) অর্জন করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি কাপ্তাইহাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টে সহকারী সুপারিন্টেড, আহ্সান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রভাষক, ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত একই প্রতিষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সনে পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক, ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বুয়েটের মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সময় কাল পর্যন্ত বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক হুসাইন পেশাগত এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের উদ্যেশে পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও নিরহংকারী ব্যক্তিত্ব। কথাবার্তা ও চালচলনে অত্যন্ত সহজ সরল।

মোহাম্মদ আলী মিয়া

১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী মুন্সীগঞ্জ থানার সাতরাপাড়া গ্রামে মোহাম্মদ আলী মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে বজ্রযোগিনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট (অনার্স) এবং ১৯৫৭ সালে স্ট্যাটিসটিক্স-এ এমএসসি ডিগ্রী নেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ব্যাংককে অনুষ্ঠিত গ্রামোন্নয়নের ওপর ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত আছেন। স্ট্যাটিস্টিক্স-এর দু'টো পাঠ্য বইয়ের প্রণেতা হিসেবে বিশেষ পরিচিত। এছাড়া তাঁর বেশকিছু গবেষণা পত্রও আছে।

মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশ স্ট্যাটিক্সটিক্যাল এবং ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য।

কিউ এ আই নূরুদ্দীন

কিউ এ আই নূরুদ্দীনের পৈত্রিক বাড়ি মুন্সীগঞ্জ থানার কাজী কসবা। তার জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৫ জুন কলকাতায়। পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী নূরুদ্দীন ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান ও '৫৬ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগ লাভ করেন এবং ১৯৭৪ সালে ফরাসী ভাষার সিনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের পদে নিয়োজিত রয়েছেন। এর আগেও ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি একই বিভাগে চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

পিআই এ ঢাকা বিমান বন্দরে সংস্থাপন কর্মকর্তা, চিটাগাং সরকারী মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিএসএস কোচিং ক্লাসের পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রোক্টর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কমিটির সদস্য, প্রস্তাবিত জনসংখ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সদস্য ও সচিব, প্রেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "নিরীক্ষা" এর সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য হিসেবেও তিনি কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ও বহুগ্রন্থের প্রণেতা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর গ্রামের বাড়ি শ্রীনগর থানার বাড়ইখালী। জন্ম ১৯৩৬। পিতা মৃত হাফিজ উদ্দিন চৌধুরী।

তিনি ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল ও কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। যুক্তরাজ্যের লীভস ও লিষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে, এম এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও পি এইচ ডি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও গবেষক। এ যাবত তার প্রায় ৫০ টির মত গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। বাংলা একাডেমী পুরস্কার সহ বহু পুরস্কার পান।

www.pathagar.com

তার রচিত গ্রন্থ ও প্রাপ্ত পুরস্কার ঃ ১। ছোটদের শেক্সপীয়র, ২। অন্বেষণ, ৩। বুনো হাঁস, ৪। কাব্যের স্বভাব, ৫। Introducing Nazrul Islam, ৬। দ্বিতীয় ভুবন, ৭। এ্যারিস্টটলের কাব্য, ৮। তাকিয়ে দেখি, ৯। নিরাশ্রয় গৃহী, ১০। The Moral Imagination of Joseph Conrad, ১১। এ্যারিস্টোটলের কাব্য, ১২। আরণ্যক দৃশ্যাবলী, ১৩। শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ, ১৪। কুমুর বন্ধন, ১৫। বংকিম চন্দ্রের জমিদার ও কৃষক, ১৬। The Enemy Territory, ১৭। আমার পিতার মুখ, ১৮। অনতিক্রশন্ত বৃত্ত, ১৯। স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি, ২০। দরজাটা খোল, ২১। উনিশ শতকের বাংলা পদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ , ২২। উপরকাঠামোর ভেতরই, ২৩। হোমারের ওডেসি,, ২৪। আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ, ২৫। বেকনের মৌমাছিরা, ২৬। লিও টলষ্টয়ঃ অনেক প্রসংগের কয়েকটি, ২৭। মুখোশ ও মুখশ্রী, ২৮। শ্রেণী, সময় ও সাহিত্য, ২৯। বাঙালী কাকে বলি, ৩০। স্বাধীনতার স্পৃহা , ৩১। বৃত্তের ভাঙ্গা গড়া, ৩২। ভালো মানুষের জগৎ, ৩৩। গণতন্ত্রের পক্ষ বিপক্ষ, ৩৪। বাবুলের বেড়ে ওঠা, ৩৫। বাঙালীকে কে বাঁচাবে, ৩৬। রাষ্ট্র ও কল্পলোক, ৩৭। কেউ বৃক্ষ কেউ বলে নদী, ৩৮। স্বপ্নের আলোছায়া, ৩৯। অপরিচিত নায়ক অপচিত দূর্বত্ত, ৪০। উদ্যানে এবং উদ্যানের বাইরে

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ আনোয়ার পাশা রচনাবলী (বাংলা একাডেমী) প্রথম খন্ড-১৯৮০ দ্বিতীয় খন্ড-১৯৮৪ The Convocation Speeches of Dhaka University, Volume 11 (1988)

সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ১। The Dhaka University Studies Part A, , ২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ১৯৭২, ৩। মাসিক 'পরিক্রমা' ১৯৬০-১৯৬২, ৪। ত্রৈমাসিক 'সাহিত্যপত্র' ১৯৮৪

পুরস্কার ঃ ১। বাংলা একাডেমী লেখিকা স্বর্ণপদক, ২। বিচারপতি ইব্রাহিম পদক, ৩। অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, ৪। বেগম জেবুননেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ ফাউণ্ডেশন পুরস্কার।

ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী

ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী শ্রীনগর থানার দয়হাটা মজিদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম এ পাশ করেন এবং একই সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। 'কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো' হিসেবে তিনি ১৯৭৫-৭৬ সালে গবেষণা কাজে নিযুক্ত থাকেন। তিনি বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কাউন্সিল-এর সদস্য।

www.pathagar.com

বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন প্রফেসর। বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিনি নিয়মিত ও জনপ্রিয় একজন উপস্থাপক।

আবদুস সালাম খান

আবদুস সালাম খান ১৯৩৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী লৌহজংয়ের কাজীর পাগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মকবুল আহমদ খান। তিনি বিএ অনার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য ও কলা অনুষদে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ায় দু'টি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তিনি ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

১৯৪০ সালের ১৫ জানুয়ারী মুন্সীগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে মোহাম্মদ হামিদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৫৫ সালে ইসলামিয়া হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬১ সালে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনির্ভাসিটি) থেকে প্রথম শ্রেণীতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রী নেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক।

ডঃ মিজানুর রহমান শেলী

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ডঃ মিজানুর রহমান শেলী সিরাজদিখান থানার কুসুমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ভুইয়া মাহফুজুর রহমান। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৬৯ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ ডি লাভ করেন। ১৯৬৬তে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বাংলা, ইংরেজীতে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিনি বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের ডাইরেক্টর ছিলেন এবং পরে এরশাদ মন্ত্রী সভার তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

এ কে এম ইকবাল হুসেইন

দেশের একজন কৃতি শিক্ষাবিদ ডঃ এ কে এম ইকবাল হুসেইন ১৯৪৩ সালে মুন্সীগঞ্জের জমিদার পাড়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জের সরদারপাড়া। জনাব হুসেইন ১৯৫৯ সালে ষোলঘর হাইস্কুল থেকে অংকে পূর্ণ নম্বর পেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ২৪তম এবং ১৯৬১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

www.pathagar.com

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৪র্থ স্থান লাভ করেন এবং ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত একই বিভাগে লেকচারার হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি ইরাকের বস্‌রা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

জামাল খান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ জামাল খান ১৯৪৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনগর থানার কবুতর খোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জনাব সাঈদ আহমদ খান একজন ফরেষ্ট অফিসার ছিলেন। জনাব জামাল খান ঢাকার পগোজ স্কুল হতে ১৯৬০ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬২ সালে নটরডেম কলেজ হতে আই এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং ১৯৬৬ সালে এমএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন।

তিনি সলিমুল্লাহ হলের সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জনাব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন এবং ইন্সটিটিউট অব পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশনে কিছুকাল গবেষণা করেন। ১৯৭০ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় যান। আমেরিকার সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৪ সালে লোক প্রশাসনে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে ডঃ জামাল খান আমেরিকার বরবেডোস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এবং সমালোচক। 'চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থ। আমেরিকার প্রকাশনী সংস্থা সম্প্রতি তাঁর তিনটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। বিদেশী কতিপয় জার্নালে তাঁর অনেক গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মোঃ বোরহান উদ্দিন দেওয়ান

মোঃ বোরহান উদ্দিন দেওয়ান ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী মুন্সীগঞ্জ থানার মালিগাও এ জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আব্দুল করিম দেওয়ান।

জনাব বোরহান উদ্দিন দেওয়ান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে এম এস সি করে ১৯৭২ সালে রামপাল মহাবিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। এরপর ১৯৭৪ থেকে অদ্যাবধি একই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। শুধু তাই নয় কলেজটির জন্মলগ্ন থেকে কলেজ গড়ে তোলার কাজে এবং বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পেছনে তার অনেকটা ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমনঃ শহীদ জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, কঁচি কাকলী কিণ্ডার গার্টেন, পঞ্চসার আইডিয়েল প্রি-ক্যাডেট ইন্সটিটিউশন গড়ে তোলার পেছনেও তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

www.pathagar.com

জনাব বোরহান উদ্দিন দেওয়ান বর্তমানে থানা ফিমেল এডুকেশন এ্যাসিসটেন্ট প্রজেক্ট কমিটির সদস্য এবং ২০০১ সালে তিনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান পরিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখার জন্য তিনি ১৯৮৮ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসাবে সরকারীভাবে মর্যাদা লাভ করেন।

ডঃ শাহজাহান তপন

বিশিস্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক শাহজাহান তপন ১৯৪৯ সনের ৩রা ডিসেম্বর সিরাজদিখান থানার রাজদীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আফিজ উদ্দিন মিয়া।

১৯৬৫ সনে রাজদীয়া অভয় উচ্চবিদ্যালয় হতে প্রথম বিভাগে এস,এস,সি ১৯৬৭ সনে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচ,এস,সি, ১৯৭০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে বি,এস,সি অনার্স ও ১৯৭১ সনে পদার্থ বিজ্ঞানে এম,এস,সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৮ সনে তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে এম,এস ইউনিভার্সিটিতে বরোদায় পিএইচডি ডিগ্রী করতে যান।

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর তিনি বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কেন্দ্রের স্বাস্থ্যপদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৮০ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৮৫ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ১৯৯৮ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।

একসময় ছাত্র রাজনীতির সাথেও শাহজাহান তপনের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ভোটে তিনিই প্রথম পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ফজলুল হক হল শাখার সভাপতি।

আহসান উল্লাহ খান

আহসান উল্লাহ খান লৌহজংয়ের কলমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিএ অনার্স ও এম এ পাশের পর অধ্যাপয়ান যোগ দেন। তিনি ইছাপুরা কেবি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের ওপর বিভিন্ন সময় ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে আসছেন।

আবদুল হাকিম ঢালী

আব্দুল হাকিম ঢালী ১৯৪৮ সালের ২রা আগষ্ট লৌহজং থানার ভোগদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তার বাবার নাম মোঃ মধু ঢালী। জনাব আব্দুল হাকিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স করে লৌহজং মহাবিদ্যালয়ে বানিজ্য বিভাগের প্রভাষক হিসেবে

www.pathagar.com

কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর কিছুদিন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। এবং ১৯৭৫ থেকে অদ্যাবধি একই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। উল্লেখ্য কলেজের সাংস্কৃতিক দিক চাঙ্গা করে তোলার জন্য 'ত্রিবেনী সংসদ' নামে তিনি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে পাঠ আন্দোলন এবং নাট্য আন্দোলন সহ বিবিধ কর্মসূচী পালন করা হয়। সমাজ থেকে যৌতুকের অভিশাপ মোচন করার লক্ষ্যে 'যৌতুক প্রথা নিবারণী সংস্থা' নামে একটি যৌতুক বিরোধী সংগঠন তৈরী করে তিনি যৌতুকের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এছাড়া ধুমপানের ক্ষতি থেকে জাতিকে বাচাঁনোর লক্ষ্যে তিনি নিজ এলাকায় আধুনিক এর শাখা প্রতিষ্ঠা করে ধুমপান বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

জনাব আব্দুল হাকিম বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি উত্তর দিখলী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি, ব্রাহ্মনগাঁও বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যোৎসাহী সদস্য ও গৃহ বিতরন সমিতির সভাপতির কাজে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রনালয় ১৯৯৬ সালের মে মাসে ৫ জন অধ্যক্ষ ও ৫ জন শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তার সমন্বয়ে ১০ সদস্যরে একটি প্রতিনিধি দল ইন্দোনেশিয়ায় পাঠান। জনাব ঢালী সে প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ছিলেন।

মোঃ মোবারক হোসেন

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ শ্রীনগর কলেজ। সহকারী অধ্যাপক গজারিয়া সরকারী কলেজ, মুন্সীগঞ্জ। বাড়ি লৌহজং থানার কান্দিপাড়া। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। শ্রীনগর থানা ঋণ বোর্ড, শ্রীনগর থানা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি ও জসলদি হাইস্কুলের পরিচালনা পরিষদের সদস্য তিনি।

এনামুল ইসলাম

এনামুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১৯৬৭ সালে স্নাতক সম্মান ও ১৯৭০ সালে লোক প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মুন্সীগঞ্জ পৌর এলাকার বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সমূহের জন্য 'সিরাজুল ইসলাম বৃত্তি তহবিল' নামে একটি বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষানুরাগী এনামুল ইসলামের জন্ম ১৯৫০ সালের ১৫ অক্টোবর বিক্রমপুরে।

www.pathagar.com

মোঃ আব্দুল আউয়াল

ডঃ মোঃ আব্দুল আউয়ালের জন্ম মুন্সীগঞ্জ থানার শিলমন্দি গ্রামে। ১৯৭০ সালে এসএসসি'তে নবম স্থান অধিকার করেন। এইচএসসি'তে '৭২ সালে প্রথম স্থান অধিকার করেন পরে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন করেন। আমেরিকায় তিনি পিএইচডি করেন এবং বর্তমানে সেখানেই শিক্ষকতায় কর্মরত আছেন।

আব্দুর রহমান

একজন প্রিয় শিক্ষক ও সফল সংগঠকের নাম আব্দুর রহমান। জন্ম ১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী। গ্রামের বাড়ি শ্রীনগর থানাধীন গাদিঘাট। বাবার নাম.মরহুম মোঃ মনরউদ্দিন মোড়ল। বর্তমানে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রানিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। জনাব রহমান ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬২ সালে স্থানীয় ষোলঘর স্কুলে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৫-৭৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ্ হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। রাজনীতি ছাড়াও তিনি বহু সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এর মধ্যে ১৯৭৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় Trio International এর প্রতিষ্ঠাতা-উপদেষ্টা, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গ্রামীণ যুব সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৭৪-এ শ্রীনগর কেন্দ্রীয় I.R.D.P 'র নির্বাচিত ডাইরেক্টর, থানা কাউন্সিলের যুব প্রতিনিধি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ প্রভাষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক। বাংলাদেশ শিক্ষক পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ৯৬-৯৭ সালের প্রথম প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত শিক্ষা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাণীবিদ্যা সমিতির আজীবন সদস্য ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সদস্য ও বিক্রমপুর যুব কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া তিনি ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ কন্টিনের দলনেতা হিসেবে থাই জাতীয় রোভার মুটে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক। সরকারী শ্রীনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে তিনি এর উন্নয়নের সাথে সরাসরি জড়িত থেকেছেন এছাড়া এলাকার রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

মনোয়ার হাসিনুল আলম

মনোয়ার হাসিনুল আলম ১৯৫৯ সনের ১৬ই আগষ্ট লৌহজং থানার শিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা মরহুম আব্দুর রহমান মাষ্টার এ দেশের প্রগতিশীল সকল আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। মা মোমেনা খাতুন স্বর্নগর্ভা হিসেবে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

জনাব হাসিনুল আলম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বাংলায় বি,এ, অনার্স সহ মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি রামপাল কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। বন্ধু মহল এবং লেখালেখিতে তিনি আলম শহীদ নামে পরিচিত। এ নামেই তিনি সত্তরের দশক থেকে দৈনিক সংবাদ, বাংলার বাণী, ভোরের কাগজ, সাপ্তাহিক রোববার সহ বিভিন্ন কাগজে লিখে আসছেন।

এক সময় তিনি ছাত্র রাজনীতির সাথেও জড়িত ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের মহানগর কমিটির সহ-সভাপতি, সি,পি,বির নগর সম্পাদক হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) এর মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক।

www.pathagar.com

সাহিত্যে বিক্রমপুরের অবদান

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রোত্তর সময়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসিক সত্যেন সেন, বুদ্ধ দেব বসু ও শমরেশ বসুর বাড়ি বিক্রমপুরে। বর্তমান সময়ের শক্তিমান কবি, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসিক ডঃ হুমায়ুন আজাদ, সাহিত্যিক, গবেষক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক নাসির আলী ও জনপ্রিয় উপন্যাসিক, নাট্যকার, ইমদাদুল হক মিলন, কবি সানাউল হক খান সহ আরো অনেক শক্তিমান লেখক বিক্রমপুরে জন্মেছেন।

কাশীনাথ দাশগুপ্ত, মুনশী

কাশীনাথ দাশগুপ্ত, মুনশী ১৮০৮ সালে বিদ্‌গাওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্মজীবন শেষে সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'শব্দদীপিকা পঞ্চবটীতত্ত্ব' অবলাজ্ঞান দীপিকা 'কন্যাপণ বিনাশিকা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটি পণ প্রথার বিরুদ্ধে রচিত। সাহিত্যকর্ম ছাড়াও গ্রামে ডাকঘর স্থাপনের ব্যবস্থা করেন (১৮৫২) এবং বিক্রমপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গিরিশচন্দ্র বসু

লেখক, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র বসু ১৮২৪ সালে বর্তমান সিরাজদিখান থানার মালখানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শম্ভু চন্দ্র। মাতুল রামলোচন ঘোষ তাকে প্রতিপালন করেন। হিন্দু স্কুল থেকে বৃত্তিসহ স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সাংসারিক বিপর্যয়ে একবছরের বেশি কলেজে পড়তে পারেননি। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ রচনা করতেন। কাশী প্রসাদ ঘোষের সাহায্যে বাঙলার প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজনীতিই এই পত্রিকার উপজীব্য ছিল। নীলের হাঙ্গামার সময় তিনি দারোগার চাকরি করতেন। ১৮৬০ সালে অসুস্থতার জন্য এ চাকরি ত্যাগ করেন অতঃপর মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শেষে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার হন। তিনি মিশনারীদের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে মত বিরোধের ঘটনা বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ঢাকা থেকে শক্তি নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

'জন্মভূমি' 'প্রভাকর' 'বসরাজ' প্রভৃতি পত্রিকায় তার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। স্বগ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় এবং পোস্ট অফিস স্থাপন করেন। তার গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'সেকালের দারোগার কাহিনী' 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি।

www.pathagar.com

গিরিশচন্দ্র মজুমদার

গিরিশচন্দ্র মজুমদার ১৮৩৭ সালে বীরতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হৃদয় কৃষ্ণ। কিছুদিন গ্রামের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর বরিশালে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ১৮৬৬ সালে বৃত্তি ও পদকসহ ঢাকা পগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। বিক্রমপুর বিদ্যোৎসাহী সভার মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তার প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ 'স্বভাব দর্শন' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। তাছাড়া থিওডোর পার্কারের প্রার্থনা পুস্তক থেকে'প্রার্থনামালা' নামে একটি অনুবাদ সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহায়তায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য বরিশালে স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭১ সালে 'স্ত্রী জাতির উন্নতি বিধায়িনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী শিক্ষাদানের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন না। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য, বক্তা ও শিক্ষকরূপে তাঁর জীবন বিশেষ ঘটনাবহুল।

ভূবন মোহন দাশ

ভূবন মোহন দাশ ১৮৪৪ সালে তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। 'ব্রহ্ম পাবলিক ওপেনিয়ন' ও 'বেঙ্গল পাবলিক ওপেনিয়ন' পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৪ সালে তার মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা।

আনন্দচন্দ্র মিত্র

১৮৫৪ সালে বজ্রযোগিনী গ্রামে আনন্দচন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বঙ্গচন্দ্র। দীর্ঘকাল ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষকতা করার পর শেষ জীবনে কলকাতা কর্পোরেশনে উচ্চ পদে চাকরি করেন। ব্রাহ্ম মতাবলম্বী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর গুপ্তচক্রে বিপিন পাল, সুন্দরী মোহন দাস প্রমুখদের সঙ্গে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করে স্বদেশ প্রেমে এবং ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। সেই প্রতিজ্ঞা আজীবন তিনি রক্ষা করে গেছেন।

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তীকালের মহাকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট আসন আছে। প্রায় ১১টি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মিত্রকাব্য' ১ম (১৮৭৪), ২য় (১৮৭৭), 'হেলেনাকাব্য' ১ম ও ২য় এবং 'ভারত মঙ্গল' তাকে কবিখ্যাতি দিয়েছে। ভারত মঙ্গল' পূর্বখন্ড আধুনিক যুগ নিয়ে রচিত। তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রীতি সুস্পষ্ট।

কাব্য ছাড়া গদ্য ও পদ্যে পাঠ্য পুস্তক এবং রাগ প্রধান সঙ্গীতও রচনা করেছেন। পথিক ভনিতাযুক্ত তাঁর অনেক গান আছে। তাঁর 'ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা

www.pathagar.com

বালা' গানটি এককালে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। আনন্দচন্দ্রের 'পদ্যসার' 'পদ্য শিক্ষাসার' 'কবিতাসার' প্রভৃতি নীতিমূলক কবিতা আগ্রহ সহকারে মানুষ পাঠ করত।

কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদে 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি'? নামে একখানি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্গাত্মক নাটিকাও তিনি রচনা করেছিলেন। ১৯০৩ সালে তার মৃত্যু হয়।

মনোমোহন সেন

জন্ম বাংলা ১২৭২ সালে সোনারং গ্রামে। পিতা কবিরাজ প্যারীমোহন। শিশু-কিশোরদের সাহিত্য রচনায় তিনি একদা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'খোকার দপ্তর' (দুই ভাগ), 'মোহনভোগ', 'ফুলদানী', 'পরিতোষ','মণিকানন' প্রভৃতি। অভিনয়েও তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ১৯১২ সালে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

লাবণ্য প্রভা বসু

রাঢ়িখাল বসু পরিবারের কৃতি সন্তান লাবণ্য প্রভা বসু। তিনি সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত থেকে "আনন্দ মোহন বসুর দৈনিক জীবনী" "নীতি কথা" "গৃহের কথা" "পরিণয়" 'কবি ও কাব্যের কথা' 'পৌরাণিক কাহিনী' 'শ্রদ্ধায় স্মরণ' 'মাতা ও পুত্র' প্রভৃতি গ্রন্থগুলো রচনা করে গেছেন। তিনি মুকুল পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। ১৯১৯ সালে তার মৃত্যু হয়।

এমদাদ আলী

মুসলিম জাগরণের কবি হিসেবে পরিচিত সৈয়দ এমদাদ আলী ১৮৭৬ সালে বিক্রমপুরের টঙ্গীবাড়ি থানার দামপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার শিক্ষা ও বাল্যজীবন কাটে ঢাকাতে এবং কর্মক্ষেত্রও ছিল ঢাকা। তিনি পুলিশ বিভাগের উচ্চ পদে চাকরি করতেন। নিরহঙ্কার স্বভাবের কবি ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। তার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ডালি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। ডালিতে মোট ৩৩টি কবিতা স্থান পায়। দ্বিতীয় সংস্করণে কবি কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন করেন। সংযোজিত কবিতাগুলো হলো 'আলমগীর আওরঙ্গজেব' 'হযরত ওমরের লোকসেবা' 'মোহাম্মদ তোগলক' 'মোরদা তুমি জিন্দা হও' 'শেরশাহ' 'কান্ডারী' 'তোমার পদধ্বনি' 'বঁধূ আমার' 'বিক্রমপুর' 'জাগো জাগো মুসলমান' 'শ্রাবণ ঘন বরিষণে' 'কায়দে আযম স্মরণে' 'তুমি' 'স্মৃতি' 'ঐরমুক স্মরণে' 'প্রিয়তমা' ইত্যাদি। সৈয়দ এমদাদ আলী ছিলেন ইসলামী জাতীয়তার কবি।

তার পত্রপোন্যাস 'হাজেরা' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ পায়। তিনি 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে নবনূরের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায়। পত্রিকাটি তিন বছর নয়মাস কাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ১৮৮২ সালে মূলচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত গবেষক ও ইতিহাসবিদ। তার উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (সচিত্র) প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ২২ নভেম্বর ১৯০৯ সাল, 'কেদার রায়' (ষোড়শ শতকের বাংলার ইতিহাস। বাংলার বার ভূঁইয়ার কাহিনী ও কেদার রায়ের জীবনী কথা) প্রথম প্রকাশ ঃ ঢাকা ১৩২১ বঙ্গাব্দঃ বিক্রমপুরের বিবরণ প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ২ আগস্ট ১৯১৯। এছাড়া দ্রুব, প্রহলাদ, তানসেন, বঙ্গের মহিলা কবি তাকে অমর করে রেখেছে। বিশ্বভারতী শিশুকোষ তার অমর কীর্তি। ১৯৬৫ সালে তার মৃত্যু হয়।

পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্রমপুরের কৃতি সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। জন্ম ১৮৯৩ সালে। অনুবাদ সাহিত্যে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বহু ভাষার নামী-দামী লেখকের লেখা অনুবাদ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'চলমান জীবন' তার মৌলিক রচনা। ১৯৭৪ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দক্ষিনা রঞ্জন মিত্র

রূপ কথাকে অত্যন্ত প্রানবন্ত ও মোহনীয় করে প্রকাশ করতে যিনি অত্যন্ত স্বার্থকতার পরিচয় রেখেছেন সেই বিখ্যাত লেখক দক্ষিনা রঞ্জন মিত্রের বাড়ি বিক্রমপুরে।

জীবনানন্দ দাস

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি পুরুষ রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের লৌহজং এর গাউপাড়া। কীর্তিনাশার ভয়াল ছোবলে গাউপাড়া গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হবার পর পরিবারের সবাই বরিশাল শহরে চলে যান।

পিতা সত্যানন্দ দাস। মা কুসুম কুমারীও ছিলেন একজন কবি। পিতা শিক্ষক। কবি জীবনানন্দ দাস বরিশাল ব্রজমহন স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা ও ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯১৭ সালে আই,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা গিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে ইংরেজীতে অনার্স পাস করেন। অতপর ১৯২১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম,এ পরীক্ষায় পাস করে কোলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৩০ সালে শ্রীমতি লাবন্য গুপ্তকে বিবাহ করেন। এক সময় 'স্বারজ' নামক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। তার প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ ঃ ঝরা পালক (১৯২৮) ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২) মহাপৃথিবী (১৯৪৪) সাতটি তারার তিমির

www.pathagar.com

(১৯৪৭) রূপসী বাংলা (১৯৫৭) বেলা অবেলা কাল বেলা (১৯৬১) শ্রেষ্ঠ কবিতা (প্রথম পর্যায় ১৯৫৪, ২য় পর্যায় ১৯৬৮)। গল্প ঃ জীবনানন্দ দাসের গল্প। উপন্যাসঃ কাল্যবাস প্রবন্ধঃ কবিতার কথা।

অন্তর্মুখী ও প্রকৃতি প্রেমিক কবি জীবনানন্দ দাসের জুড়ি বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়জন নেই। দক্ষিণ কোলকাতার রাসবিহারী এভিনিউতে এক ট্রাক দূর্ঘটনায় জীবনানন্দ দাস গুরুতর আহত হয়ে ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

অজিত দত্ত

১৯০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুরে অজিত দত্তের জন্ম। তিনি কবি, অধ্যাপক ও সম্পাদক। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সে ভর্তি হন। বি.এ (অনার্স) ও এম.এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ছাত্র জীবন থেকে অজিত দত্তের সাহিত্যে হাতে খড়ি। আই.এ ক্লাসে থাকতেই তার লেখা ছাপা হতে শুরু করে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে 'প্রগতি' বের করেছিলেন। তিরিশের দশকের বিখ্যাত সাহিত্য পত্র 'কল্লোলের' নিয়মিত লেখক। বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতার' যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন তিনি। পরে 'দিগন্ত' নামে একটি সাহিত্যপত্র দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেন এবং দিগন্ত পাবলিসার্স প্রতিষ্ঠা করেন। কাব্য চর্চা ও পত্রিকা সম্পাদনার বাইরে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত রচনা লিখতেন ছদ্মনামে। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কুসুমের মাস ১৯৩০, সাদা মেঘ কালো পাহার (১৯৭১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সত্যেন সেন

সাহিত্যিক, রাজনীতিক শ্রী সত্যেন সেন বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের সেন পরিবারটি ছিল শিক্ষিত পরিবারগুলোর একটি। এ পরিবারে অনেক গুণীজন জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে সত্যেন সেনের কাকা শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। আর এক কাকা শ্রী মনোমোহন সেন ছিলেন শিশু সাহিত্যিক। সত্যেন সেন শিক্ষার ফাঁকে কৈশোরেই বৃটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের একজন সদস্য। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় প্রথম কারাবরণ। একটানা পাঁচ ছয় বছর কারাগারে ছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি বাংলায় এম.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। কারাবাসে থাকাকালেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পাওয়ার পরই শান্তি নিকেতন থেকে তাকে দেয়া হয়

www.pathagar.com

"গবেষণা বৃত্তি"। তিনি তা ফেলে চলে আসেন নিজের গ্রামের বাড়ী। জায়গা করে নেন কৃষকদের মাঝে, তাদের জাগাতে হবে। কিছুদিন গ্রামে কাজ করার পর চলে আসেন ঢাকায়। কাজ শুরু করলেন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। ১৯৪৪ সালে প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের গণসঙ্গীতে তিনি মাতিয়ে তুললেন ঢাকা। তখন সত্যেন-সাধন জুটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ সালে তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয় এবং তিনি গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর কারাবাস করেন। সেখানে বন্দীদের দাবী নিয়ে দীর্ঘ দিন অনশন করেন। ১৯৫৩ সালে মুক্ত হন। ৫৪ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। ১ বছর পর ১৯৫৫ সালে মুক্তি পান। ১৯৫৬ সালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং '৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশ করেন "মহাবিদ্রোহের কাহিনী"। ১৯৫৮ সালে আবার গ্রেফতার হন। এর মাঝে বেরিয়ে গেছে উপন্যাস "ভোরের বিহঙ্গ"। কারান্তরালে কাটান ৬৪ সাল পর্যন্ত। মুক্ত হয়ে তিনি শুরু করেন সাংবাদিকতা। প্রথমে মিল্লাত, পরে সংবাদে চাকুরী নেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে আবার গ্রেফতার হন। ৬৮ সালে গণ জোয়ারের প্রাক্কালে বেরিয়ে আসেন। ৬৯'র গণআন্দোলনকে সামনে রেখে তিনি অনেকগুলো গণ সঙ্গীত রচনা করেন। সত্তরের শুরুতেই তার হাঁপানি আর দৃষ্টিহীনতা শুরু। ২৫ শে মার্চের হত্যালীলা শুরু হলে তিনি চলে যান গ্রামের বাড়ী। সেখান থেকে কলকাতা। '৭১-এর অক্টোবরে চিকিৎসার জন্য তাকে পাঠানো হয় মস্কো। এই সময় তিনি লিখেন 'বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম' লেখেন 'বিশ্বমানবের মহাতীর্থে।' স্বাধীন বাঙলাদেশে এসে শুরু করেন সংবাদের কাজ, নিজের গড়া উদিচী নিয়ে ব্যস্ত এবং এ সময়ে অজস্র লেখা লিখতে থাকেন কিন্তু '৭৩ সালে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে তিনি চলে যান শান্তি নিকেতনে। সেখানেও শুধু লেখা আর লেখা। তিনি ১৯৮১ সালের ৪ই জানুয়ারী কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

সত্যেন সেন শুধু প্রগতিশীল বিপ্লবী নেতাই ছিলেন না একজন মহান লেখক, সংগঠক ও দৈনিক সংবাদের একজন জনপ্রিয় কলামিষ্ট ছিলেন। তার এই ৭৩ বছর বয়সে চব্বিশ বছর কাটিয়ে গেছেন কারাগারে, আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে চারবছর আর তেইশ বছরে রচনা করে গেছেন চল্লিশটিরও অধিক গ্রন্থ। উত্তরণ, সেয়ানা, অপরাজেয়, পদচিহ্ন, পুরুষমেধ আলবেরুনী, পাপের সন্তান, এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে, বিদ্রোহী কৈবর্ত, ভোরের বিহঙ্গ, অভিশপ্ত নগরী, রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ, মা, কুমার জীব বা সাত নম্বর ওয়ার্ড। বাংলাদেশে কৃষক সংগ্রাম/ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম/বিশ্বমানবের মহাতীর্থে/মহাবিদ্রোহের কাহিনী/গ্রাম বাংলার পথে পথে/মসলার যুদ্ধ/মেহনতী মানুষ/শহরের ইতিকথা/মনোরমা মাসিমা/রহমান মাষ্টার/প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ/সীমান্ত সূর্য গাফফার খান/মানব সভ্যতার উপলগ্নে ইরান/ কমরেড মনি সিংহ (আলতাফ আলী ছদ্ম নামে)। এটমের কথা/জীববিজ্ঞানের নানা কথা/আমাদের এই

www.pathagar.com

পৃথিবী/আইসোটোপের কথা/ইতিহাস ও বিজ্ঞান (৪ খণ্ডে সমাপ্ত, দুইখণ্ড প্রকাশিত)। পাতা বাহার। তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মা নদীর মাঝি ও পুতুল নাচের ইতি কথার মতো জীবন ঘনিষ্ঠ উপন্যাসের জনক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে। ১৯০৮ সালে পিতা হরিহরের কর্মস্থল দুমকায় জন্মগ্রহণ করেন। মা নিবোদা সুন্দরীর গ্রাম গাউদিয়া। বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ নাম মানিক বন্দোপাধ্যায় ৫০ টিরও অধিক উপন্যাস, অসংখ্য গল্প কবিতা রচনা করে গেছেন। 'অতসী' মাসী নামে গল্প লিখে ছাত্রাবস্থায়ই সকলকে চমকে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে তিনি পেশাদার লেখক হয়ে ওঠেন। ১৯৩২ সাল থেকে একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ গুলোর মধ্যে "অমৃতস্য পুত্র" 'জননী' 'দিবা রাত্রির কাব্য' অতসী মাসী ও অন্যান্য গল্প 'পুতুল নাচের ইতকিথা' 'পদ্মা নদীর মাঝি' 'জীবনের জটিলতা' 'চিহ্ন'। এই সমস্ত গল্প উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে চলচিত্রে রূপায়িত হয়। তিনি একজন প্রগতিশীল লেখক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তার মৃত্যু হয়।

বুদ্ধদেব বসু

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, অনুবাদক সম্পাদক সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের মালখাঁনগর গ্রামে। তিনি ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল কাটে নোয়াখালীতে। স্থানীয় স্কুলে পড়ালেখা করেন। তের বছর বয়সে ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩১ সালে ইংরেজী সাহিত্যে এম,এ, পাশ করেন। অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনের শুরু। কলকাতার রিপন কলেজে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় সম্পাদনায় হাত দেন। তখন 'প্রগতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিছুকাল ষ্টেটম্যান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৬-১৯৬৩ পর্যন্ত সময়কাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা মূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা থেকে তিনি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর কবিতা আন্দোলনে এ কবিতা পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পদচারনা করে তিনি প্রায় ১৪০ টির মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহঃ **কবিতা** ঃ মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পরে (১৯৩৩) কলাবতী (১৯৩৭), দ্রৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮), দয়মন্তী (১৯৬৩), শীতে প্রার্থনা বসন্তের (১৯৬৫), যে আঁধার আলোর অধিক, নতুন পাতা, মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬) **উপন্যাস** ঃ সাড়া (১৯৩০), রডোডেন ড্রেন গুচ্ছ

www.pathagar.com

(১৯৩২), সানন্দা (১৯৩৩) লাল মেঘ (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথি ডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১),মৌলিনাথ (১৯৫২),নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাত ভরে বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), **গল্প গ্রন্থ** ঃ অভিনয় অভিনয় নয় (১৯৩০), বোয়াচিত (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৪), একটি জীবন কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০), হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮ বাং), ভাস আমার ভেলা (১৯৬৩), **প্রবন্ধ** ঃ হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্য চর্চা (১৩৬৩ বাং), রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), **ভ্রমণ কাহিনী** ঃ সর্ব পেয়েছির দেশ (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬), **নাটক** ঃ মায়া মালঞ্চ (১৯৪৪), তপসী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬), কলিকতার ইলেকট্রা ও সত্য মন্ধ (১৯৬৮), ইংরেজী An Acre of Green Gra. (১৯৪৮) এছাড়া ছোটদের জন্য বারো মাসের ছড়া (১৯৬৬) অনুবাদ করেছেন প্রচুর। **গান** ঃ (১৯৬৬) শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৪৩ শ্রেষ্ঠ কবিতা ২য় পর্যায় (১৯৭০) ১৯৬৭ সালে তপস্বী ও তার তরঙ্গিনী নাটকের জন্য একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। কালজয়ী এই সাহিত্য সাধক ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

সুবোধ ঘোষ

বাংলা কথা সহিত্যে সুবোধ ঘোসের আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জীবন-জীবিকায় বহু পথ ঘুরে একটু বেশি বয়সেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। গল্প লেখার কথা কখনো ভাবেননি । একটি ঘরোয়া সাহিত্য আসরে বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে লিখে ফেলেন জীবনের প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক'। এর পর 'ফসিল'। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান তিনি।

বিখ্যাত এ কথাসাহিত্যিকের আদি নিবাস বিক্রমপুরের বহর গ্রামে। জন্ম ১৯০৯ সালে হাজারিবাগে। কৈশর শৈশব কেটেছে সেখানেই। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি কখনো টিওসনি ,বা কন্ট্রাকটারি, ট্রাক ড্রাইভারী, ও সার্কাস পার্টিতেও কাজ করেছেন। এমনকি বোম্বাইতে তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে কিছুদিন ঝাড়ুদারের কাজও করেছেন। বহু বিচিত্র পথ ঘুরে ত্রিশের দশকে আনন্দ বাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয় বিভাগে যোগ দেন। এর পর সিনিয়র এডিটর, অন্যতম সম্পাদকীয় লেখক। সুবোধ ঘোসের বহু গল্প-উপন্যাস চলচিত্রায়িত হয়েছে। স্বীকৃতি হিসেব পেয়েছেন আনন্দপুরস্কার, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিনী পদক। বাংলা সাহিত্যের এই কৃতিমান লেখক সুবোধ ঘোষ ১৯৮০ সালের ১০ই মার্চ মৃত্যু বরণ করেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নাসির আলী

"অর্থলোভে তাঁকে কখনো নীতিচ্যুত হতে দেখিনি। গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রয়ে আগ্রহী গ্রন্থকারকে তিনি বরং নানা ভাবে বুঝিয়ে বিরত রেখেছেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে হিসেব পত্রে কখনো কোন রূপ ভুল বোঝাবুঝি হতে দেখিনি। টাকা চেয়ে গ্রন্থকারকে কখনো খালি হাতে ফিরে যেতে দেখিনি। হিসেবে অস্পষ্টতা বা গরমিল আছে এমন কথাও কোনদিন কোন গ্রন্থকারের কাছে শুনিনি। দেশের অন্যান্য প্রকাশক এবং লেখক সমাজ তাঁর কাছে নৈতিক ভাবে ঋণী হয়ে আছে"। মোহাম্মদ নাসির আলী সম্পর্কে কবি আহসান হাবীবের উপরোক্ত উক্তিই প্রমাণ করে নাসির আলী কত মহৎ প্রাণ প্রকৃত লেখক ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন বলেই লেখক সমাজের প্রতি তাঁর আচরণ এমন তুলনাহীন ছিল। মোহাম্মদ নাসির আলী একজন প্রকৃত লেখক আর প্রকাশকের নাম।

মোহাম্মদ নাসির আলী বিক্রমপুরের অন্তর্গত লৌহজং-এর ধাইদা গ্রামে ১৯১০ সালের ১০ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহাম্মদ আলী ও মা বেগম কসিমুন্নেছা। তিনি বাবা মার এগার সন্তানের মধ্যে তৃতীয়। মোহাম্মদ নাসির আলী তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন তার পিতার কর্মস্থল গোয়ালন্দে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাকে সেখাইে অবস্থান করতে হতো। অবশ্য মোহাম্মদ নাসির আলী একটু বড় হতেই গ্রামের বাড়ী ফিরে আসেন এবং দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ীতে অবস্থিত কালিমোহন দুর্গামোহন ইনষ্টিউটশনে পড়ালেখা শুরু করেন।

১৯২৬ সালে অংক শাস্ত্রে স্বর্ণপদক সহ প্রথম বিভাগে তিনি মেট্রিক পাশ করে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে আই, এ পাশ করেন। তার শিক্ষা জীবন শেষ ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, কম, ডিগ্রী লাভের পর। তিনি ১৯২৯ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ম্যাগাজিন সম্পাদক ছিলেন।

শিশু সাহিত্যের দিকপাল মোহাম্মদ নাসির আলীর ছেলেবেলা থেকেই লেখক হবার উদগ্র বাসনা ছিল। তখন তার গ্রামে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সম্পাদিত শিশুদের 'সন্দেশ' পত্রিকাটি নিয়মিত আসত তা দেখে তিনি সুকুমার রায় ও উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর মতো লেখক হবার বাসনা পোষণ করতেন। গ্রামে থেকেই তিনি পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন।

পড়ালেখার পাট চুকিয়ে তিনি কলকাতা চলে যান চাকুরীর জন্য। কলকাতা হাইকোর্টে চাকুরী নিয়ে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হন। এর আগেই গোয়ালন্দ দোকান এক বন্ধুর হেফাজতে রেখে যান। পিতাও স্বগ্রামে চলে আসেন। চাকুরীর সাথে সাথে চলতে

www.pathagar.com

থাকে সাহিত্য সাধনা। তিনি সেখানকার প্রতিটি সাহিত্য গোষ্ঠীর সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে হাজী মোহাম্মদ মোহসীন স্মৃতি পাঠাগার। মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী।

সরকারী চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্য পত্রিকাগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়েন। সওগাত, ইত্তেফাক এগুলোর মধ্যে অন্যতম। সে সময় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মনোজ বসু, কমরেড মোজাফফর আহমদ, সুফী জুলফিকার হায়দার, মোহাম্মদ মোদাব্বের, সুর শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহম্মদ, কবি গোলাম মোস্তফা ছিল তার নিবিড়তম বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন।

কবি নজরুল ইসলামের নামকরণ নিয়ে বন্ধুদের উৎসাহে তিনি এবং তার বন্ধু আইনুল হক খান মিলে কলকাতার ৪৭/১ মির্জাপুর স্ট্রীটে 'নওরোজ' লাইব্রেরী নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স' দুটি বই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু।

দেশ বিভাগের পর তিনি বদলি হয়ে চলে আসেন পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টে। ঢাকায় এসে সেই দু'বন্ধু মিলে আবার নওরোজ কিতাবিস্তান নামে প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলেন। ১৯৭৯ সালে মোহাম্মদ নাসির আলী আজাদের মুকুলের মাহফিল পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। ছোটরা ভালবেসে তাকে ডাকতো বাগবান। মোহাম্মদ নাসির আলীকে তার লেখক সত্তাই প্রকাশক হতে সহায়তা করেছে। তিনি ছিলেন কর্ম পাগল। শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য রচনার জন্য মোহাম্মদ নাসির আলী সম্মানিত হন আন্তর্জাতিক ইউনেস্কো পুরস্কার সহ কয়েকটি পুরস্কারে। অন্য দিকে প্রকাশনায় অসামান্য অবদানের জন্য ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে ১৯৬৯ সালে তাকে যোগ দিতে হয় করাচিতে পুস্তক প্রকাশনা বিষয়ক শিক্ষা শিবিরে।

১৯২৭ সালে লেখক মোহাম্মদ নাসির আলীর আত্মপ্রকাশ। তারপর তার অজস্র লেখা ছাপা হতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত বেরুতে থাকে তার শিশুতোষ লেখাগুলো। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রচনা থেকে চিরায়ত সাহিত্য তার হাত দিয়ে বেরিয়েছে। তিনি অজস্র বই লিখেছেন যা শিশু কিশোরদের কাছে সুপ্রিয়। তার মধ্যে মনি কণিকা, শাহী দিনের কাহিনী, আলীবাবা, বোকা বকাই, রাউন্ডদি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ, লেবু মামার সপ্তকান্ড, বীরবলের খোশ গল্প, যোগাযোগ, চীন দেশের রাজকুমারী, টলস্টয়ের সেরা গল্প, ট্রেজার আইল্যান্ড, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ভিনদেশী এক বীরবল, বারশো বানরের পাল্লায়, গালিভার্স ট্রাভেল, ভিনদেশী গল্প, সাত পাঁচ গল্প, ছোটদের ওমর ফারুক, আলীফ লায়লার গল্প, ইটালীর জনক গ্যারিবল্ডী, একটি গোয়েন্দা কুকুরের কাহিনী, সোনার চরকা, তিমির

www.pathagar.com

পেটে কয়েক ঘণ্টা, ছোটদের ভাল গল্প, বীরের মতো বীর, মোহাম্মদ বিন কাসেম, ছোটদের আলমগীর, বোবারা সব কালা ও যৌতুক নামক বইগুলো প্রধান। ইবনে বতুতার সফরনামা মূলত বড়দের জন্য অনুবাদ গ্রন্থ। এ ছাড়া আরো অপ্রকাশিত কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তিনি শিশু সাহিত্যের জন্য ১৯৬৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমীর শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য পুরস্কার পান। অপূর্ব শিশুতোষ প্রকাশনার জন্য ভিনদেশী এক বীর বল ১৯৬৮ সালে জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার পায়।

বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শিশুদরদী মোহাম্মদ নাসির আলী এগিয়ে গেছেন তার অভিষ্ট লক্ষ্যে।

১৯৭৫ সালের ৩০ জানুয়ারী হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তার দু'ছেলে এনায়েত রসুল লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে এবং ইফতেখার রসুল জর্জ লেখক হিসেবে এবং প্রকাশনা ব্যবসায় ইতিমধ্যেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

যুগান্তর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু ১৯১২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি এবং সাংবাদিক। পশ্চিম বাংলার কবিদের মধ্যে তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তার কাব্যগ্রন্থগলোর মধ্যে 'আরও সূর্যের কাছে' (১৯৬২) 'অলক্ষ্যে বিকেল' (১৯৬৫), 'আশা যখন বৃষ্টি' (১৯৬৮) 'রাত্রকে দিনকে' (১৯৬৯)। তা ছাড়া বহু পত্রপত্রিকা সম্পাদনার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

প্রতিভা বসু

প্রতিভা বসু দুই বাংলার পরিচিত একজন সাহিত্য ও সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। ছোটবেলা থেকেই কিন্নরকণ্ঠী। রানু বেগম নামে তার একাধিক গানের রেকর্ড বের হয়। প্রথম রেকর্ড এগার বছর বয়সে। একসময় গ্রামোফোন কোম্পানির সংগে বাইরে ছবি রেকর্ডের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। বিবাহ পরবর্তী জীবনে সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দেন।

প্রথম মুদ্রিত রচনা 'নবশক্তি' নামে সাপ্তাহিক কাগজে একটি গল্প ও প্রথম কবিতা ভারতবর্ষ নামের পত্রিকায়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'মনোলীনা'। তার একাধিক গ্রন্থ চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়। জীবনের জলছবি তার স্মৃতিচারণমূলক একটি গ্রন্থ। উল্লেখ্য, তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর পত্নী। জন্ম ১৯১৫ সালে বিক্রমপুরের হাঁসাড়া গ্রামে।

www.pathagar.com

সমরেশ বসু

উভয় বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু ১৯২৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর বিক্রমপুরের সিরাজদিখার রাজানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কিশোরকাল কাটে পুরনো ঢাকায়। পরে নৈহাটি স্কুলে ভর্তি হন। দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠেন। একজন লেখক হয়ে উঠতে তাকে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়। তিনি কালকুট ছদ্মনামে লিখতেন। তার বিখ্যাত উপন্যাসগুলো ঃ বিবর, প্রজাপতি, বিটি রোডের ধারে, নয়নপুরের মাটি, গঙ্গা, বাঘিনী, জগদ, পদক্ষেপ, ছুটির ফাঁদে, বিকেলে ভোরের ফুল, নিঠুর দরদী, মহাকালের রথের ঘোড়া, যুগযুগ জিয়ো প্রভৃতি। প্রজাপতি উপন্যাসের জন্য তাকে জেল খাটতে হয় এবং বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কালকুট ছদ্মনামে তিনি অমৃত কুম্ভ সন্ধানে, শাম্ব, কোথায় পাব তারে লেখেন। অমৃত কুম্ভ সন্ধানে ও শাম্ব বহু প্রশংসিত উপন্যাস। এই গুনি ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে ১৯৮৮ সালে কলকাতায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় উপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালের ২রা নভেম্বর তার পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলে চাকুরী করতেন। সেই সুবাদেই নানা জায়গায় পিতার সাথে তাকে পরিচিত হতে হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। পরে আসাম, বিহার, পূর্ব বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে কুচবিহার মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা চলে এবং বোডিং এ জীবন যাপন করেন। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা করেন। স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক। তার প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় বেরোয়। ঘুন পোকা, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ী, মানব জমিন সহ প্রায় শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৮৫ সালে বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেন। এর আগে আনন্দবাজার পত্রিকা এ সুসাহিত্যিককে পুরস্কৃত করেন।

রাবেয়া খাতুন

কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুন বিক্রমপুরের কৃতি সন্তান। তার বাড়ি শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রামে। জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর নানা বাড়ি পাউসার গ্রামে। মা হালিমা খাতুন। বাবা মোহাম্মদ মুল্লুক চাঁদ। চার সন্তানের জননী-সাগর, কেকা, প্রবাল, কাকলী। বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারি। বদলির চাকরি। রাবেয়া খাতুনের শৈশব কৈশোর তাই কেটেছে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন শহর ও পুরান ঢাকায়।

www.pathagar.com

ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি শুরু। মূলত ঔপন্যাসিক হলেও সাহিত্যের সব শাখায় রয়েছে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। লিখেছেন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, অসংখ্য ছোটগল্প, নাটক, স্মৃতিকথা, কিশোর সাহিত্য, নতুন মাত্রা যোগ করেছেন ভ্রমণ কাহিনীতে।

এক সময় শিক্ষকতা করতেন। সাংবাদিকতায় ছিলেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে লেখালেখির কাজে নিবেদিত।

প্রিয়পাঠ্য সাহিত্য ছাড়াও দর্শন, ইতিহাস, জ্যোর্তিবিজ্ঞান। শখ দেশ ভ্রমণ। ঘুরেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। প্রচুর আসক্তি সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও নাটকে। উপন্যাসের জন্য সম্মানিত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদক' এবং বাংলা একাডেমী সহ আরও দেড় ডজন পুরস্কারে।

সানাউল হক খান

বর্তমান সময়ের শক্তিমান কবি সানাউল হক খান ১৯৪৫ সালের ৩রা জানুয়ারী সিরাজদিখান থানার সৈয়দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আশরাফ উল খান।

কবি সানাউল হক খান মধ্য ষাটের সময় থেকে নিয়মিত লিখছেন। এরই মধ্যে তার কবিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন হাজার। প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি কবিতার বই- ১। অন্ধ করতালি ১৯৮০, ২। জন্মগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ ১৯৮৪, ৩। দুঃখ নয় দীর্ঘ পরিণাম ১৯৮৫, ৪। লুব্ধ প্রার্থনা ১৯৮৬, ৫। দুখী বাংলার বেথেলহেমে ১৯৮৯। এছাড়া তার অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায়।

কবিতা ছাড়াও তিনি লিখেছেন অসংখ্য মনস্ক প্রবন্ধ এবং কলাম। তিনি ক্রীড়া জগতেরও একজন খ্যাতিমান লেখক। এ বিষয়ে তার অনেক উল্লেখযোগ্য লেখা রয়েছে। 'ছন্দে ছন্দে খেলার আনন্দে' তার একটি খেলাধুলা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য ছড়াগ্রন্থ। এ ধরনের বই উভয় বাংলার লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম লেখেন। এছাড়া তার বহু লেখা বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং কাব্য সংকলনে স্থান পেয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে কবি সানাউল হক খান একজন দৃঢ় চেতা, সৎ ও সাহসী মানুষ। কোন রকম অন্যায় অনিয়ম, নীচতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্যক্ষেত্র-যেখানেই অন্যায় ঘটতে দেখেন, অবিচার লক্ষ্য করেন সেখানেই তার কণ্ঠ উচ্চকিত হয়। তাইতো এদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান তার সম্পর্কে বলেন 'সানাউল হক খানের সংসারে দারিদ্রের ছায়া থাকতে পারে, কিন্তু কবি সানাউল হক খানের মনুষ্যত্ব এবং কাব্যের সংসারে দারিদ্র নেই, এই সংসার তার উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

রশীদ সিন্‌হা

এক নিভৃতচারী আড়াল প্রিয় শিশু সাহিত্যিকের নাম রশীদ সিন্‌হা। ১৯৪৬ সালে ৭ই জুন লৌহজং থানার ডহুরী গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন।মূলত ছড়াকার হলেও শিশু কিশোরদের জন্য ছোট গল্প ও সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন প্রচুর। ১৯৬৫ সালে তার প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পের নাম 'কবর' চিচিং ফাক নামে প্রকাশ করেন আইয়ুব বিরোধী ছড়া সংকলন।

লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প। শিশু সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন খেলাঘর এ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিভৃতচারি ও আড়াল প্রিয় মানুষ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত।

হুমায়ুন আজাদ

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী কবি, সাহিত্যিক, গবেষক হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে প্রথম বিভাগে ১৯তম স্থান অধিকার করে এস.এস.সি, ১৯৬৭ সালে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি.এ. অনার্স ও অনুরূপ কৃতিত্বের সাথে একই বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৭১ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি লাভ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে তার কর্ম জীবন শুরু। ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন এবং অদ্যাবধি একই প্রতিষ্ঠানে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

একই সাথে তিনি কবি, প্রাবন্ধিক, ভাষা বিজ্ঞানী, সমালোচক, সম্পাদক ও শিশু সাহিত্যিক। তার রচিত গ্রন্থ সমূহ ঃ প্রবচন ও গুচ্ছ নারী লিখে তিনি পাঠক সমাজে ঝড় তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

আবদুর রাজ্জাক

হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক ১৯৪৭ সালে লৌহজং থানার কনকসার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ও ৬৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে একই সালে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। তিনি সাহিত্য সাধনায়ও নিয়োজিত হন। 'ধন বিজ্ঞান' ও 'হে মুজিব বিদায়' তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ। বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকায় এবং জাতীয় দৈনিক সমূহে তার লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। ১৯৬৮ সাল থেকে হরগঙ্গা সরকারী মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন সহ মুন্সীগঞ্জের সমাজ সেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে

www.pathagar.com

নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সম্প্রতি 'আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী' নামে একটি চটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন যাতে বিক্রমপুরীর প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

ইফতেখার রসুল জর্জ

লেখক, প্রকাশক ইফতেখার রসুল জর্জ ১৯৫০ সালের ২২শে জুলাই বিক্রমপুরের লৌহজং এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলীর জেষ্ঠ্য পুত্র।

জনাব ইফতেখার রসুল জর্জ রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাষ্টার্স করার পর প্রকাশনা শিল্পে দেশ-বিদেশে মোট চারটি প্রশিক্ষণ নেন। এর মধ্যে Asia Pacific Cultural Centre for UNESCO, Tokyo উল্লেখযোগ্য। রাজনীতি, অনুবাদ সাহিত্য ও শিশু সাহিত্য মিলে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টি। এর মধ্যে 'উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র', 'জনগণই ক্ষমতার উৎস', 'মধ্যরাতের বাংলাদেশ', '৭১ থেকে ৮১ এবং অতপর', 'মোল্লা নাসীরুদ্দিনের গল্প', 'ঈশপের কল্পগল্প'', 'কীর্তিমানদের কীর্তি', 'জাপানের রূপকথা', 'ভীন দেশী ভূতের গল্প' (সম্পাদনা), 'কিশোর বিজ্ঞান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রচুর গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন তিনি। ব্যক্তিগত ও সরকারী প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন অসংখ্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায়। ঘুড়েছেন জাপান, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। কাজ করেছেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত নতুন দেশ, পূর্ব দেশ ও New link পত্রিকায়। বর্তমানে তিনি নওরোজ সাহিত্য সম্ভারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন নতুন নতুন বই। উল্লেখ্য জনাব ইফতেখার রসুল জর্জ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ

কবি ও সাংবাদিক জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ ১৯৫০ সনের ৭ই অক্টোবর ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার লস্করপুর গ্রাম। বাবার নাম মোহাম্মদ উল্লাহ আবদুল জলিল।

জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ এবং অফিস ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত দৈনিক নবজাত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের ৬ই আগস্ট পর্যন্ত শ্রীনগর ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপনা করেন। ১৯৮০ থেকে পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ

www.pathagar.com

কমিশনার গণসংযোগ এবং স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয়ের অধিনে আনছার ভিডিপি অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রতিরোধ পত্রিকার সম্পাদক কাম প্রশাসক পদে নিয়োজিত আছেন।

জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ বাংলাদেশ স্কাউটের জাতীয় উপ-কমিশনার গণসংযোগ হিসেবে দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষা ও স্কাউট বিষয়ক ২য় এশিয়া প্যাসেফিক রিজিওনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন জাপানের টোকিও নগরীতে। সেই সাথে হংকং সফর করেন।

জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ মূলতঃ কবি। এ পর্যন্ত তার যে সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ সুখের ঠিকানা, সুগঠিত হাত, ইদানিং , ট্রিওলেট, সঠিক সময়, Best Wishes '৯৩। আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'বেস্ট উইসেস' কাব্য গ্রন্থটির জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর লিখিত চিঠিতে শুভেচ্ছাসহ প্রশংসা পেয়েছেন। এছাড়াও তিনি ইংল্যান্ডের ক্যামব্রীজস্থ ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক্যাল সেন্টার কর্তৃক 'টুয়েনটিথ সেঞ্চুরী এওয়ার্ড'-এর জন্যও মনোনীত হয়েছেন। তিনি রেডিও বাংলাদেশ ও টেলিভিশনে তালিকাভুক্ত গীতিকার। গজল রচনা করে তিনি বাঙলাদেশ সীরাত মিশনের সাহিত্য পুরস্কারও লাভ করেন। জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'জীবন সাফল্যের অনুষঙ্গে'র জন্য ১৯৮৩ সালে পারাবার সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তার প্রকাশিত অন্যান্য বইগুলো হচ্ছে ঃ

ছোট গল্পঃ বিপন্ন বিবেক '৮৩, উপন্যাস ঃ নিলাজ নিন্দুক '৮৪, ছড়া ঃ উলুক ভুলক বোকা ভালুক '৮৬, এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ '৯২, প্রবন্ধ ঃ ভালো মানুষের প্রত্যাশা '৮৫, অবয়ব '৮৯, গান ঃ কথা কবিতা কথা হলো গান '৮৩, ইচ্ছে করে গান করি '৮৪ নাটক ঃ শাপলা ফোটার দিন '৯২, পুনর্মিলন '৬৮

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কথক '৭৯, বাংলাদেশের নির্বাচিত গল্প যৌথ সম্পাদনা '৮২, বেহালা '৯১, অনুপ্রাস নির্বাচিত কবিতা ১৯৯১।

সাহিত্য কর্মের জন্য কবি পরবর্তীতে বিকাশ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), চৌধুরী রিয়াজ উদ্দীন স্মৃতি পদক (১৯৮৯) ও মাওলানা ভাসানী স্মৃতি সংসদ স্বর্ণ পদক (১৯৯১) এবং কবি জসীম উদ্দীন পরিষদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯২) লাভ করেন।

ইমদাদুল হক মিলন

বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের জন্ম ১৯৫৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর লৌহজং থানার পয়সা গ্রামে। সেই গ্রামে কখনও বসবাস করা হয়নি। বালক বেলার বেশ কিছু সময় কেটেছে এই একই থানার মেদিনিমন্ডল গ্রামে নানির কাছে। তারপর ঢাকায়। ঢাকার গেন্ডারিয়া হাইস্কুল থেকে এস,এস,সি। পরবর্তী পড়াশুনা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, অনার্সসহ অর্থনীতিতে স্নাতক।

www.pathagar.com

মিলনের প্রথম রচনা ছোটদের গল্প 'বন্ধু' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। তখন তিনি আই.এস.সি পড়েন। প্রথম উপন্যাস যাবজ্জীবন বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। এই উপন্যাস পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। জীবন বদলের আশায় ১৯৭৪-১৯৮১ পর্যন্ত কাটিয়েছেন জার্মানীতে। সেই দুর্বিসহ অভিজ্ঞতার রচনা 'পরাধীনতা' মিলনকে পৌছে দিয়েছে খ্যাতির শীর্ষে। অবশ্য প্রথম গ্রন্থ ভালবাসার গল্প থেকেই তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত, পাঠকপ্রিয়। বাংলাদেশে সাহিত্যের পাঠক সৃষ্টিতে তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার তার যোগ্যতার স্বীকৃতি। এছাড়া পেয়েছেন বিশ্ব জ্যোতিষ পুরস্কার ১৯৮৬,. ইকো সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৭, হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার ১৯৯২, নাট্য সভা পুরস্কার-১৯৯৩, পদক ১৯৯৩, বিজয় পদক ১৯৯৪, মনু থিয়েটার পদক ১৯৯৫, যায় যায় দিন পত্রিকা পুরস্কার ১৯৯৫, টেনাসিস পুরস্কার ১৯৯৫, ছোটদের কাগজ পুরস্কার ১৯৯৮, মাদার টেরেসা পুরস্কার ১৯৯৮, সুলতান পুরস্কার ১৯৯৯।

জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম মমতায় তিনি তার বিভিন্ন নাটক, উপন্যাসে বিক্রমপুরকে তুরে ধরেছেন। বিক্রমপুর নামটিকে সরকারী নথিভুক্ত করার জন্য সম্প্রতি তিনি ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।

মোহাম্মদ হান্নান

ডঃ মোহাম্মদ হান্নান কবি ও লেখক। জন্ম বিক্রমপুরের সোনারং। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছেন। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, (১৮৩০-১৯৬৯) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৩-১৯৬৯) গ্রন্থের লেখক তিনি। 'প্রিয়জনের ছবি' নামে তার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন দৈনিকের নিয়মিত লেখক। কর্মজীবনে তিনি বি, সি, এস ক্যাডারের একজন সদস্য এবং বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন।

মুনীর মোরশেদ

কথা সাহিত্যিক, গবেষক ও প্রামান্য চিত্রকর মুনীর মোরশেদ ১৯৫৭ সালের ২ আগস্ট সভ্যতার আদি জনপদ বিক্রমপুরের লৌহজং থানার ঝাউটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

প্রয়াত পিতা সুলতান আহমেদ ছিলেন কিংবদন্তীর প্রধান শিক্ষক। সুলতান আহমেদ বৃটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করে যোগ দেন, লৌহজং-এর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রাহ্মনগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে।

www.pathagar.com

এই বিদ্যালয়েই মুনীর মোরশেদ এর শিক্ষাজীবন শুরু। ১৯৭৩ সালে তিনটি লেটারসহ প্রথম বিভাগে এস, এস, সি পাশ করেন। ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞানে বি,এস, এস (সম্মান) সহ এম, এস, এস ডিগ্রী লাভ করেন। সাংবাদিকতা ও বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কিছুকাল চাকরি করার পর ১৯৮৪ সালের শেষার্ধে তিনি প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরি 'সহকারী নিবন্ধক' পদে যোগদান করেন সমবায় অধিদফতরে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সাল অব্দি তিনি প্রেষণে ছিলেন তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, পর্যায়ক্রমে কৃষি প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, ত্রান মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব ও নৌ পরিবহন মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব। অতঃপর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে সরকারি চাকরি ত্যাগ করে মুনীর মোরশেদ মনোনিবেশ করেন পুস্তক ব্যবসায়। বর্তমানে দেশের খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ' ' ঘাস ফুল নদী'র নির্বাহী পরিচালক। স্কুল জীবন থেকেই মুনীর মোরশেদ-এর লেখালেখি শুরু। ১৯৭৩ সালে প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় দৈনিক পূর্বদেশ এর শিশুদের পাতায়।

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'অবারিত রৌদ্রের ঠিকানায়' ১৯৮৯ সালে গল্পগ্রন্থ 'ধবল জ্যোৎস্নায়' এবং ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় গবেষনা গ্রন্থ 'সিরাজ সিকদার ও পূর্ববাংরার সর্বহারা পার্টিঃ ১৯৬৭-১৯৯২'। উল্লেখ্য, এই গবেষনা গ্রন্থটি দুই বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শ্রীঘ্রই বইটির কোলকাতা সংস্করনও প্রকাশিত হচ্ছে।

মুনীর মোরশেদ প্রামান্য চিত্রের একজন খ্যাতনামা গবেষক ও চিত্রনাট্য রচয়িতা। বিটিবিতে প্যাকেজ অনুষ্ঠানের আওতায় প্রচারিত জনপ্রিয় ধারাবাহিক প্রামান্যচিত্র 'দেখা-অদেখার গবেষনা ও চিত্রনাট্যের রচনা তাঁরই।

উল্লেখ্য, 'দেখা-অদেখা' ধারাবাহিক প্রামান্য চিত্রটি সার্কভুক্ত দেশসমূহ যথা' ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের জাতীয় প্রচার মাধ্যমেও প্রচারিত হয়ে থাকে। গবেষক ও প্রামান্য চিত্রকর মুনীর মোরশেদ বর্তমানে বাংলাদেশের নদীর ওপর ধারাবাহিক প্রামান্যচিত্র নির্মানের কাজ করছেন।

ঢালী মোহাম্মদ দেলোয়ার

ঢালী মোহাম্মদ দেলোয়ার ১৯৫৮ সালের ১৫ অক্টোবর বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানাধীন শমষপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হাজী মোঃ হাছেন ঢালী মা মোসাম্মৎ আঞ্জুমান আরা বেগম। ১৯৮২ সাল থেকে লেখালেখি শুরু। 'মোহনা অনেক দূর' নামে তার একটি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। 'শিখা' নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেছেন। অধ্যক্ষ বি এম রহমান সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। পালক শিশু সাহিত্য

www.pathagar.com

সংসদ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও যুগ্ম সচিব। তিনি একজন লোক সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতা। ১৯৯৮ সনে 'অন্যরকম ছড়া' নামে ছড়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত গীতিকার। তার রচিত গান নিয়ে মিক্সড এ্যালবাম প্রেমিক যদি হয় কালো শিরোনামে বেরিয়েছে এবং স্বকণ্ঠে নিজের লেখা গান নিয়ে একদিন যেতে হবে রে ও দয়াল মুর্শিদ নামে দুইটি সলো এ্যালবাম বেড়িয়েছে। ক্ষমতার লড়াই, নিষ্পাপ বধু, ঘাটের মাঝি, নয়া বাইদানী নামে তার অভিনীত চারটি ছায়াছবি মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া ইটিভি প্রচারিত জীবনের কত রং বিটিভিতে লক্ষ্মী সরদারনী এবং এটিএন বাংলায় জীবন যেখানে শেষ নাটকে অভিনয় করেন।

ঢালী মোহাম্মদ দেলোয়ার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও জড়িত আছেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির (২০০০-২০০১) সাংস্কৃতিক সচিব এবং আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম এবং বিক্রমপুর ফাউণ্ডেশনের জীবন সদস্য। বাংলাদেশ জাতীয় গীতি কবি পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য, মরমী লোকগীতি শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি। বিক্রমপুর সাংস্কৃতিক সংসদ এর সাধারণ সম্পাদক, মনোয়ার স্মৃতি পরিষদের সভাপতি। অধুনালুপ্ত গ্রুপ থিয়েটার সমকালীন নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও কবি সংসদ বাংলাদেশ এর সহ-সভাপতি। মঞ্চেও তিনি অসংখ্য নাটক করেছেন। বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

জাকারিয়া রফিক

জাকারিয়া রফিক একজন গল্পকার। ছড়া কবিতাও লিখেন। ১৯৭৩ সালে পূর্বাভাস পত্রিকায় প্রথম লেখা ছাপা হয়। ১৯৮৫ সালে এক ব্যাগ গল্প নামে তার একটি গল্পের বই প্রকাশ পায়। বর্তমানে পোষাক শিল্প ব্যবসায় জড়িত। তিনি পালক শিশু সাহিত্য সংসদের কার্যকরী পরিষদের সদস্য। তার জন্ম ১৯৬০ সালের ১৩ মার্চ বিক্রমপুরের সিরাজদিখানের রাজানগর গ্রামে। পিতার নাম লাল মিয়া বেপারী।

ফাহিম ফিরোজ

কবি ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬৪সনে লৌহজং থানাধীন বড় নওপাড়া গ্রামে। বর্তমানে দৈনিক ইনকিলাবের সহ সম্পাদক। কাব্য গ্রন্থ দা কাহিনী প্রকাশের অপেক্ষায়। উল্লেখ্য তিনি উত্তর আমেরিকার শিল্প সাহিত্য বিষয়ক কাগজ 'শিকড়' এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি।

এছাড়া তিনি অনিয়মিত সাহিত্য কাগজ 'মতিঝিল' এর সম্পাদক। এটিভির বিজয়ের পঙ্কতিমালা অনুষ্ঠানের গ্রন্থনাকারী, বাংলাদেশ লেখক সম্মানী সংগ্রাম কমিটির সভাপতি, প্রাচীন ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠানে প্রায়ই মফস্বল ঘুরে বেড়ান।

www.pathagar.com

শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনে বিক্রমপুরের অবদান

দেশের শিক্ষা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিতে বিক্রমপুরের অবদান অসামান্য। প্রায় ৫ হাজার বছর বয়সী এ ভূখন্ডের অতীত ও বর্তমানের অনেক কৃতি সন্তান তাদের মেধা ও প্রতিভা দিয়ে যুগে যুগে এ দেশের শিল্প সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি করে আসছে।

অতুল প্রসাদ সেন

প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার অতুল প্রসাদ সেন ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর দক্ষিণ বিক্রমপুরের 'মগর' পৈত্রিক নিবাসে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে যা ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ। ছোট বেলায় পিতার মৃত্যু হলে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের নিকট প্রতিপালিত হন। ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতা ও রংপুরে কিছুকাল আইন ব্যবসা করে লক্ষ্মৌ শহরে যান। সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আউধ বার এসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলের সভাপতি হন। লক্ষ্মৌ নগরীর সংস্কৃতি ও জীবন ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি যেখানে বাস করতেন জীবিতকালেই সেখানকার রাস্তার নামকরণ তার নামে করা হয়েছিল। অতুল প্রসাদের মৃত্যুর পর লক্ষ্মৌ শহরে শহরবাসীরা তার একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে একটি হলের নামকরণ করা হয়। তার উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ স্থানীয় জনসাধারণের সেবায় তিনি ব্যয় করেন। তার বাসভূমি ও গ্রন্থস্বত্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করে গেছেন। বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট অতুল প্রসাদের পরিচয় শুধু গীতিকার ও সুরকার হিসেবেই। তিনি অল্প বয়সেই সঙ্গীত রচনায় পান্ডিত্য দেখান। তার গানগুলোকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। (১) স্বদেশী সঙ্গীত, (২) ভক্তি গীতি, (৩) প্রেমগান। লোকসঙ্গীত ইত্যাদি অবলম্বন করে সুর রচনা। ভৈরবী, খাম্যাজ, পিলু, বেহাগ, কাফী ইত্যাদি কতগুলো বাঁধাধরা প্রচলিত রাগের ওপর ভিত্তি করে সুর রচনাই তার বৈশিষ্ট্য। তার রচিত বাণী ও সুরের বৈচিত্র বাংলা সঙ্গীত ধারায় দীর্ঘকাল আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর থাকবে।

'বল বল বল সবে শত বীণাবেণু রবে, হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে ধীর', 'তোমারি যতনে তোমারি উদ্যানে', আমার হাত ধরে তুমি', কে আবার বাজায় বাঁশি', বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা'

গানগুলো অতুল প্রসাদকে অমর করে রেখেছে। তার গানের সংখ্যা প্রায় ২০০। কয়েকটি গান ও 'গীতিগুঞ্জ' গ্রন্থে তার গানগুলো সংকলিত। 'কাকলি' গ্রন্থমালার পাঁচখন্ডে গানগুলোর স্বরলিপি প্রকাশিত। নিবেদিত প্রাণ এই শিল্পী ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন।

www.pathagar.com

ফনীন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী

ফনীন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী ২রা মার্চ ১৮৮৮ সালে বহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই শিল্পী চৌদ্দ বছর বয়সে কলকাতায় আর্ট কলেজে ভর্তি হন ও ই,বি, হ্যাভেলের নিকট ভারতীয় চিত্রকলার পাঠ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং এডিন ববার রয়্যাল ইনষ্টিটিউটে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিল্প শিক্ষা করেন। ১৯০৯ সালে এডিনবরার আর্ট কলেজে পার্সিপোর্টসমাউথ এ, আর, এস-এর অধীনে ৩ বছর ভাস্কর্য বিদ্যা শেখেন। ১৯১১ সালে তিনি ঐ বিষয়ে ডিপ্লোমা ও ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। সেখানকার শিক্ষা শেষে তিনি বিভিন্ন দেশের শিল্প ও ভাস্কর্য বিদ্যার বৈশিষ্ট্য পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ফ্রান্স ও ইতালী ঘুরে বেড়ান।

প্যারি শহরে বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর র‍্যোদাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার নিকট থেকে শিল্প বিষয়ে নানা রকমের নির্দেশ ও পরামর্শ লাভ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি স্কটল্যান্ডে গিয়ে স্টুডিও স্থাপন করেন। ঐ বছরই বৃটেনের রয়্যাল একাডেমীর প্রদর্শনীতে তার 'ব্যথিত বালক' উচ্চ প্রশংসিত হয়। মহারাজার অনুরোধে তিনি বরোদার রাজপ্রাসাদের জন্য কিছু ধাতু নির্মিত মূর্তির কাজ করতে বরোদায় আসেন। নানা অসুবিধার জন্য সে কাজ পূর্ণ না হলেও তিনি বেশ কিছুদিন বরোদায় থেকে নানা রকমের এবং বিশিষ্ট ধরনের মানুষের আকার আকৃতির অনুশীলন করেন এবং স্কেচ, মডেল ইত্যাদি তৈরী করে নিয়ে এডিনবরায় তার নিজস্ব স্টুডিওতে ফিরে যান। পঞ্চলৌহ ও মর্মর প্রস্তরে তিনি যে সব মূর্তির রূপদান করেছেন তাদের দেহভঙ্গী ও আকার আকৃতিতে তিনি অন্তর সত্তা বা আত্মার প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন। তার নির্মিত 'বালক ও কাঁকড়া' 'শিকারী' 'সাপুড়ে' 'সাধু' 'দিনের শেষে' প্রভৃতি ভাস্কর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কটল্যান্ডের পার্থ শহরের গির্জায়, স্যার উইলিয়াম গেকন জন, জি ওয়াশিংটন ব্রাউন প্রভৃতির ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং ভারতে লক্ষীবিলাস প্যালেসে ও আর্ট গ্যালারীতে তাঁর সৃষ্ট শিল্প রক্ষিত আছে। ১লা আগস্ট ১৯২৬ সালে স্কটল্যান্ডের পিব্‌লস্ শহরে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।

মুকুল দে

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতানুসারে, বাংলার যে পাঁচ জন মহান অংকনশিল্পীর দ্বারা কলকাতার অংকন শিল্পের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় তারা হলেন-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত হালদার, নন্দলাল বোষ এবং মুকুল দে।

এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুকুল দে ১৮৯৫ সালের ২৩ জুলাই, শ্রীনগর থানাধীন শ্রীধরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে আসেন এবং তিনি হন শান্তিনিকেতনের প্রথম প্রজন্মের অন্যতম শিক্ষার্থী।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ঠাকুর পরিবারের সদস্য এবং অংকন শিল্পের দুই দিকপাল গগনেন্দ্র ঠাকুর ও অবনিন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও অসামান্য অবদান ছিল মুকুলদের অংকন শিক্ষায়।

মুকুলদে রবীন্দ্রনাথের সাথে ১৯১৬ সনে জাপান যান এবং জাপানি চিত্র কর্মের সাথে অন্তরঙ্গ পরিচিতি লাভ করেন। ঐ বছরেই আমিরিকায় পাড়ি জমান। অকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়ায় শিকাগোয় বিখ্যাত অংকন শিল্পী খোদাইকর জেমস্ ব্লান্ডিং স্লোয়ান এর সাথে পরিচিত হন এবং এখানেই তিনি প্রথম খোদাইকর এবং গ্রাফিক আর্টিষ্ট হিসাবে স্লোয়ানের কাছে কাজ শুরু করেন।

১৯১৭ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর মনের বিষাদ গ্রস্থ অবস্থায় তিনি অজন্তা গুহায় এবং সোয়ানিয়ের বাঘ গুহায় চলে যান এবং সেখানে প্রায় দু'বছর অবস্থান করেন। উভয় স্থানেই তিনি গুহার দেয়াল চিত্র সমূহ নকল করতে শুরু করেন এবং এ বিষয়ে ১৯২৫ সালে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

বালক বয়সেই মুকুল দে শান্তিনিকেতনের অংকন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তার চিত্র কর্মের প্রদর্শনী হয় ১৯১১ সালে কলকাতায়, ১৯১৩সালে প্যারিস ও হল্যান্ডে, ১৯১৪ সালে লন্ডনে, ১৯১৬ সালে টোকিওর সান ফ্রান্সিসে ও আর্ট ইসষ্টিটিউট অব শিকাগোতে ১৯১৬ সালে। এর পর ১৯১৭ সালে তিনি শিকাগোর খোদাই শিল্পী সমাজের আজীবন সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম বাঙ্গালী যিনি এ সম্মানে ভুষিত হন।

১৯১৮ সালে নাগপুরে একক প্রদর্শনীর পর তিনি বিদেশে যান। ১৯২০ সালে লন্ডনে Slode School of Art নামক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরের বছর লন্ডনে রয়েল কলেজ অব আর্টের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি স্কলারশীপ অর্জন করেন, বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় প্রথম হন, ম্যুরাল অংকনে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এবং এভাবে রয়েল কলেজ অব আর্ট, লন্ডনের তিনি একজন এসোসিয়েট হন।

পরবর্তী পাঁচ বছরে মুকুল দে লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল, আর্ট ওয়ার্কারস গিল্ড, বিডেইলস স্কুল এবং লন্ডনের বিভিন্ন সমাবেশ এবং লন্ডনের ওয়েম্বলি এক্সিবিশনে ভারতীয় ম্যুরালকে তুলে ধরেন।

পাশাপাশি তার চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম এবং ওয়াকার আর্ট গ্যালরীতে। লন্ডনে তার একক চিত্র প্রদর্শিত হয় ১৯২৭ সালে। ঐ সময় তার চিত্রকর্ম এবং খোদাই শিল্প সমূহ বার্মিং হাম প্রাসাদে পাঠানো হয় এবং সেখানে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এরপর মুকুল দে ভারতে ফিরে আসেন এবং ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্ট, কলকাতায় একক চিত্র প্রদশনীর আয়োজন

www.pathagar.com

করে। শিল্পে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ নয়াদিল্লী. ইন্ডিয়া হাউজ এবং লন্ডনে ১৯২৮-২৯ সালের জন্য উপদেষ্টা কমিটি ফর ম্যুরালস'র সদস্য নির্বাচিত হন। তাকে গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ পদে সম্মানিত করা হয়। এবং তিনি কলকাতা মিউজিয়ামের একজন ট্রাষ্টি মনোনিত হন। গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে অধ্যক্ষ থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার দাপ্তরিক বাসভবনের অতিথি হন এবং স্কুল অব আর্টে তার ছবি প্রদর্শিত হয়। তিনি টানা পনের বছর এ লোভনীয় পদে আসীন ছিলেন। এ সময়ে তিনি রাজা জর্জ এবং রানী ম্যারীর জুবিলী মেডেল পান ১৯৩৬ সালে এবং পরবর্তী বছর রাজ্যাভিষেক মেডেল। মুকুল দে কলকাতার স্কুল অব আর্টে মেয়েদের বিভাগ চালু করেন। এবং ১৯৪৫ সালে তার চিত্র প্রদর্শনী করেন বীরভুমে এর পূর্ববর্তী বছরে তিনি কালিকা আর্ট গ্যালারী স্থাপন করেন যেখানে মহাত্বাগান্ধীও তার পার্টি দেখতে আসেন ১৯৪৫ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর। ১১ই আগস্ট ১৯৪৬ সালে শ্রী মহাত্বাগান্ধী তাকে শুভেচ্ছা বাণী পাঠান।

১৯৪৬ সালে শিলং ভ্রমনের সময় মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের ছবি নকল করেন এবং পরে ১৯৪৬, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে যথাক্রমে শিলং, বেনারস এবং বিশ্বভারতিতে তার একক চিত্র প্রদর্শিত হয়।

তার উল্লেখযোগ্য প্রকশনার মধ্যে 'বারোটি প্রতিকৃতি' অজন্তা থেকে বাঘে আমার তীর্থযাত্রা, 'আমার স্মৃতি কথা', 'পনেরটি সূঁচ', 'বিশটি প্রতিকৃতি', 'মহাত্বাগান্ধীর জীবন থেকে প্রতিকৃতি', 'বীরভোমের মন্দিরের টেরাকোটর্স' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯২৬ সালে মুকুল দে বার্নিলে আলবার্ট আইনষ্টাইনের সাথে চারদিন কাটান। বিজ্ঞানী প্রতিদিন সকালে প্রতিকৃতি আঁকার জন্য মুকুল দের সামনে বসতেন। মুকুল দে বার্নিলে জীবন থেকে এ প্রতিকৃতি আঁকার সুযোগ পেলেন এবং আইনস্টাইন এ কাজের জন্য জার্মানে লিখিত অভিমত দেন।

বিভিন্ন সময়ে মুকুল দে অতিথি প্রভাষক হিসেবে যুক্ত হন কলেজ অব ইউবো হলিফস্ কলেজ আলবাসা কলে। ভার্জিনিয়া , বামিংহাম ফ্লোরেন্স , আলবাসা , ড্রাগন ডেট্রয়ট , জাপান লন্ডন মস্কো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

তিনি ১৯৮৪ সালে পশ্চিম বাংলা সরকারের নিকট হতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গগন অগনী পুরুস্কার লাভ করেন এর তিন বছর পর ললিত কলা একাডেমীর সদস্য হওয়ার সম্মান লাভ করেন । একই বছর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাকে হনি ডিলিট ডিগ্রি দেয়া হয়। ১৯৮৯ সালে এ মহান শিল্পী ইহলোক ত্যাগ করেন ।

www.pathagar.com

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। শিশুকুমারের সীতা নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ৫০টিরও অধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। চক্রব্যুহ, বন্দনার বিয়ে, দেশবন্ধু, হোমিওপ্যাথি তার বিখ্যাত নাটক ১৮৮৯ সালে কামারপাড়া গ্রামে তার জন্ম ও ১৯৫৪ সালে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।

মনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

১৮৯৮ সালে আউটশাহী গ্রামে মনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজেন্দ্র ভূষণ। চিত্রকলা বিদ্যায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মালবিকা, দেব যানী, বিজয় সিংহের সিংহল যাত্রা তার বিখ্যাত ছবিগুলোর অন্যতম। শিল্প তত্ত্বের ওপর তার রচনাগুলোর মধ্যে সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা, ইম্প্রেশন অব এ পিলিগ্রিমেজ টু কেদার নাথ এন্ড বাদ্রিনাথ ইন টুয়েলভ লিনোকাটস্ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অতুল বসু

অতুল বসুর পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের বসুনিয়া। তার জন্ম ১৮৯৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বাবার কর্মস্থল ময়মনসিংহে। ভারতীয় শিল্প জগতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি শিল্পী মাত্র ১২ বছর বয়সে কলকাতার টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। এ সময়ে বিপ্লবী দলের সাথে কিছু দিন যোগাযোগ রেখেছিলেন। পরে এসব ছেড়ে রনদা গুপ্তের আর্ট একাডেমীতে ভর্তি হন। তিন বছর বাদে গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টসের ছাত্র হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পার্সি ব্রাউনের সান্নিধ্যে আসেন। ২০ বছর বয়সে স্নাতক প্রাপ্ত হন। ১৯২১ সালে সোসাইটি অব ফাইন আর্টস সংগঠিত করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি' পেয়ে লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমীর ছাত্র হন। সেখানে তিনি বিখ্যাত 'আইভরি' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত তিনি গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টসের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। তার অঙ্কন ছিল পাশ্চাত্য রীতির। এই শিল্পীর অসংখ্য শিল্পকীর্তির মধ্যে স্কেচ-এ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ প্রতিমূর্তি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি অভিযানের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তামগ্ন মুর্তিটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৭ সালের ১০ই জুলাই এই মহান শিল্পী পরলোকগমণ করেন।

আবদুল জব্বার খান

বাংলা চলচিত্রের পথিকৃত আবদুল জব্বার খান ১৯১৭ সালে বিক্রমপুরের উত্তর মসদ গাঁও এ জন্মগ্রহন করেন। বাবার নাম হাজী মোহাম্মদ জমশের খান। চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

www.pathagar.com

আসামের ধুবড়ী এলাকায় তাঁর বাবা পাটের ব্যবসা করতেন। শৈশবে তিনি সেখানকার স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় জড়িয়ে পড়েন নাটকের সঙ্গে। অভিনয় করেন 'বেহুলা', 'বিল্বমঙ্গল,' 'সোহরাব রোস্তম' নাটকে। তিনি অভিনয় করেন প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'সিন্ধু বিজয়' নাটকেও। নবম-দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি কলকাতায় গিয়ে তাঁর বাসায় থেকে নাটক দেখতেন। এর পর বড়ুয়া পরিচালিত 'মুক্তি' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শূট্যিং পিছিয়ে যায়। পরে জব্বার খান আর সে ছবিতে অভিনয় করতে পারেননি। এর পর প্রমথেশ বড়ুয়ার 'শাপমুক্তি' ছবিতে নায়ক নির্বাচিত হন। কিন্তু এবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর বাবা। তিনি ছেলেকে ছবিতে অভিনয়ের অনুমতি দিলেন না। ছবিতে অভিনয় না করলেও অভিনেতা আবদুল জব্বার মঞ্চ ছাড়লেন না। তিনি 'সমাজপতি' ও 'মাটির ঘর' নাটকে অভিনয় করে স্বর্ণপদক পান। পরে তিনি আসামী ভাষায় নাটক করেন। মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর দারুণ নেশা থাকলেও লেখাপড়া বাদ দেননি। বরাবরই তিনি ছিলেন একজন ভাল ছাত্র ও খেলোয়াড়। তিনি আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯৪১ সালে চাকরিতে যোগ দেন।

১৯৪৯ সালে ঢাকায় চলে আসেন স্থায়ীভাবে। ঢাকায় এসে সংগঠিত করেন 'কমলাপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন।' এই ক্লাবের উদ্যোগে প্রথম নাটক মঞ্চায়ন করেন 'টিপু সুলতান'। দ্বিতীয় নাটক 'আলীবর্দী খাঁ'। পরে তিনি লেখেন কয়েকটি নাটকঃ 'ঈসা খাঁ' (১৯৫০), 'জাগোদেশ' (১৯৫৯), 'প্রতিজ্ঞা' (১৯৫১) 'ডাকাত' (১৯৫৩)। তাঁর 'ডাকাত' চিত্রায়িত হয়ে মুক্তি পাওয়ার আগেই উপন্যাস আকারেও বের হয়।

ছবি পরিচালনা ছাড়াও 'মুখ ও মুখোশ'-এ (১৯৫৬) তিনি নায়ক হিসাবেও অভিনয় করেন। এই ছবিতে তাঁর ছেলেবেলার চরিত্রে অভিনয় করেন তাঁরই ছেলে মাষ্টার জুলু। এ ছবির পর তিনি পরিচালনা করেন 'জোয়ার এলো' (১৯৬২), 'নাচ-ঘর'(উর্দু)(১৯৬৩), 'বাশরী' (১৯৬৮), 'কাঁচ কাটা হীরে' (১৯৭০), ও 'খেলা ঘর' (১৯৭৩)। এছাড়া তিনি প্রযোজনা করেন বেশ কয়েকটি ছবিও। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আবদুল জব্বার খান মুজিব নগর সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। তিনি 'পপুলার স্টুডিও'র অন্যতম অংশিদারও ছিলেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও পরিবেশনার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন বহুদিন। আবদুল জব্বার খান পরে সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জুরি বোর্ডে, অনুদান কমিটিতে, সেন্সর বোর্ডে, ফিল্ম ইষ্টিটিউট ও আর্কাইভে। ষাট দশকের প্রথম ভাগে গঠিত পাকিস্তান প্রযোজক সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক ও নেতা।

www.pathagar.com

তাঁর পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে। বড় ছেলে ইসমত হায়াত খান হলিউড থেকে ফিল্ম টেকনোলজিতে এম এস করেছেন। তিনি অভিনয় করেছেন বিভিন্ন ছবিতে। দ্বিতীয় ছেলে মোজাফফর হায়াত খান জুলুও একজন অভিনেতা। চতুর্থ ছেলে জাহাঙ্গীর হায়াত খান একজন যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী তাঁর মেয়ের মধ্যে দুই মেয়ে জোহরা জাবীন (রূপা খান) ও লালারুখ খুররম (মালা খান) সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত। জনাব জব্বার খান ১৯৯৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর বুধবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

নারায়ণ চক্রবর্তী

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী নারায়ণ চক্রবর্তী ১৯১৮ সালে বিক্রমপুরের সিরাজদিখান থানার কোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ঈশ্বর যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও মা মায়াদেবী চক্রবর্তী।

নারায়ণ চক্রবর্তী এটি মিত্র হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর কোলকাতা প্রথম বিভাগ ফুটবল দল ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাবে খেলোয়ার হিসেবে যোগ দেন এবং খেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। দেশ বিভাগের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন জেলায় খেলোয়ার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং এরপর তৎকালীন পাকিস্তান টিএণ্ডটিতে সহকারী প্রকৌশলী পদে চাকুরীতে যোগ দেন। চাকুরী সূত্রে দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ছিলেন এবং অবসর সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। নাটক এবং পালা যাত্রায় অভিনয় করতেন। টিএণ্ডটি কর্মচারী সংসদ আয়োজিত নাট্যোৎসবে নাটক পরিচালনা করেছেন। বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী অবলেন্দু বিশ্বাস, আর হোসেন, আহমদ হামিদ, পুর্ণিমা সেন গুপ্ত, পটুয়া ছাড়া আরো অনেক নামী দামী শিল্পী তাঁর নির্দেশিত পালা যাত্রায় অভিনয় করেছেন। নিজের হাতে গড়া রূপায়ন থিয়েটার ক্লাব বর্তমানে বাবুল অপেরা পার্টি নামে পরিচিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা পালা করে যাচ্ছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র বিক্রমপুরের আরেক কৃতী সন্তান আব্দুল জব্বার খান পরিচালিত 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রে জমিদার চরিত্রে অভিনয় করেন। চান্দা, তালাশ, সুয়ে নদীয়া জাগো পানি, এদেশ তোমার আমার, পদ্মা নদীর মাঝি, হারানো দিন, কখনও আসেনি, নীল আকাশের নীচে ও অবুঝ মন সহ প্রায় তিন শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন এই গুণী শিল্পী। মানুষের মন জয় করতেও সক্ষম হয়েছেন তিনি। অভিনেতা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৯৮ সালে এ মহান শিল্পী পরলোক গমন করেন।

www.pathagar.com

গওহর জামিল

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গওহর জামিল ১৯২৭ সালে সিরাজদিখান গ্রামের নাগ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সেই তার ভেতর শিল্পবোধ জেগে উঠে। এরপর থেকে নিজস্ব প্রতিভা দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বিকশিত হন।

তিনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ভাস্কর দেব, রবি শঙ্কর, উদয় শঙ্কর ও বুলবুল চৌধুরীর নিকট নৃত্য শেখেন। ১৯৬২ সালে ভারতের সাগরথাপায়া পিনাই ও রাম নারায়ণ মিত্রের নিকট ভারত নাট্যম ও কথক নৃত্যে পাঠ নেন। ১৯৫০ সালে তিনি সাংস্কৃতিক সংস্থা কলাভবন ও ১৯৫৯ সালে জাগো আর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫২ সালে তিনি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী রওশন জামিলের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গওহর জামিল নামে পরিচিত হন।

গওহর জামিল বহুদেশে তার নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন। এর মধ্যে চিন, ইংল্যান্ড, ইরান, রাশিয়া, নেপালসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তোলেন।

১৯৮০ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় ৫২ বছর বয়সে এই শিল্পী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ধীর আলী মিয়া

ধীর আলী মিয়া একজন সার্থক বংশী বাদক, সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার ও অর্কেস্টা পরিচালক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পিতৃব্য সাদেক আলীর কাছে শৈশবকাল থেকে বংশীবাদনে তালিম গ্রহণ করেন। সে সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট, গীটার ও বেহালা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রে অনিয়মিত বংশীবাদক হিসেবে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮ এর ১লা এপ্রিল তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা অর্কেস্টা নামে অর্কেস্টাদলের সংগঠক। তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত 'অল পাকিস্তান রেডিও মিউজিক কনফারেন্স ও ভারতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন -এ অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে ভারত, রাশিয়া ও আফগানিস্তান সফর করেন। বুলবুল ললিত কলা কেন্দ্র (বার্মা) ও আর্ট কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ কোর্সের শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনও করেন। দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি 'মুখ ও মুখোশ এর সহকারী সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। হিজ মাষ্টার ভয়েস এবং ঢাকা গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক তার সুরারোপিত ও সঙ্গীত পরিচালিত কয়েকটি গানের ডিস্ক বের হয়েছে। নাচঘর, উজালা,

www.pathagar.com

জোয়ার এলো, কাঞ্চন মালা, আবার বনবাসে রূপবান, দস্যুরানী, কাজলরেখা প্রভৃতি ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালক তিনি। সঙ্গীত ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাকে ১৯৬৫ তে 'তমঘারে ইমতিয়াজ' খেতাব দান করেন। ১৯৮৩-র ৩১ ডিসেম্বর রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রের উপ প্রধান সঙ্গীত প্রযোজক হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই বরেন্য শিল্পী ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী বিক্রমপুরের টঙ্গীবাড়ী থানার বাঁশবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ -র ১৪ই ডিসেম্বর মৃত্যু বরণ করেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ছবির প্রথম সারির নায়িকা, অনন্য সাধারণ অভিনয় গুণে চলচ্চিত্র ও মঞ্চ উভয় মাধ্যমে যিনি সর্বজন প্রিয় শিল্পী তিনি হচ্ছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তার বাড়ি বিক্রমপুরের কনকসার গ্রামে। দেশ বিভাগের পর কলকাতা চলে যান। সে থেকেই কলকাতায় শতাধিক ছবি ও নাটকে অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। তার বিখ্যাত ছবিগুরোর মধ্যে পাশের বাড়ি, শুভদা, উপহার, অঙ্কুশ, একতারা, প্রতিনিধি, মরুতীর্থ হিংলাজ, নিশি পদ্ম, ধন্যি মেয়ে, রাতভোর, নবজন্ম, ময়লা কাগজ,প্রতিশোধ, ফুলসজ্জা। নাটকের মধ্যে নতুন ইহুদী, কিনু গোয়ালার গলি, আদর্শ হিন্দু হোটেল, পরস্ত্রী, মল্লিকা, ফটিক, অমর, কাঁচের পুতুল। অভিনয়ের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার ও সংবর্ধনা পেয়েছেন।

কাজী আবদুল বাসেত

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কাজী আব্দুল বাসেত ১৯৩৫ সালের ৪ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৫৬ সালে বর্তমানে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ফাইন আর্টস-এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬৩-৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগোর স্কুল অব দি আর্ট ইনস্টিটিউটে ফুল ব্রাইট ফেলো হিসেবে সমকালীন চিত্রকলার উপর উচ্চতর গবেষণা শেষ করেন। তিনি যেসব প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিখিল পাকিস্তান চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা, ১৯৫৪; পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পীদের চারুকলা প্রদর্শনী, বাগদাদ, ইরাক, ১৯৫৬; এশীয় নবীন শিল্পীদের প্রদর্শনী, টোকিও, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, ওহিও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৮; রোম, ১৯৬০; সিয়েটোভুক্ত দেশসমূহের শিল্পীদের প্রদর্শনী, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ১৯৬২; চিকাগোর শিল্পীদের চারুকলা প্রদর্শনী, চিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৬৩; পাকিস্তানের সমকালীন চিত্রকলা সোসাইটি আয়োজিত দু'টি যৌথ চিত্রকলা প্রদর্শনী, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৯৬৪; জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা; ষোলজন শিল্পীর প্রদর্শনী ঢাকা; পূর্ব পাকিস্তানের বিমূর্ত চারুকলা প্রদর্শনী ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পীদের চারুকলা প্রদর্শনী রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান, ১৯৬৫; তৃতীয় দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী তেহরান,

www.pathagar.com

ইরান, ১৯৬৬; লায়ন্স ক্লাব আয়োজিত প্রদর্শনী, ঢাকা; আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনী, এক্সপো '৬৮, টোকিও, জাপান ১৯৬৮; "নবান্ন" শীর্ষক চারুকলা প্রদর্শনী ঢাকা; "কাল বৈশাখী" শীর্ষক চারুকলা প্রদর্শনী, ১৯৭০; স্কেচ গ্রুপ প্রদর্শনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭১; বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা প্রদর্শনী কলকাতা, বোম্বে এবং দিল্লী, ভারত, ১৯৭৩; বাংলাদেশ চারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা বাংলাদেশ, ১৯৭৪, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৫; জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৬; ছাপচিত্র চারুকলা প্রদর্শনী, ১৯৮০; দ্বিতীয় ভ্রাম্যমাণ চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ, ১৯৮১; জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা বাংলাদেশ; ভারতের ত্রিবার্ষিক আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনী, দিল্লী, ভারত, ১৯৮২ প্রভৃতি।

তিনি নিখিল পাকিস্তান চারুকলা প্রদর্শনীতে সর্বোচ্চ পুরস্কার, ১৯৫৪, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, করাচী, পাকিস্তান-এ দ্বিতীয় জাতীয় পুরস্কার-১৯৫৭, রেলওয়ে সময়সূচী প্রচ্ছদ অলংকরণ পুরস্কার, ঢাকা, ১৯৬৩, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার, ঢাকা এবং ১৯৮২ অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক '৮৭ পান।

সিয়েটো এর সদর দপ্তর ব্যাংকক; বঙ্গভবন, ঢাকা, বাংলাদেশ; ঢাকা যাদুঘর, ঢাকা বাংলাদেশ; আর্ট কাউন্সিল, করাচী, পাকিস্তান; সমকালীন চিত্রকলা সোসাইটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান; বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্মান পান। বাংলাদেশ চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ড্রইং এবং পেইন্টিং বিভাগের প্রধান থাকাকালেই বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব পান।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই বাংলার জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা ভানুর আদি নিবাস বিক্রমপুরে। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুলে এবং ঢাকার পগোজ উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। উপমহাদেশ বিভাগের আগে, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র জগতে অভিনয় শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ছিলো তাঁর পরিচিতি পত্র। আজীবন চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও কৌতুক নক্সায় 'ঢাকাই বুলি' ব্যবহার করেছেন এবং 'ঢাকাইয়া ভানু' বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকায় এসেছিলেন। সে সময় তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, 'ঢাকাইয়া বুলি দিয়া আমি পপুলারিটি পাইছি, ঢাকাইয়া বুলি বেইচ্যা আমি ভাত কাপড় যোগাইতেছি। এর জন্য আমি গর্ব করি, অহংকার করি'।

কমেডি অভিনয় ক্ষেত্রে উপমহাদেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন উঁচুদরের শিল্পী। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। এর

www.pathagar.com

মধ্যে 'ভানু পেলো লটারী' পাশের বাড়ি, বরযাত্রী, বসু পরিবার, চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে, ওরা থাকে ওধারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি মঞ্চেও অভিনয় করে গেছেন। যাত্রায়ও অভিনয় করেছেন। আর অক্লান্তভাবে রচনা করেছেন ব্যঙ্গ কৌতুক যা শুধুমাত্র পশ্চিম বঙ্গেই নয়, বাংলাদেশেও সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

শফিউর রহমান (শফি বিক্রমপুরী)

শফিউর রহমান ওরফে শফি বিক্রমপুরী ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল শ্রীনগরের সেলামতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আরশেদ আলী। তিনি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক এবং পরিবেশক। তিনি শিল্পপতিও বটে। সাম্প্রতিক কালে রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছেন। তিনি জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দিয়েছেন। অবশ্য এর পূর্বে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিজ এলাকায় এম.পি. পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি ও বিক্রমপুর ফাউণ্ডেশনের সাথে জড়িত। এলাকার কল্যাণকর কাজে তার অগ্রণী ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

চাষী নজরুল ইসলাম

বিশিষ্ট চলচিত্রকার চাষী নজরুল ইসলাম ১৯৪১ এর ২৩ অক্টোবর শ্রীনগর থানার সমষপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার বাবার নাম মোকলেছ উদ্দিন আহমেদ মা শায়েস্তা খানম।

চাষী নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা উত্তর সময়ে প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবি ওরা ১১ জন নির্মান করে দেশবাসীকে চমকে দিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আরো অনেক ছবি নির্মাণ করেন। এর মধ্যে 'সংগ্রাম', সেলিনা হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে দেবদাস, চন্দ্রনাথ, সুভদা ও বঙ্কিম চন্দ্রের বিষবৃক্ষ অবলম্বনে বিরহ ব্যাথা, এম, মহিউদ্দিনের 'মরাগাঙ পোড়া ফসল' অবলম্বনে 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'ভালো মানুষ' ইত্যাদি ছবিগুলো তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ। শুভদা চলচিত্রের জন্য তিনি ১৯৯৬ সনে জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এ ছবির বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠ ছবি সহ মোট ১২ টি পুরস্কার লাভ করে যা বাংলাদেশ চলচিত্রের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। তার 'চন্দ্রনাথ' ছবিও বিভিন্ন শাখায় ছয়টি জাতীয় পুরস্কার পায়। পদ্মা মেঘনা যমুনা ছবিটি ১৯৯৫ সনে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এ ছবিও বিভিন্ন শাখায় আরো ৭টি পুরস্কার পায়। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন যেমন, জেসি বোস স্মৃতি সংসদ, জহির রায়হান চলচিত্র, শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদ, মানিক মিয়া স্মৃতি সংসদ, যুব মন্ত্রণালয় মনোনিত শ্রেষ্ঠ চলচিত্র ব্যক্তিত্ব, সিনে এওয়ার্ড শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার সহ

www.pathagar.com

আরো বহু সংগঠন থেকে তিনি পুরুস্কৃত হন। 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

জনাব চাষী নজরুল বাংলাদেশ চলচিত্র দলের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ফ্লিম ফেষ্টিভ্যালে অংশ গ্রহন করেন। এছাড়া তিনি চলচিত্র বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রনে জাপান, আমেরিকা , লন্ডন, ম্যানিলা, ব্যাংকক সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, নেপাল সহ বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন ।

চাষী নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র একজন সফল চলচিত্র নির্মাতাই নন,একজন সফল সংগঠক হিসেবেও তার অসামান্য অবদান রয়েছে। এযাবৎ তিনি তিনবার বাংলাদেশ চলচিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন । এছাড়া ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারী সহ ক্লাব অফিসিয়াল হিসাবে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। ডামফার সদস্য হিসেবে তিনি কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি।

জনাব চাষী নজরুল প্রায় পচিঁশটি ছবি নির্মাণ করেছেন। এর মধ্যে শেরেবাংলা, মাওলানা ভাসানী ও জিয়াউর রহমানের জীবন ভিত্তিক তিনটি প্রামাণ্য চিত্রও রয়েছে।

আব্দুর রহমান

আব্দুর রহমান একজন সফল বংশীবাদন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। শৈশবকালেই বংশীবাদন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ভারতে পাটনা ও দিল্লীর খ্যাতিমান ওস্তাদদের নিকট বংশীবাদন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তালিম নিয়ে আসাম রেডিওর নিজস্ব শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৬৪ সালে বংশীবাদক হিসেবে ঢাকা বেতারে যোগ দেন। এরপর থেকে পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সরকারী ও বেসরকারী ভাবে অনেক দেশ ভ্রমণ করে সুনাম কুড়িয়ে আনেন। বেতার ছাড়াও তিনি টিভি ও চলচ্চিত্রের সাথে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। এই গুণী শিল্পীর জন্ম বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে।

আলাউদ্দিন আহমেদ

সরদার আলাউদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯৪১ সালে বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার শ্রীধরপুর গ্রামে। শৈশব কাল থেকেই গানের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তিনি প্রখ্যাত দোতরা বাদক ও পল্লীসুরকার কানাই লাল শীলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রথম জনসমক্ষে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ পান। ১৯৬৪ সাল থেকে বেতারে নিয়মিত অংশ গ্রহণ শুরু করেন। ১৯৭০-এর হিজ মাষ্টার ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানীতে

www.pathagar.com

লোকগীতি রেকর্ড করেন। মধুমতি (পরে 'তীর ভাঙ্গা ঢেউ' নামে প্রদর্শিত) এবং দয়াল মুর্শিদ ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। "গণ সঙ্গীত" দলে যোগদান করে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত পরিবেশন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যার্থে বিভিন্ন স্থান সফর করে অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বোম্বের পলিডোর গ্রামোফোন কোম্পানীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে দু'টি কবি গান রেকর্ড করেন।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হিসাবে যোগদেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' ও 'সংগ্রাম' ছায়াছবিতে নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। সরদার আলাউদ্দিন আহমেদ ১লা নভেম্বর ১৯৭২ সালে ঢাকায় অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

আলমগীর কুমকুম

আলমগীর কুমকুম একজন চলচিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে সকলের কাছেই সুপরিচিত। তার প্রথম ছবির নাম 'পদ্মা নদীর মাঝি।' এছাড়া জীবনের ঝুকি নিয়ে নির্মিত জাতির জনকের জীবন ভিত্তিক 'কে বলে তুমি নেই' প্রামাণ্য চিত্রটিও একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক 'আমার জন্মভূমি' তার আরেকটি সফল নির্মাণ। এ ছবির মাধ্যাম তিনি বিক্রমপুরের বিভিন্ন অঞ্চলকে দেশবাসীর সামনে পরিচিত করে তোলেন। চিত্র জগতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে ১৯৯০ সালে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার এবং সাহাবউদ্দিন স্বর্ণ পদক বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনাব কুমকুম বাংলাদেশ চলচিত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং চার বছর এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার উপকমিটির অহবায়ক এবং ফ্লিম সেন্সর বোর্ডের সদস্য।

আলমগীর কুমকুম চলচিত্রের পাশাপাশি বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জরিত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক। এছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদের নির্বাহী সদস্য এবং বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতির জোটের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বুদ্ধিজীবিদের একত্রিত করার ব্যাপারে তিনি প্রংশসনীয় ভুমিকা পালন করেন।১৯৯৫ সালে তিনি রামপুরায় বঙ্গবন্ধু কমার্শিয়াল এন্ড টেকনিক্যাল নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে মস্কোতে আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসবে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৯৮ সনে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অনুষ্ঠিত দি ৮ নেসন সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্ত করার সময় সাংস্কৃতিক বিষয়ে তার দেয়া বক্তব্য শুনে তুরস্ক সরকার তাকে সার্টিফিকেট অব মেরিড দান করেন। সম্প্রতি চীনে সরকারি সফরকালে গ্রেট ওয়াল্ড পরিদর্শনে গিয়ে তার উচ্চতায় আরহন করলে তাকে একটি সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

চলচিত্র অঙ্গনের এই উজ্জল নক্ষত্র ১৯৪৩ সনের ২২ জানুয়ারী শ্রীনগর থানাধীণ সমসপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

নাজমা আনোয়ার

দীর্ঘদিন মনে রাখবার মতো প্রথিতযশা একটি নাম নাজমা আনোয়ার। দৃষ্টিনন্দন অভিনয় দক্ষতা দিয়ে ইতোমধ্যেই যিনি দর্শকদের মাঝে নিজেকে প্রিয় করে তুলেছেন। তিনি যখন যে চরিত্রটা করেন অভিনয় গুণে তখন তাকে ঐ মানুষটিই মনে হয়।

টঙ্গীবাড়ী থানার কাজী বাড়ির মেয়ে নাজমা আনোয়ার। বাবা কাজী আমির হোসেন ছিলেন মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের প্রফেসর। চাচা কাজী শাহ্জাহান হাফিজ ছিলেন একজন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। বড় বোন আজমেরী জামানও একজন সুঅভিনেত্রী।

আবদুস সামাদ টেলি

বাংলা চলচ্চিত্রের সুপরিচিত কৌতুক অভিনেতা টেলি সামাদ। পুরো নাম আবদুস সামাদ। মুন্সিগঞ্জ থানার নয়াগাঁও গ্রামে তার জন্ম। অভিনয়ের পাশাপাশি তার সুললিত কণ্ঠের গানও শ্রোতাদের মোহিত করেছে। এযাবত তিনি অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং অভিনয় গুনে দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। অভিনয়ে তার একটি নিজস্ব ঠং ইতোমধ্যেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

লায়লা হাসান

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী লায়লা হাসানের জন্ম টঙ্গীবাড়ী থানার ব্যাসনল গ্রামে। পিতা এম আউয়াল। স্বামী সৈয়দ হাসান ইমামও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি কামরুননেসা গার্লস হাই স্কুল হতে এস,এস,সি ও ইডেন হতে এইচ, এস, সি, পাশ করেন। ১৯৭১ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পাশ করেন। ১৯৬২ সালে বাফা হতে পাশ করেন। বৈতালীক শিল্পী গোষ্ঠীর সভানেত্রী। নিয়মিত ভাবে নৃত্য মঞ্চায়ন করেন। টিভি'র বাচ্চাদের প্রশিক্ষক। '৭১ সালে শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতীও সফর করেন। শিল্পী নৃত্যের প্রতিনিধি হয়ে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এর মধ্যে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, হংকং, কোরিয়া উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলা বেতার নাটক, আবৃত্তিতে নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। ৭০-৭১ এ রোকেয়া হলে সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৮ হতে রেডিওর সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

বর্তমানে টেলিভিশনে নৃত্য পরিচালিকা হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন। স্বামী হাসান ইমামের অনুপ্রেরণায় টিভি নাটকেও সমান দক্ষতা প্রদর্শন করছেন।

ফেরদৌস ওয়াহিদ

ফেরদৌস ওয়াহিদ শ্রীনগর থানার দক্ষিণ পাইকশা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌঃ মোহাম্মদ ওয়াহেদ। ফেরদৌস ওয়াহিদ বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী। রেডিও ও টিভির নিয়মিত শিল্পী। তিনি বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি তার সুললিত কণ্ঠ ও গায়কী ঠং দিয়ে ইতোমধ্যেই সঙ্গীত জগতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তার কণ্ঠে গাওয়া 'এমন একটা মা দেনা' এক সময় মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো।

রেশমা (আজমেরী জামান)

বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রী রেশমা টঙ্গীবাড়ী থানার ধামারণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন পাকিস্তানে অবস্থান করার পর দেশে ফিরে আসেন। মাঝে মধ্যে টেলিভিশনে নাটক করেন কবিতা লেখেন এবং সমাজ সেবামূলক কাজে বর্তমানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি খুব স্বল্পসংখ্যক নাটকে অভিনয় করলেও তার অভিনয় গুনে তা মানুষের হৃদয়ে দাগ কাটার মত।

সারা আরা মাহ্মুদ

সারা আরা মাহ্মুদ একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, তিনি শহিদ বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট সুরকার আলতাফ মাহমুদের সহধর্মিনী। বর্তমানে তিনি শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগে কর্মরত আছেন। তার পৈত্রিক নিবাস শ্রীনগর থানার সমষপুর গ্রামে।

এবিএম মনজুর কাদের (বাবুল আখতার)

রেডিও বাংলাদেশ এবং টেলিভিশনের বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক বাবুল আখতারের জন্ম ১৯৫০ সালে মুন্সিগঞ্জে।

তিনি ১৯৬৫ সালে মুন্সীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি, হরগঙ্গা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সংবাদ পাঠ করতেন তিনি। জাপানে ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন কিছুদিন। বর্তমানে বিটিভি ও রেডিও'র সংবাদ পাঠে নিয়োজিত আছেন।

www.pathagar.com

শহীদুল হক খান

শহীদুল হক খান লৌহজং থানার কান্দিপাড়া গ্রামের এক সভ্রান্ত পরিবারে ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যকুল হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার পর ঢাকার ওয়েষ্ট এণ্ড হাই স্কুলে চলে আসেন। তারপর থেকে ঢাকায়ই আছেন। স্কুল ম্যাগাজিনে লিখতে লিখতেই সাহিত্যে হাতে খড়ি। তারপর চিত্র সাংবাদিক হিসেবে বেশ কতগুলো সিনে মাসিক সম্পাদনা করেছেন। কিছুদিন 'চরমপত্র' নামের একটি সাপ্তাহিকও সম্পাদনা করেছেন। তার লেখা বেশ কিছু ছোট গল্প ও উপন্যাস বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে রেডিও টেলিভিশনে প্রচুর নাটক লিখেছেন- যার অনেকগুলোই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ১৯৭৩ সাল থেকে চিত্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাথে সাথে চিত্র সমালোচক হিসেবেও বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। 'ছুটির ফাঁদে' নামে তার একটি ছবি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি ছবি 'কলমি লতা' মুক্তি পেয়েছে। এ ছবিতে তিনি এদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সামগ্রিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি নাট্য সভার সভাপতি। টেলিভিশনের উপহার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় উপস্থাপক।

মোতাহার হোসেন

মোতাহার হোসেনের জন্ম মুন্সীগঞ্জের মালপাড়া গ্রামে। নাট্য পরিচালক হিসেবে তিনি ১৯৭২ ও ১৯৭৫ সালে পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত নব্য সংগঠন নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

শিমুল ইউসুফ

এদেশের একজন সফল নাট্যশিল্পীর নাম শিমুল ইউসুফ। শুধু নাট্যাঙ্গণই নয়, কণ্ঠশিল্পী হিসেবেও তার পরিচিতি আছে। বাবা ছিলেন সঙ্গীত প্রিয় মানুষ। তার কাছ থেকেই গানের প্রথম অনুপ্রেরণা। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ১৯৬২ সালে খেলাঘর নামে শিশুদের একটি অনুষ্ঠানে প্রথম রেডিওতে অংশ নেন। এরপর শুধু সামনে চলা।

বর্তমানে তিনি ঢাকা থিয়েটারের সাথে জড়িত। এছাড়া তিনি অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছেন। টিভি'র চেয়ে মঞ্চ নাটকেই বেশি আগ্রহী তিনি। শকুন্তলা নাটকের গৌতমী ও কীর্তনখোলার ডালিয়া চরিত্রে তার অভিনয় বহুদিন মনে রাখার মতো।

শিমুল ইউসুফের পৈত্রিক বাড়ি শ্রীনগর থানার সমষপুর গ্রামে। জন্ম ১৯৫৭ সনের ২১ মার্চ বাবার কর্মস্থল ভৈরবে।

www.pathagar.com

তার অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে সভাপতি বলবেন (মঞ্চ) ঘরোয়া, ভাইবোন, গ্রন্থিকগণ কহে, পোস্ট মাস্টার, নির্বাসন (টি.ভি.) উল্লেখযোগ্য।

স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৬৪ সালের ২৪শে আগস্ট অল পাকিস্তান বেস্ট চিলড্রেন প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড, ১৯৯০ সালে লোকনাট্যদল কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পদক।

মোহাম্মদ মুসা

মোহাম্মদ মুসা একজন বিশিষ্ট ফটোগ্রাফারার। ১৯৭১ সালে মুজিব নগর সরকারের প্রথম ফটোগ্রাফারার হিসেবে কাজ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অজস্র প্রামাণ্য ছবি তার হাত দিয়ে তোলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের ফটোগ্রাফার পদে চাকুরীরত থাকাকালে '৭৫ পরবর্তী পর্যায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে তিনি চাকুরীচ্যুত হন। তখন তিনি মক্কা শরীফে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন এবং প্রায় ৫০ বারের অধিক হজ্ব পালন করেন। দেশে ফিরে ১৯৮৪ সালে কিছুদনি জাতীয় দৈনিকে স্টাফ ফটোগ্রাফার ছিলেন। পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের ফটোগ্রাফার রূপে অস্থায়ী নিয়োগ লাভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য প্রামাণ্য ছবি আগলে রেখে শেষ জীবনে তিনি বেকার ও অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করেন।

বাবুল আহমেদ

বাবুল আহমেদ ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত অভিনয় করে আসছেন। নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রূপায়ন ছাড়াও তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। দীর্ঘ অভিনয় জীবনের একটি পর্যায়ে এসে বাবুল আহমেদ প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন কয়েক বছর থেকে। এযাবৎ ১০/১২টি একক ধারাবাহিক নাটক প্রযোজনা করেছেন তিনি। তার পরিচালিত নাটক 'একজন মমতাজ', 'হৃদয়ে শুধু তুমি' দর্শক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

বিদেশে চিত্রায়িত বাংলাদেশের প্রথম প্যাকেজ নাটক 'বিলেতি বিলাস'ও নির্মাণ করেন বাবুল আহমেদ। ১২ পর্বের 'বিলেতি বিলাসে'র পুরোটাই চিত্রায়িত হয় লন্ডনের বিভিন্ন লোকেশনে। 'বিলেতি বিলাসে'র পর এবার তিনি হাত দিয়েছেন ১৫ পর্বের একটি ধারাবাহিক নাটক 'ভালবাসার নায়েগ্রা ফল্‌স' এ। এ নাটকটিও চিত্রায়িত হচ্ছে বিদেশের মাটিতে কানাডায়। পরিচালক, প্রযোজক ও নাট্য শিল্পী বাবুল আহমেদের বাড়ি বিক্রমপুরের লৌহজং থানায়।

www.pathagar.com

মুক্তার হোসেন

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মুক্তার হোসেন ১৯৫৮ সনের ১০ই জানুয়ারী লৌহজং থানার বৌলতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ডাঃ আব্দুল খালেক মোড়ল ও মায়ের নাম মোহরজান বেগম।

ছোটবেলা থেকেই মুক্তার হোসেনের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষন ছিল। ওস্তাদ হাসান আলী খান, ফজলুল হক ও বেদারউদ্দিন আহমেদের মত নামীদামী সঙ্গীতজ্ঞের কাছ থেকে তিনি সঙ্গীতের তালিম নেন। তিনি দিলদার হোসেন মোড়ল নামে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ বেতার এবং ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে তালিকাভুক্ত হন। এ পর্যন্ত একক, দ্বৈত ও মিক্সড অডিও বেড়িয়েছে ৬টি। তিনি একজন গীতিকার-সুরকারও বটে। দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এর মধ্যে জাপান, ভারত ও ইরাক উল্লেখযোগ্য। তিনি মরমী লোকগীতি শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির জীবন সদস্য। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের অনেক শিল্পী তার ছাত্র।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতায় বিক্রমপুর

সাংবাদিকতা সারা বিশ্বে একটি সম্মানজনক পেশা হিসাবে স্বীকৃত। সাংবাদিকগণ জাতির বিবেক। জনগণের শেষ ভরসা। একটি দেশ কতটুকু গণতান্ত্রিক তার পরিচয় পাওয়া যায় সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর।

মার্কোসের নির্বাচনী কারচুপি, তার স্ত্রী বিশ্বসুন্দরী ইমেলডার বিলাস-বহুল জীবনের কথা, আমেরিকায় তাদের হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির কথা সাংবাদিকরাই তুলে ধরেন। ফলে দেশে বিদেশে লৌহমানব বলে খ্যাত মার্কোসকে চোরের মত পালিয়ে যেতে হয়।

শুধু তাই নয় আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিক্রমপুরের অনেক কৃতি সন্তান এ মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে জাতীর শুশ্রুসা করে যাচ্ছেন।

কালী প্রসন্ন ঘোষ

সাংবাদিক সাহিত্যিক কালী প্রসন্ন ঘোষ লৌহজং এর ভরাকরে ১৮৪৩ সালের ২৩ জুলাই জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শিবনাথ। শৈশবে ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা শেষ করে দশ বছর বয়সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজী শেখেন। বাইশ বছর বয়সের সময় ঢাকার ছোট আদালতে পেশকারী পেশা গ্রহণ করেন। এখানে এগার বছর কাজ করার পর ২৮ মার্চ ১৮৭৭ সালে ভাওয়াল রাজ্যের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সালে পূর্ব বঙ্গের ব্রাহ্ম যুবকদের মুখপাত্র 'শুভ সাধিনী পত্রিকা' এবং ১৮৭৪ সালে 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেন। অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজী ও বাংলায় বক্তৃতা দিতে হত। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর বিশিষ্ট সদস্য, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য ও সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৯টি। উল্লেখযোগ্য 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯) 'প্রভাত চিন্তা' (১৮৭৭) 'ত্রিভৃত চিন্তা' (১৮৮৩) 'নিশিথ চিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি। তাঁর রচনাবলীতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিকচন্দ্র ও কার্লাইলের প্রভাব চোখে পড়ে। ইংরেজ সরকার তাকে রায়বাহাদুর ও সিআইই উপাধি প্রদান করেন। ১৯১০ সালের ২৯ শে অক্টোবর তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নারী জাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২০ এপ্রিল ১৮৪৪ সালে বিক্রমপুরের মাগুরখন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে বহুবিবাহ ও শিশু বিবাহের বিরোধিতা এবং অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহের সমর্থনে যে আন্দোলন শুরু করেন দ্বারকানাথ ছাত্রাবস্থায় তাতে যোগ দেন। ১৮৬৯ সালে

www.pathagar.com

"অবলা বান্ধব" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেন। ১৮৭০ সালে সংস্কারকদের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় নারীদের রক্ষা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও ছাত্রী নিবাস প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী ছিলেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছাত্র সমাজ ও ভারত সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হন। এখানেও তিনি মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন। ফলে তার ২য় স্ত্রী কাদম্বিনীর নেতৃত্বে ১৮৮৯ সালে প্রথম মহিলা দল কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালক। আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেন ও ইউরোপীয় মালিকদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের খবর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জিবনী'তে প্রকাশ করেন। ফলে আন্দোলন শুরু হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো 'বীর নারী' (নাটক) 'কবিগাঁথা' 'নববার্ষিকী' জীবনালেখ্য' সুরুচির কুটির' (উপন্যাস) প্রভৃতি। সংকলন গ্রন্থ 'জাতীয় সঙ্গীত'। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না'-দ্বারকানাথের স্বরচিত বিখ্যাত গানটি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। এছাড়া 'সরল পাটি গণিতম্ব 'ভূগোল', 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব' প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছেন তিনি।

সফিউদ্দিন আহমেদ

সফিউদ্দিন আহমেদের জন্ম লৌহজংয়ের হারিদিয়া গ্রামে। পিতা দেওয়ান জল কদর আহ্‌মেদ। ১৯৪৫ সালে নিখিল বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাপ্তাহিক মুখপাত্র দি মিল্লাতের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৪৬ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মিল্লাত ও দৈনিক আমার দেশের বার্তা প্রেরক। প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা প্রেরক। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান অবজারভারের বার্তাপ্রেরক। ১৯৬৪-৬৫ ইউ.পি.পি এর বার্তা প্রেরক। ১৯৬৪-৬৫তে দৈনিক আজাদের বার্তা প্রেরক।১৯৬৫ থেকে অদ্যাবধি দৈনিক পাকিস্তান ও বর্তমানে দৈনিক বাংলার বার্তা প্রেরক। ১৯৬৬ থেকে ৭৫ এ অবলুপ্তি পর্যন্ত দি মনিং নিউজ-এর বার্তা প্রেরক। ১৯৬৮-১৯৭১ এর ২৪শে মার্চ পর্যন্ত এ.পি.পির বার্তা প্রেরক ও ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল, ১৯৭২ পর্যন্ত বাসস-র বার্তা প্রেরক হিসেবে পূর্ণ নিয়োগ। ১৯৭২ এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত এনার বার্তা প্রেরক।

মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত পাক্ষিক গ্রামের কথার সম্পাদকীয় সদস্য। তদানীন্তন পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির পরপর তিনবার সাধারণ সম্পাদক ও একবার সভাপতি নির্বাচিত, স্বাধীনতা উত্তর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন।

www.pathagar.com

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মুন্সীগঞ্জ সৃজনী কচিকাঁচার মেলার পরিচালকের দায়িত্ব পালন। স্থানীয় সাংবাদিক সমিতি ও প্রেস ক্লাবের সভাপতি। স্থানীয় এ.ভি.জি.এম সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সদস্য। মুন্সীগঞ্জ শহরস্থ বিক্রমপুর কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর নির্বাচিত পরিচালক। মুন্সীগঞ্জ মহকুমা কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি ছিলেন তিনি। তিনি ললিত কলা পরিষদ, গণসদন কমিটির, ইউসিডি, হরেন্দ্রলাল সাধারণ পাঠাগার, বাংলাদেশ রেডক্রস ও মুন্সীগঞ্জ ইউনিট যুক্ষ বিরোধ সমিতির সদস্য।

১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় অনাহারী মানুষের কষ্ট লাঘবে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাঁর। ১৯৬৮ সালে মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় টর্নেডো বিধ্বস্ত লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। ১৯৭৪ সালে বন্যার সময় মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের বন্যাদূর্গত লোকদের মধ্যে তিনি যথাসাধ্য সেবা দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলা থেকে 'বিক্রমপুর বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত বের করছেন। তিনি বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি।

নিজামুদ্দিন আহমদ

বীর বাঙ্গালীর সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য যে ক'জন সাংবাদিক কলমযুদ্ধ করে গেছেন তাদের একজন অকুতোভয় সাংবাদিকের নাম নিজামুদ্দিন আহমদ। নিজামুদ্দিন আহমদ শুধু সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি ক্রীড়াবিদ, রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজ সেবকের ভূমিকায় নিজেকে বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছেন। নিজামুদ্দিন আহমদ ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে বিক্রমপুরের লৌহজং থানার মাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাজীর পাগলা হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর তিনি ১৯৪৭ সালে ভাগ্যকুল হাইস্কুল হতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হরগঙ্গা কলেজে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত অধ্যয়ন করার পর ১৯৫০ ও ১৯৫২ সালে জগন্নাথ হতে যথাক্রমে আইএসসি ও বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরি মাঝে তিনি আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।

স্কুলে পড়ালেখা করা অবস্থায় সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয় এবং ঐ সময় কোলকাতা হতে প্রকাশিত আজাদ ও ইত্তেহাদের স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তার উদ্যোগে ও আগ্রহে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা সংবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে সময় তিনি ঢাকার দৈনিক আজাদ, A. P. P ও কোলকাতার U.P.I -এর প্রতিনিধি। ঢাকায় কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি আজাদের স্টাফ রিপোর্টারের কাজ ছাড়াও করাচীর প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা ও দৈনিক সিন্ধু অবজারভার পত্রিকার ঢাকাস্থ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। তিনি কিছুদিন কোলকাতার সত্য যুগ ও Times of India'র কলকাতা সংস্করণের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি ছিলেন।

www.pathagar.com

নিজামুদ্দিন আহমদ ১৯৫৩ হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ইনকাম ট্যাক্স বিভাগে ওকালতির কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ দেন।

সাংবাদিকতার স্পৃহা কিন্তু তার মন থেকে মুছে যায়নি তখনও, তা আরও জাগ্রত হয় শত গুণে। তাই চাকরির লোভনীয় মায়া পরিত্যাগ করে ১৯৫৮ সালের ১লা আগস্ট পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন।

A.P.P. প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ঢাকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি হিসেবে কাজে যোগদান করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাজে একান্তভাবে নিজেকে নিবেদন করেন। নিজামুদ্দিন আহমদ নিজ কর্ম দক্ষতায় ১৯৬০ সালে এপিপির প্রধান রিপোর্টার এবং ১৯৬৪ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যুরো ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক সময় এর পূর্ব পাকিস্তানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজামউদ্দিন ১৯৪৬ সালে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসেবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে সিলেট গণভোটে ঢাকা জেলার ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতারূপে সিলেট যান। ১৯৬২ সালের শেষভাগে মুসলিম লীগ পুনর্গঠনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে করাচী সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুলসংখ্যক ভোটে পরাজিত করে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য নিযুক্ত হন। জনাব আহমদ ১৯৬৫ সালের জুলাই-এ রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। জনাব নিজামুদ্দিন ১৯৬০ সালে এপিপির প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সাথে সমগ্র পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৬২ সালে Commonwealth Relation of the United Kingdom -এর আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্য গমন করেন। এই সময় তিনি ফ্রান্স, জার্মানী, কায়রো, লেবানন সমাবেশে ভাষণ দেন। লন্ডনে তিনি তখন বিরোধীদলের নেতা হেরাল্ড ইউলসন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক দলের অন্যতম সদস্য হয়ে নেপাল সফর করেন। জনাব আহমদ পূর্ব পাকিস্তান যক্ষ্মা নিরোধক সমিতি, রেডক্রস সমিতি ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক সদস্য ছিলেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ছাত্রজীবনে তিনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্য দেখান। সাঁতারু হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি হরগঙ্গা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হন। এমনকি প্রাদেশিক সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও তিনি পুরস্কার লাভ করেন।

www.pathagar.com

নিজামুদ্দিন আহমদ শুধু একজন অকুতোভয় সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি প্রতিভাবান ছাত্র, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক, জননেতা ও সমাজসেবক হিসেবেও নিজেকে প্রকাশ করে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিবিসি এবং এপি'র নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবে শুধু তাঁর দায়িত্বই পালন করেননি, তিনি দেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

চারদিক থেকে যখন বীর বাঙ্গালীর জয়ের খবর আসতে থাকে সেই সময় নিজামুদ্দিন শবেবরাতে মুন্সীগঞ্জ থানা দখলের খবর দেন। বিবিসি এ ডেসপ্যাচ ফলাও করে ছড়িয়ে দেয় ইথারে এবং ১০ ডিসেম্বরের ডেসপ্যাচে বিবিসি জানায়, "জেনারেল নিয়াজী তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ফেলে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে"। উত্তেজিত অবস্থায় আকস্মিকভাবে জেনারেল নিয়াজী এসে হাজির হলেন একেবারে তৎকালীন হোটেল ইন্টারকনের লাউঞ্জে আর চিৎকার করে বললেন, কোথায় গেলো বিবিসির সংবাদদাতা? আমি তাকে বলতে চাই আমি আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এখনও পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছি। আমি কখনই আমার সৈন্যদের ফেলে যাবো না।

এর পরের দিন ১১-১২-৭১ আলবদর বাহিনী তাকে খাবার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে যায়। তখন তার গায়ে ছিল মাত্র গেঞ্জি ও লুঙ্গি। পরে মিরপুরের বধ্যভূমিতে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তারই গেঞ্জি ও লুঙ্গি দিয়ে হাত, চোখ বাঁধা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বোমা বিধ্বস্ত গভর্নর হাউজে প্রাপ্ত একটা নোটশীটে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ইংরেজী হাতের লেখার চারটা পয়েন্ট এ লেখা ছিল (১) নিজামউদ্দিন- উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ (এপি)।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যে ক'জন সাংবাদিক জাতির কাছে নমস্য হয়ে থাকবেন তাদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আহমদ অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক।

ফয়েজ আহমদ

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি, বহু গ্রন্থের প্রণেতা বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের জন্ম বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানায়। প্রায় ৪০ বছর তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। তিনি জাতীয় সংবাদ সংস্থার (বি এস এস) এর প্রথম প্রধান সম্পাদক এবং দৈনিক 'বঙ্গবার্তা'রও প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে পিকিং রেডিওতে বাংলা অনুষ্ঠান প্রবর্তনের জন্য কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'পর্যবেক্ষক' নামে রাজনৈতিক ভাষ্যকার, ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম সাধারণ সম্পাদক, পরে লেখক ইউনিয়ন ও তাহের সংসদের সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার

www.pathagar.com

সহ ৮টি পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। তিনি মতিউর পুরস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ষাটের দশকে প্রায় চার বছর কারাবরণ করেন। বর্তমানে ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিকতার সাথে জড়িত।

প্রশান্ত ঘোষাল

প্রশান্ত ঘোষালের জন্ম মুন্সীগঞ্জের (শ্রী পল্লীতে) ১৯৪১ সালে। পিতা ডাঃ প্রমথনাথ ঘোষাল। মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, হরগঙ্গা কলেজ থেকে আইএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ অনার্স ও এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন পরে সাপ্তাহিক পূর্বাণী ও দৈনিক ইত্তেফাকে সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাকের শিফট ইনচার্জ।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাক্ষর' ও 'বক্তব্য' নামের দু'টি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদনা করেন। রেডিও বাংলাদেশের বেতার কথিকায় অংশগ্রহণ ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন।

রণেশ দাশ গুপ্ত

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক রণেশ দাশ গুপ্তের পৈত্রিক ভূমি লৌহজংয়ের গাউপাড়ায়। বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিচিত মুখ জীবনের অনেক সময় তিনি জেলের অন্তরালে কাটিয়েছেন। বেশ কিছুদিন দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক ছিলেন। শুধু কলামিস্ট নন, একজন উঁচু দরের লেখক হিসেবে অনেক সৃজনশীল লেখা উপহার দিয়েছেন। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা', 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে', আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা (অনুবাদ) সম্পাদনা করেন 'সোমেন চন্দের গল্প গুচ্ছ, জীবন ভিত্তিক গ্রন্থ সুবর্ণ থেকে বুড়িগঙ্গা। অকৃতদার রণেশ দাশ গুপ্ত কলকাতায় বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

মোঃ শাহজাহান

মোঃ শাহজাহান ১৯৪৪ সালে লৌহজংয়ের কাজীরগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে ইতিহাসে এম এ ডিগ্রী গ্রহণের পরবর্তীকালে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা করেন। তিনি ১৯৮০ সালে পশ্চিম জার্মানী থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা নেন। শাহজাহান বর্তমানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) সিনিয়র সাব-এডিটর ও শিফট-ইনচার্জ হিসেবে কার্যরত আছেন। তিনি পশ্চিম জার্মান সংবাদ সংস্থা (ডিপিএ)-র বাংলাদেশ সংবাদদাতা। শাহজাহান ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

মোজাম্মেল হোসেন মন্টু

মোজাম্মেল হোসেন মন্টু ১৯৪৫ সালের ১০ জানুয়ারী মুন্সীগঞ্জ সদরের পুরাতন হাসপাতাল রোডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবুল কাসেম মিয়াজী মাতা আলতাফুন্নেছা। মোজাম্মেল হোসেন মন্টু ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ সাংবাদিক, প্রগতিবাদী লেখক ও সংগঠক। তিনি এম এ ১ম পর্ব সম্পন্ন করার পর '৬৮ সালে দৈনিক 'সংবাদ' এ সহ সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সংবাদেই ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ১৬ই ডিসেম্বর এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন।

মোজাম্মেল হোসেন মন্টুর মাক্সিম গোর্কীর মা উপন্যাসের নাট্যরূপ, শহীদ সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পের নাট্যরূপ, গোর্কির 'বিপ্লবের টুকরো ছবি শীর্ষক নকশার নাট্যরূপ এবং '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত 'ঝড়ো হাওয়া ফেরার' নাটক সৃজনীর ব্যানারে মঞ্চস্থ হয়েছে। তাছাড়া তিনি গ্রীক কবি ও নাট্যকার এস্কাইলাসের 'বন্দী প্রমিথিউস প্রমুক্ত প্রমিথিউস' কাব্য নাট্যের অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া বহু পত্রপত্রিকায় অসংখ্য গল্প কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঘাস ফুল নদী প্রকাশন আশরাফ আলম কাজলের সম্পাদনায় মোজাম্মেল হোসেন মন্টুর রচনা সমগ্র প্রকাশ পেয়েছে।

শেখ মোঃ নুরুল ইসলাম

শেখ মোঃ নুরুল ইসলাম লেখক ও সাংবাদিক। ১৯৫০ সালের ১৪ই জুন শ্রীনগরের বেজগাঁও গ্রামে তার জন্ম। বর্তমানে দৈনিক দিনকাল-এ সম্পাদকীয় সহকারী হিসেবে কর্মরত। তিনি স্নাতক এবং সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা অর্জন করেন। শেখ মোঃ নুরুল ইসলাম এ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশেষ করে বিক্রমপুর বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগুলি তার জন্মভূমি বিক্রমপুরের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসার পরিচায়ক। তিনি অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদের মহাসচিব ছিলেন। নজরুল এর উপরও গবেষণা করেছেন। 'নজরুল জীবনের অশ্রুত কাহিনী', 'ইতিহাসের নিরিখে বাবরী মসজিদ্' ও 'রাম জন্মভূমি মন্দির', 'ভারতে মুসলিম নির্যাতনের ইতিহাস', 'নজরুল জীবনের করুণ অধ্যায়' (যন্ত্রস্থ), বিক্রমপুর নামে কেন জেলা চাই (পুস্তিকা, ১৯৮৮) তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ।

গুলশান আহমদ

গুলশান আহমদ লৌহজংয়ের মাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলভী মমিনুল ইসলাম।

তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি সাপ্তাহিক রূপসীর সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত। বাংলাদেশে মহিলাদের সাংবাদিকতায়

www.pathagar.com

এগিয়ে আসার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 'রূপসী' প্রায় এক যুগ ধরে প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে।

মহিউদ্দিন খান মোহন

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট মহিউদ্দিন খান মোহন সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব হিসেবে যোগ দিয়েছেন। বর্তমান পদে যোগদানের আগে তিনি দৈনিক দিনকালের সম্পাদকীয় সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মহিউদ্দিন খান মোহন দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা ও লেখালেখির সাথে জড়িত। দৈনি ক দেশ, দৈনিক আজাদ, দৈনিক দেশ জনতাসহ দেশের বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকে তিনি নিয়মিত কলাম লিখেছেন। একজন ছড়াকার হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। জনাব মহিউদ্দিন খান মোহন জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাস এর কেন্দ্রীয় সহ প্রচার সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। জনাব মহিউদ্দিন খান মোহন মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানসার মাগুরগাঁও গ্রামের সন্তান। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবক মরহুম সুলতান আহমেদ খান এর পুত্র। তিনি শ্রীনগর প্রেসক্লাব ও বিক্রমপুর প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা।

গোলাম কাদের

গোলাম কাদের মুন্সীগঞ্জ সদর থানার দেওভোগ গ্রামের অধিবাসী। জন্ম পিতা সিরাজুল ইসলামের কর্মস্থল ময়মনসিংহের মেলানদহে ১৯৫৬ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা (অনার্স) ও এম এ করেন। পরে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি দৈনিক দেশ, দৈনিক জনতায় দীর্ঘদিন কাজ করেন। এবং বিক্রমপুর বার্তার (সাপ্তাহিক) নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। লেখক, গবেষক ও কবি গোলাম কাদের বিক্রমপুর বিষয়ক গবেষনায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। বিক্রমপুর মনীষা ছাড়াও তার 'বিক্রমপুর আমার বিক্রমপুর' (১৯৮৫) সালে প্রকাশ পায়।

কাব্যগ্রন্থ বেরোয় ১৯৭৫ সালে 'কুসুমপুরের অনন্ত চাষা' 'খুব ভুলেও যাইনি খুব মনেও রাখিনি' (১৯৯২) বাংলাদেশের হৃদয় কমল (১৯৯৪)। এছাড়া 'বিক্রমপুর' 'এশিয়ার চোখ' নামে দু'টি সম্পদনা গ্রন্থ প্রকাশ পায়। সংগঠক হিসেবে স্বাধীনতার পরপর ঘাস ফুল নদী সাহিত্য সংস্কৃতি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন যা মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। বিশেষ করে মুন্সীগঞ্জের নদী ভাঙ্গন রোধে একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মী। বর্তমানে তিনি মাসিক ব্যাংক বীমা শিল্প ডাইজেস্ট নামে অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা ও শিশু-কিশোরদের পাক্ষিক 'নবতরু' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক।

www.pathagar.com

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিক্রমপুরের অবদান

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর এ ভূবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' আরেকটি সূর্যোদয় দেখার এই আকুল আগ্রহ নিয়ে, পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধকে আরো কিছুকাল পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আমরা যাদের কাছে যাই, তারা চিকিৎসক। তারা তাদের শ্রম, মেধা ও মমতা দিয়ে আমাদের সারিয়ে তোলেন। আমরা সুস্থ হই। পৃথিবীকে আবার নতুন করে দেখি। চিকিৎসকরা আমাদের পরমবন্ধু। এমন অনেক চিকিৎসক আছেন যারা সাধারণ মানুষের সুখের জন্য তাদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েস ভুলে কাটিয়ে দেন জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো। এমন অনেক নামি দামি চিকিৎসকের জন্মস্থান বিক্রমপুর।

কুমুদ শঙ্কর রায়

দেশের একজন নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় ১৮৯২ সালে তেওতা গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন।পিতা হরিশঙ্কর রায়। তিনি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি কলকাতা ও এডিনবরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বিএস সি, এমবি, এমডি, সি এইচ বি ডিগ্রীপ্রাপ্ত কুমুদ শঙ্কর ওহিল হিল স্যানাটোরিয়ামের সহকারী সুপারিন্টটেনডেন্ট ছিলেন। ১৯০৮ সালে কলকাতায় ফিরে তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক হন। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সঙ্গেও যুক্ত হন। ১৯১৮ সালে চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্র প্রভাস ঘোষ যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সময় তার দুই লাখ টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ট্রাস্টিকে দিয়ে যান। তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই ক্যালকাটা মেডিকেল এইচ এন্ড রিসার্চ সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হওয়া, ১৯২২ সালে এই সোসাইটির সংগঠক ও সম্পাদকের দায়িত্ব নেয়া এবং ধীরে ধীরে এই সোসাইটির যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণ করা। হাসপাতালে বহু কটেজ, ওয়ার্ড ও ব্লক সংযুক্তিতে এবং ক্রমোন্নতিতে অবদান রেখেছেন এবং এই হাসপাতালে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। ২৪ অক্টোবর ১৯৫০ সালে মৃত্যুর পর ঐ হাসপাতালের নামকরণ হয়েছে কুমুদ শঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল। এছাড়া তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান। মাদ্রাজের ভেলোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মোঃ আবুল কালাম

মোঃ আবুল কালাম ১৯২৫ সালে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে এম বি বি এস পাস করার পর তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান।

www.pathagar.com

অক্ষয় কুমার বসু চৌধুরী

অক্ষয় কুমার বসু চৌধুরী ছিলেন একজন সফল শিক্ষক, দরদী চিকিৎসক, জন প্রতিনিধি ও সমাজ সেবক।

শিক্ষানুরাগী এ মানুষটি জীবনে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যার মধ্যে নিজ বাড়িতে অবস্থিত ষোলঘর এ.কে.এস.কে হাইস্কুল, ভবানীপুর বালিকা বিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন বালিকা বিদ্যালয় ও মডার্ন সুবাধন গার্লস স্কুল অন্যতম।

শুধুমাত্র শিক্ষক হিসেবেই নয়, একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হয়েও তিনি মানুষের সেবা করে যান। বহু রোগীকে তিনি নিজ বাড়িতে রেখে সেবা করেছেন।

জনপ্রতিনিধি হিসেবেও অক্ষয় কুমারের সুনাম আকাশ চুম্বি। এক টানা ২০ বছর ষোলঘর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করার বিরল ইতিহাসের স্রষ্টা তিনিই। সমাজ সেবক এই ক্ষণজন্মা পুরুষের বাড়ি শ্রীনগর থানাধীন ষোলঘর গ্রামে।

আশিকুর রহমান খান

আশিকুর রহমান খান ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীনগন থানার ষোলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলভী আজিজুর রহমান খান।

তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস, ১৯৬০ সালে পাঞ্জাব থেকে D.P.H ১৯৬৬ সনে করাচী থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে এম, ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি রোম, তেহরান থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ অর্জন করে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন রিচার্স-এর তিনি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট।

মাযহারুল ইসলাম

ডাঃ মাযহারুল ইসলাম ১৯২৮ সালের ৯ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের বাড়ি লৌহজংয়ের মাওয়া। পিতা খান সাহেব আজিজুল ইসলাম। তিনি মেধাবী ডাক্তার ছাড়াও খেলার মাঠে সুনিপুণ ক্রীড়ামোদী 'দামাল ভাই'। তিনি ১৯৫৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে এক অসাধারণ বিষয়ের উপর তিনি বিশেষজ্ঞদের ডিগ্রী লাভ করেন। তার প্রচেষ্টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে "আইসোটাপ বিভাগ" একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে রূপ নিয়েছে। এই বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ম্যানিলা ও সুইডেনে গিয়েছিলেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম রেডিও আইসোটোপ সেন্টারের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ডায়বেটিক ও মেডিক্যাল রিটালোর গবেষণা কাজেও তিনি বিশেষ সাহায্য করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বিক্রমপুর চিকিৎসা সমিতির উপদেষ্টা ও একজন সক্রিয় চিকিৎসক ছিলেন।

www.pathagar.com

ডাঃ মাযহারুল বা ডাঃ দামাল ছিলেন একজন জাতীয় মানের উন্নত ক্রীড়াবিদ। খেলার মাঠে তার সদাহাস্য মুখ মাঠকে প্রাণবন্ত করে রাখতো।

প্রথম জীবনে কলকাতায় মোহামেডান ক্রিকেট টিমের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে ইন্ডিয়ান স্কুল ক্রিকেট টিমের সাথে ইউরোপীয় স্কুলসমূহের ক্রিকেট ম্যাচে খেলায় তিনি সার্থক ও সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে বার্মার বিরুদ্ধে জাতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পাকিস্তানের পক্ষে সেকালের এফ মাহমুদের সাথে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে বিদেশী দর্শকদেরও মন জয় করেছিলেন। তিনি কয়েকবার এম,সি,সি ও ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছেন। ১৯৬৮ সাল থেকে ৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তা ও পরে ১৯৭২ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপের শিরোপা অর্জন গৌরবের অধিকারীও তিনি ছিলেন। তিনি "জিমখানা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ১৯৮০ সালের ১৯ অক্টোবর আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্মরণে এখন 'দামাল সামার' ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ক্রিকেটামোদীদের জনপ্রিয় মৌসুমী খেলা।

তোফায়েল আহমদ

বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডাঃ তোফায়েল আহমদ ১৯২৯ সালে লৌহজং থানার কাজির পাগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার থেকে শিশুরোগের উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬২ সালে D.C.H. ডিগ্রী লাভ করেন এবং লণ্ডনের সেল্ট ম্যাথুস হাসপাতালে গবেষণা সহকারী হিসাবে দু'বছর কাজ করেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ফাইজারের মেডিকেল ডাইরেক্টরের পদ নিয়ে দেশে ফিরেন। ১৯৬৭ সালে করাচীর জিন্নাহ পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল সেন্টারে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অব প্যাডিয়াট্রিক-এর ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে আমেরিকা থেকে F.C.C.P. লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এণ্ড হাইজিন-এ ফেলো নির্বাচিত হন।

তিনি RURAL PAEDIATRICS বিভাগের প্রধান ছিলেন ও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। পল্লী শিশু ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ ঢাকা শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যান। ১৯৯৭ ফেব্রুয়ারী তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সফল রাজনীতিবিদ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ১৯৩২ সালের ১লা নভেম্বর শ্রীনগর থানার দয়াহাট মজিদপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কফিলউদ্দিন চৌধুরী।

জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী ১৯৪৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯৫১ সালে ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে T.D.D এবং ১৯৬১ সালে এডিনবরা ও গ্লাসগোর রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ান থেকে M.R.C.P এবং ১৯৭৮ সালে F.R.C.T অর্জন করেন। দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ চৌধুরী সুবক্তা ও সদালাপী, তিনি NATAB-এর সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য আন্দোলনের আহবায়ক, বাংলাদেশ-মিশর মৈত্রী সমিতির সভাপতি, বাংলাদেশ জাতিসংঘ পরিষদের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক কথক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বাস্থ্যবিষয়ক জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান প্রেসক্রিপশন ও নব্বইয়ের দশকে জাতীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে টিভি অনুষ্ঠান অবসর চমৎকারভাবে উপস্থাপনা করেছেন। ১৯৭৬ সালে লাভ করেন জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিএনপির মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পর পর পাঁচ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বিএনপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি বিএনপি'র সহ-সভাপতি ও বিরোধী দলের উপনেতাও ছিলেন। ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন অতপর ১৩ই নভেম্বর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠন ছাড়াও কূটনীতিতে অভাবিত সাফল্যের পরিচয় দেন। এত কিছুর পরও তিনি একজন সমাজ সেবক, একজন চিকিৎসক। এখনও মানুষ তার সেবা পাচ্ছে। তিনি মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন।

এ, কে, এম, মজিবুল হক

ডাঃ এ, কে, এম, মজিবুল হক বিক্রমপুরের টঙ্গীবাড়ী থানার বাগবাড়ী গ্রামের আলহাজ্ব কবির উদ্দিন সাহেবের ২য় পুত্র। তিনি ছাত্র জীবনে মেধাবী ছিলেন ও বর্তমানে একজন সার্থক চিকিৎসক। তিনি যথাক্রমে ১৯৫৫ সালে এম,বি,বি, এস ঢাকা, ১৯৬৪ সালে উকু (এডিন) ও ১৯৬৭ সালে MRCP (লন্ডন) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পি,জি

www.pathagar.com

হাসপাতাল ও সিলেট মেডিকেল হাসপাতালের মেডিসিনের অধ্যাপক হিসেবেও নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি Institute of Cardio-vascular disease এর প্রধান পরামর্শদাতা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি National heart-foundation এরও যুগ্ম সম্পাদক। এছাড়া তিনি উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও অধ্যক্ষ।

রশিদ-ই-মাহ্‌বুব

ডাঃ রশিদ-ই-মাহ্‌বুব ১৯৪৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জ সদর থানার রুহিতপুর। পিতা মৃত তমিজ উদ্দিন আহ্‌মেদ।

তিনি ১৯৫৮ সনে মুন্সিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ১৯৬০ এ হরগঙ্গা কলেজ থেকে আই,এস,সি, ১৯৬৬তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস ও ১৯৭৪এ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস, ঢাকা থেকে এফ,সি,পি,এস ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ১৯৮০ সনে যুক্তরাজ্যের কমনওয়ে মেডিক্যাল থেকে ফেলোশীপ করেন।

জনাব রশিদ-ই-মাহ্‌বুব কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সিলেট মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সার্জারী বিভাগের অধ্যাপক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়শনের সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনের সিনিয়র সহ-সভাপতি, মেডিকেল শিক্ষক সমিতি, ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারী বিভাগের ডীন ও প্রধান ও বি. এম. এর নির্বাচিত সভাপতি।

ডাঃ সৈয়দ বাবর হোসেন

বিশিষ্ট চিকিৎসক , ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক সৈয়দ বাবর হোসেন ১৯৪৩ সনের ১৫ নভেম্বর টংগীবাড়ী থানার দামপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তার বাবার নাম সৈয়দ আব্দুল গণি।

মেধাবী ছাত্র সৈয়দ বাবর হোসেন ১৯৬০ সনে মুন্সিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এস. এস. সি, এবং হরগঙ্গা কলেজ থেকে কৃতিত্ত্বের সাথে আই.এস. সি, পাশ করে সিলেট মেডিক্যাল কলেজে এম. বি. বি. এস, কোর্সে ভর্তি হন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পরেন। ১৯৬৬ - ৬৭ ও ১৯৬৭ - ৬৮ পর পর দু'বার তিনি সিলেট মেডিক্যাল কলেজ শাখার ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি

www.pathagar.com

সিলেট জেলার ছাত্র লীগেরও সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ সনে তিনি সিলেট থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন এবং ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ শাখার নির্বাচিত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

১৯৭০ সনে এম .বি.বি.এস কোর্স সম্পন্ন করেন এবং একই বছর আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৭২ সনে সরকারী চাকুরী শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর জেলে যেতে হয় তাকে। মুক্তির পর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ যান এবং ভিয়েনা থেকে ডি.ডি. ডি, লন্ডন থেকে এম.আর.এস এইস,অষ্ট্রিয়া থেকে এফ. ভি. ভি , ডিগ্রী লাভ করেন। ফিরে এসে ফুলবাড়িয়া সরকারি কর্মজীবি হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

আব্দুল কাদির খান

অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল কাদির খান ১৯৪৬ সালের ১১ জানুয়ারি শ্রীনগর থানার বাসাইলভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ আব্দুল জলিল খান। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন।

অত্যন্ত সাধাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ডাঃ কাদির খান কাব্য চর্চার সাথেও জড়িত। 'শেষ পোস্টার' তার একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ। এছাড়া তিনি 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' নামে একটি মাসিক প্রকাশনার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

পেশাগত দায়িত্ব এবং সামাজিক অঙ্গীকার পালনে জনাব আব্দুল কাদির খান বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। এরমধ্যে তিনি প্রভোস্ট, 'স্যার ফজলে রাব্বি হল', ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সভাপতি, শিক্ষক সমিতি, 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ', সদস্য, কার্ডিয়াক সোসাইটি', পরিচালক, 'কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সার্ভিসেস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া তিনি অষ্ট্রেলেশিয়ান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিষ্ট এর সহযোগী মেম্বার এবং বায়োকেমিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন।

ডাঃ আব্দুল মালেক ভূইয়া

ডাঃ আব্দুল মালেক ভূইয়া ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী বিক্রমপুরের কুকুটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আলহাজ্ব আবদুল হাকিম ভূইয়া। তিনি ১৯৬৫ সনে এস, এস, সি, ১৯৬৭ সনে এইচ, এস, সি ও ১৯৭৩ এ ডেন্টাল সার্জারীতে স্নাতক ডিগ্রী

www.pathagar.com

লাভ করেন। এরপর ১৯৭৯-৮০ তে ভারত ও থাইল্যান্ডে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। চাকুরী ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ১৯৭৪ এ এক বছরের রোটারী সার্ভিস ট্রেনিং, ১৯৭৫ এ সরকারী স্বাস্থ্য সেবায় ডেন্টাল সার্জন, ১৯৮৫ তে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় কনজারভেটিভ ডেনটেস্ট্রির সহকারী প্রফেসর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ আবদুল মালেক ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির যুগ্ম সচিব ও, ১৯৯৫ এ সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৮ থেকে অদ্যাবধি একই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ডাঃ আবদুল মালেক পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দ্যেশ্যে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য সম্মেলনে যোগ দেন। এর মধ্যে ১৯৯৭ সনে সিউলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক বিশ্ব ডেন্টাল কংগ্রেস, ১৯৯৮ সনে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত একুশ তম এশিয়া প্যাসিফিক ডেন্টাল কংগ্রেস, ২০০০ সনে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ত্রৈবার্ষিক কমনওয়েলথ ডেন্টাল কংগ্রেস ও ৫৪ তম ইন্ডিয়ান বার্ষিক ডেন্টাল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিনিধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ আবদুল মালেক পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। তিনি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় বিনামূল্যে ডেন্টাল ক্যাম্পের প্রচলন করেন। এছাড়া মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন ও দাতের প্রতি যত্নবান করে তোলার জন্য, 'বাংলাদেশে শহর ও গ্রামীণ জনগণের দন্ত রোগের বৃত্তান্ত', 'দন্ত চিকিৎসায় ফ্লোরাইডের ব্যবহার' নামে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া সাধারণ মানুষের মুখের স্বাস্থ্যের যত্নে উৎসাহ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে তিনি বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রচুর লেখা-লেখি করে আসছেন।

ডাঃ মাহমুদা খাতুন

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ মাহমুদা খাতুন ১৯৫১ সনের ১০ই জানুয়ারী শ্রীনগর থানার কোলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।তার বাবার নাম মোহাম্মদ মোহসেন আলী।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী মাহমুদা খাতুন যশোর দাউদ পাবলিক হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি, যশোর মাইকেল মধুসুদন কলেজ থেকে এইচ.এস .সি ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি.বি এস. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি এফ. সি. পি. এস ডিগ্রী নেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিভাগের অধ্যাপিকা হিসাবে কর্মরত আছেন।

www.pathagar.com

ডাঃ মাহমুদা খাতুন চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে অংশ গ্রহনের উদ্দ্যেশে ১৯৮৭ সনে আমেরিকা, ১৯৯৮ সনে নেপাল ও থাইল্যান্ড এবং ১৯৮৯ সনে থাইল্যান্ড ও সিংগাপুর ভ্রমন করেন। এছাড়া চিকিৎসা বিষয়ে বেশ কিছু প্রকাশনাও রয়েছে তার। উল্লেখ্য তার বড় ভাই মোফাজ্জল হোসেনও একজন চিকিৎসক ছিলেন।

মোঃ মতিউর রহমান

ডাঃ মোঃ মতিউর রহমান ১৯৫২ সালের ৬ জুন টঙ্গীবাড়ির সোনারং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম হাবিবুর রহমান। বর্তমানে তিনি আই.জি.পি.এম.আর. ঢাকার শিশু শল্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

নিলুফার করিম

ডাঃ নিলুফার করিম ১৯৫৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের লৌহজং থানাধীন কলমা গ্রাম। তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রথম নিয়মিত এম.বি.বি.এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। পরে ডি.এম.সি.এস.পি এন্ড এফপ ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি স্ত্রীরোগ ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রাক্টিস করছেন। উল্লেখ্য তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এ, কিউ, এম বি, করিমের কন্যা এবং ডাঃ আব্দুল কাদির খানের সহধর্মীনি।

মোঃ মনিরুজ্জামান ভূইয়া

শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মনিরুজ্জামান ভূইয়া ১৯৫২ সালে শ্রীনগর থানার দামলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আফাজ উদ্দিন ভূইয়া।

জনাব ভূইয়া একজন সফল সংগঠক। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি বহু সামাজিক ও সেবামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি বি.পি.এম.পি'র সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ও বাংলাদেশ ক্লিনিক ওনার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, বৃহত্তর ঢাকা চিকিৎসক সমিতি ও বিক্রমপুর চিকিৎসক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ হার্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ ফেমিলি প্ল্যানিং এসোসিয়শনের আজীবন সদস্য এবং বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতি, সার্ক শিশু চিকিৎসক কোষাধ্যক্ষ। বর্তমানে সিনিয়র কনসালটেন্ট ও উপাধ্যক্ষ হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট কলেজ হাসপাতাল। ইউএনডিপি ক্লিনিক ঢাকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনার, ইরান এ্যাম্বেসীর কনসালটেন্ট।

www.pathagar.com

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম একজন নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক ও সংগঠক। ১৯৫৪ সনে রামপালে তার জন্ম। বাবার নাম মোঃ কফিল উদ্দিন শেখ। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র জাহাঙ্গীর আলম ১৯৭০-এ রামপাল এন,বি,এম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস,এস,সি ও ১৯৭২ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৭৯-তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস, পাশ করেন। এছাড়া ১৯৯৩ সালে ব্যাংকক থেকে আলটাসনোগ্রাফীতে ডিপ্লোমা ও ১৯৯৪ এ ঢাকায় হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ফ্রি ক্লিনিকের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য দুস্থ মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তাঁর নেতৃত্বাধীন মেডিকেল টিমের কার্যক্রম সমাজে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে তিনি মানুষ হিসেবে সমাজের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেগুলো হল, পরিচালক, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ, সেক্রেটারী জেনারেল, সোসাইটি ফর হসপিটাল এডমিনিস্ট্রেশন, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক ওনার্স এসোসিয়েশন, ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার এসোসিয়েশন, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লায়ন ক্লাবস্ অব বিক্রমপুর, ব্যবস্থাপনা পরিষদ সদস্য, রামপাল ডিগ্রী কলেজ, পাবলিক হেলথ্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, কে ৩১ ডক্টরর্স সোসাইটি, সেক্রেটারি জেনারেল, গ্রেটার ঢাকা চিকিৎসক সমিতি, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ডাঃ জাহাঙ্গীর ফ্রি ক্লিনিক, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সুকুন্দি হাসপাতাল।

ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে জাপান, আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন, ফ্রান্স, ইটালি, তুর্কি, ইরান, কুয়েত, ভারত, পাকিস্তান, সিংগাপুর, হংকং ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন। উল্লেখ্য তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেছেন।

মোঃ হেদায়েত হোসেন খান

বিশিষ্ট হাড় ও জোড়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ হেদায়েত হোসেন খানের বাড়ী শ্রীনগর থানার কামারগাঁও গ্রামে । ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। বাবার নাম মোঃ নাবালক হোসেন খান। সাত ভাই দু'বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়।

www.pathagar.com

জনাব খান ১৯৬৯ এ ঢাকার জুবলি স্কুল থেকে এস,এস,সি, ১৯৭২ এ জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচ এস,সি, ১৯৭৮এ সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস ও ১৯৮২ তে পোস্ট গ্রাজুয়েট সম্পন্ন করেন।

বর্তমানে ডাঃ খান সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের অর্থপেডিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য বিশিষ্ট গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাঃ কানিজ ফাতেমা তার সহধর্মিনী।

জনাব হেদায়েত হোসেন খান পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান অর্থপেডিক সোসাইটি, সোসাইটি অফ সার্জন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি ও অর্থপেডিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের আজীবন সদস্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এম এ হাকিম

ডাঃ এম এ হাকিম ১৯৫৪ সালে বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানাধীন কেয়টখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মরহুম এম, এ কাদির ছিলেন একজন সরকারী চাকুরীজীবী। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে ডাঃ হাকিম সবার ছোট, বড় ভাই সরকারী চাকুরী থেকে অবসর প্রাপ্ত জীবন যাপন করছেন।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র জনাব হাকিম স্কুলে বরাবরই প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, তিনি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করার পর তার গ্রুপ ক্যাপ্টেন হারুণ সাহেবের নেতৃত্বে জয়পাড়া, নওয়াবগঞ্জ থানাধীন "সালিমপুর" যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। তৎকালীন থানা কমান্ডার জনাব আতিকুল্লাহ খান মাসুদের নেতৃত্বে ষোলঘর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে কাজ করতেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন হাসপাতাল ও ড্রাগ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মাননীয় বিরোধী দলীয় উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর একান্ত সচিব হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

জনাব হাকিম ব্যক্তিগত জীবনে বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে সমাজ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

বদিউজ্জামান ভূইয়া

যৌন বাহিত রোগ ও এইডস্ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বদিউজ্জামান ভূইয়া ১৯৫৫ সনে ১৬ জুলাই ঢাকায় জন্মগ্রহন করেন। তার পৈত্রিক নিবাস শ্রীনগর থানাধীন দামলা গ্রাম। বাবার নাম আফাজ উদ্দিন আহমেদ।

www.pathagar.com

জনাব বদিউজ্জামান চট্রগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি.বি.এস. করার পর ইংলেন্ড থেকে উক্ত বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বহু সংগঠনের সাথেও জড়িত আছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক উপ-পরিষদের সদস্য,বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, ন্যাশনাল এইড্ কমিটির সদস্য,ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট হাসপাতালের ম্যানেজম্যান্ট কমিটির সদস্য,আমেরিকান বায়ো গ্রাফিক্যাল ইনষ্টিটিউট (ইউ এস. এস এ) এর সদস্য,ও ইন্টারন্যাশনাল ফিজিশিয়ান ফর প্রিভেনশন অফ নিউ ক্লিয়ার ওয়্যার এর ডেপুটি কাউন্সিলর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দানের উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যে ভারত, পাকিস্থান, নেপাল, মালয়েশিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স ইংল্যান্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বাস্থ বিষয়ক লেখাগুলো তার উল্লেখযোগ্য সৃজনশীল কর্ম।

খন্দকার আবুল কালাম

বিশিষ্ট চিকিৎসক খন্দকার আবুল কালাম ১৯৫৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীনগর থানাধীন মদনখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম খন্দকার আব্দুল বারী ও মায়ের নাম আরজান নেসা।

জনাব আবুল কালাম ১৯৭১ সনে চুড়াইন তারিনী বামা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন, ১৯৭৩ সনে মুন্সীগঞ্জ আদর্শ কলেজ থেকে আই, এস, সি ও ১৯৮০ সনে স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের আল জাবা পাবলিক হেলথ কেয়ার সেন্টারে কর্মরত আছেন।

নুর মোহাম্মদ

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নুর মোহাম্মদ ১৯৫৭ সনের ১লা জানুয়ারী লৌহজং থানার নয়না কান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মুজাফফর আলী ও মায়ের নাম মোসাম্মৎ জমিলা খাতুন।

জনাব নুর মোহাম্মদ ঢাকা থেকে বি,ডি,এস এবং মালয়েশিয়া থেকে এম, ডি, এস, সি ডিগ্রী নেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা ডেন্টাল কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

www.pathagar.com

মোঃ আবু ইউসুফ ফকির

নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ আবু ইউসুফ ফকির ১৯৬৩ সালের ১১ই নভেম্বর লৌহজং থানার গোড়াকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মরহুম রমিজ উদ্দিন ফকির।

জনাব ইউসুফ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস করে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, এল ও এবং এফ, সি, পি, এস ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নাক, কান, গলা বিভাগের সার্জন হিসেবে কর্মরত।

জনাব ইউসুফ চিকিৎসার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। তিনি স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশ সোসাইটি অব অটোল্যারি বোজির সদস্য, বি, এম, এ'র আজীবন সদস্য, ঢাকা মেডিকেল কলেজের কেবিন বরাদ্দ কমিটির সদস্য, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যান্টিন পরিচালনা কমিটির সদস্য, ঢাকা মেডিকেল কলেজের পুরাতন ফার্নিচার মেরামত কমিটির চেয়ারম্যান, আওয়ামী লীগ কলমা ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক, মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, থানা বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা মহানগর শাখার নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহ্‌জাহান হাফিজ

শাহ্‌জাহান হাফিজের জন্ম টঙ্গীবাড়ী থানার ধামারণ গ্রামে। তিনি ঢাকা থেকে এম.বি.বি.এস. পাস করার পর আমেরিকা থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিয়োজিত আছেন।

www.pathagar.com

শ্রীনাথ রায়

ভাগ্যকুলের বিখ্যাত কুন্ড পরিবারে শ্রীনাথ রায়ের জন্ম। তিনি ১৮৪১ সালে পৃথিবীর আলো বাতাসে আসেন। একজন বিশিষ্ট ব্যাংকার ও জমিদার ছিলেন। শিক্ষা জীবন কাটে ঢাকা কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও ঢাকা জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। শ্রীনাথ রায় ঢাকার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের বহু জনহিতকর কাজে এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের আজীবন গভর্ণর ছিলেন। ভাগ্যকুলের এই জমিদার পূর্ববঙ্গের শিক্ষা এবং ব্যাংক গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র এই কৃতি সন্তানের বাড়ি বিক্রমপুর। জন্ম ১৮৫৭ সাল। গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর রুড়কী টমসন কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে মধ্যপ্রদেশের পূর্তবিভাগে প্রবেশ করেন। জব্বলপুরের জলের কল, মাগুলা রোড এবং ওয়ারোরা কোলিয়ারীর কাজ সম্পন্ন করে ১৮৮০ সালে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে বিভাগে স্থায়ীভাবে বদলি হন। এই সময়ে ওয়েনগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজের ভার পান এবং নাগপুর ছত্রিশগড় স্টেট রেলপথের বিস্তার সাধন করেন। ১৮৮৫ সালে জোড়হাটস্টেট রেলপথ নির্মাণ করেন। সমগ্র আসামের মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম নির্মিত রেলপথ। ১৮৮৭ সালে ত্রিহুত স্টেট রেলওয়ের দ্বারবঙ্গ-সীতামাড়ি শাখা লাইন নির্মাণ করেন এবং একজিকিউটিভ পদে উন্নীত হন। আসাম-বঙ্গ রেলপথের গৌহাটি শাখা, কলকাতা-মেদিনীপুর-কটক রেলের শাখা এবং ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা লাইন নির্মাণ করে এসব অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৮৮৮ সালের ২০শে জানুয়ারী বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ভট্টশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মুন্সীগঞ্জের নয়ানানন্দ গ্রামে মাতুলালয়ে তার জন্ম। নিজস্ব বাড়ি, পিতৃভিটা পাইকপাড়ায়। পিতা রোহিনীকান্ত ছিলেন পোষ্টমাস্টার। দুর্ভাগ্য তার, মাত্র চার বছর বয়সে পিতা মারা যান। তার মা কামিনী দেবী চার বছরের শিশুকে নিয়ে রোহিনীকান্তের ছোট ভাই অক্ষয়চন্দ্রের আশ্রয়ে যান। অক্ষয়চন্দ্রের স্নেহ, সতর্কতায়, অভিভাবকত্বে তিনি বাল্য কৈশোর অতিবাহিত করেন। ১৯০৫ সালে সোনারগাঁ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে রৌপ্য

www.pathagar.com

পদক লাভ করেন। এ সময় কাকার ব্যয় লাঘবের জন্য নলিনীকান্ত গল্প, প্রবন্ধ লিখে এবং ছাত্র পড়িয়ে অর্থ উপার্জনের পথ করে নেন। তাঁর লেখাপড়া ও সাহিত্যানুরাগ লক্ষ্য করে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল এফ সি টাটার কিছুদিন তাকে কুড়ি টাকা করে অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। এছাড়া অধ্যাপক রেমস বোথামও তাকে অর্থ সাহায্য দেন। প্রচন্ড দারিদ্র ও প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়ে তিনি ১৯১১ সালে এম এ তে তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। ১৯২২ সালে নলিনীকান্ত ভট্টশালী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফথ পুরস্কার এবং ১৯৩৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পান। এছাড়া তিনি কয়েকবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির পরীক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট প্রথা প্রবর্তিত হবার পর তাঁর বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য নলিনীকান্তের দু'টি প্রবন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান। এরমধ্যে 'হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তি তত্ত্ব' প্রবন্ধটির জন্য ডক্টরেট উপাধি দেয়া হয়। ডব্লিউ টমা, মসিয়েঁ ফুমে, লুইফিনো এবং দয়ারাম সাহানী প্রমুখ পরীক্ষক তার রচনার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ১৩১৫ সালের মাঘ সাংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'কেদার রায়' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই তার লেখক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালে ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর হিসেবে যোগ দেন। এর মধ্যে তিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখে সুনাম কুড়ান। ঢাকা যাদুঘর বলতে গেলে তার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বহু দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতেনও। ১৯১৪ সালে তার প্রথম গ্রন্থ 'হাসি ও অশ্রু' গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। তার 'নিঃসঙ্গ' ও 'পূর্বরাগ' গল্প দু'টি জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়। ১৯২২ সালে মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নলিপি বিদ্যায় এবং মৌর্য ও গুপ্ত বংশীয় ইতিহাসের গবেষণায় তার ভারত জোড়া খ্যাতি ছিল।

'ক্রোনোলজি অফ আর্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতানস্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্ত রচনা করে তিনি ১৯২২ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'গ্রিফথ পুরস্কার' পান।

নলিনীকান্ত রচিত 'বীর বিক্রম' নাটকটি ডায়মন্ড ও জুবলী থিয়েটারে অভিনীত হয়। তিনি প্রায় চল্লিশটির মতো পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন।

আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করলেও তিনি অন্য কোন উচ্চ বেতনের চাকরি গ্রহণ করেননি। তার সাধনা ছিল ঢাকা মিউজিয়াম গড়ে তোলা এবং সাহিত্য সাধনা। মাত্র একশ' টাকা বেতনে মিউজিয়ামে অধ্যক্ষের পদে ঢুকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাত্র আড়াইশ' টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তার সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪টি। তার মধ্যে 'কীর্তিবাস আদিখন্ড' উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

খান বাহাদুর মাহবুব উদ্দিন আহমেদ

মৌলভী মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ১৮৯৫ সনের পহেলা অক্টোবর টঙ্গিবাড়ী থানাধীন নগরকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ১৯১২ সনে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন, ১৯১৪ সনে ঢাকা কলেজ থেকে ১৪ তম স্থান অধিকার করে আই এ, ১৯১৬ সনে ইংরেজী বিষয়ে বি,এ অনার্স ও ১৯১৭ সনে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর ১৯১৯ সনে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় পাস করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হিসাবে সরকারী চাকুরী জীবন শুরু করেন। ১৯৩৮ সনে মালদাহর এস,ডি ও'থাকাকালীন খান সাহেব উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত বাংলার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের প্রথম সহকারী সচিব থাকাকালীন খাঁন বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীতে তিনি রেভিনিউ বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৮ সনে প্রতিষ্ঠিত মুন্সীগঞ্জ এসোসিয়েশনের (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৫ই মে ১৯৭২ সনে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।

সুধাংশু কুমার

সুধাংশ কুমারের বাড়ি সিরাজদিখান থানার মালপদিয়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস পি পি আর এস ডি এস সি উপাধি পান। তিনি প্রগতিশীল লেখক মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বড় ভাই। তিনি আবহাওয়া দপ্তরের উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

তিনি ভারত বর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহলের আবহাওয়া বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই প্রথম এবং একমাত্র বাঙালি যিনি এ পদ অলঙ্কৃত করেন।

মাহফুজুর রহমান

উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদ মাহফুজুর রহমান সিরাজদিখান থানার কুসুমপুর গ্রামে ১৯০৯ সালের ১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জসিমউদ্দিন ভূঁইয়া ছিলেন বেঙ্গল পুলিশের সাব ইনসপেক্টর।

জনাব মাহফুজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ ও '৩৫ সালে ইংরেজীতে যথাক্রমে ডিগ্রী (সম্মান) ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে বি,টি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৫৪ সালে আমেরিকার ক্রেফার্ল মেক্সিকো থেকে মৌলিক শিক্ষার ওপর ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৩৭ হতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ভারতের কৃষ্ণনগর সরকারী

www.pathagar.com

মহাবিদ্যালয় এবং ঢাকার সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও অন্যান্য সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন।

পরে তিনি জেলা উন্নয়ন অধিকর্তা হিসাবে এবং বেঙ্গল মৎস্য পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে কাজ করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার ফার্টিলাইজার কন্ট্রোলার এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ফার্টিলাইজার কন্ট্রোলার নিয়োজিত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি এ্যনিমি প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের পরিচালক (বাণিজ্যিক) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকাতে আজিমপুর এষ্টেট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭০ সালে তিনি ইছাপুরায় বিক্রমপুর কেবি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘ সময় কলেজটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রীন রোডের বাড়ি ছেড়ে সেখানেই অবস্থান করেন। ৮০ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহু সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেক সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ইংরেজী, স্পেনিশ, পার্শী, উর্দু, আরবী, ফরাসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। বার্ধক্য জনিত রোগে ১৯৯০ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু সাঈদ হাফিজ উল্লাহ্

আবু সাঈদ হাফিজ উল্লাহ্ শ্রীনগর থানার শম্সপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১২ সালের পহেলা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্সী হাবিব উল্লাহ্ একজন কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ইরান দেশের অধিবাসী ছিলেন।

তিনি মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯২৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ হতে আই, এস, সি ১৯৩০ সালে; কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হতে ১৯৩২ সালে বিএ অনার্স (ইকনমিক্স) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৩৪ সালে এম, এ ডিগ্রী নেন একই বিষয়ে।

তিনি ১৯৩৬ সালে বিভাগ পূর্ব ভারত সরকারের অডিট এ্যান্ড একাউন্ট্স বিভাগে প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান যিনি কলিকাতা এ,জি অফিসে একাউন্টস্ অফিসার হিসাবে চাকুরী নেন। দেশ বিভাগের পূর্বেই তিনি ভারতীয় অডিট এ্যান্ড একাউন্টস্ সার্ভিসে চাকুরী নেন। এবং একাউন্টস্ সার্ভিসে পদোন্নতির জন্য মনোনীত হন। কিন্তু ভারত বিভাগের কারণে বন্ধ রাখা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তিনি "Partition Council" এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে দক্ষতার পরিচয় দেন। ঢাকায় এসে নতুনভাবে "Accountant General Office" গড়ার কাজে তাঁর নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং সার্বিক অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় লিখা থাকবে। কলকাতার এ, জি অফিসে তিনি নিজে এবং পরবর্তীতে বাঙ্গালী মুসলমানেরা কাজে দক্ষতার পরিচয় দেন।

www.pathagar.com

দেশ বিভাগের পর তিনি পদোন্নতি লাভ করে ডেপুটি এ,জির পদ পান। ১৯৬০ সালে তিনি প্রথম বাঙ্গালী হিসেবে এ,জির পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং একই বছরে পুল ক্যাডারে এবং যুগ্ম সচিবের পদে উন্নীত হন। ১৯৬৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থায় অর্থ পরিচালকের পদে প্রেষণে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি জাপান সরকারের আমন্ত্রণে ঐ দেশের শিল্পোন্নয়নের ধারা, অর্থ সংস্থানের উৎস এবং শিল্প পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য সে দেশে যান এবং প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে ফিরে তা কাজে লাগান।

১৯৬৮ সালে তিনি বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে পাঁচ সদস্যের এক ডেলিগেট এর প্রধান হিসেবে গ্রেট বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপ সফর করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ঐ সব দেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়নের ধারা জেনে তার কতটা আমাদের দেশে গ্রহণ করা যায় তা সরকারকে অবহিত করা।

ইপিআইডিসির বিশাল সংস্থায় তিনি দীর্ঘ ছয় বছর প্রেষণে থেকে এর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তার সহকর্মীদের সহযোগিতায় এক একটি মজবুত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

১৯৬৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর অতি উচ্চ মানের কর্মনিষ্ঠা, প্রতিভা, দক্ষতা ও সার্বিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে "সিতারা-ই-খিদমত" পদক ও খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৭০ সালের পহেলা জানুয়ারী তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনে তিনি বেশ কটি জাতীয় কমিশনে সদস্য পদে কাজ করেন। তিনি "ধূসর দিগন্ত" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন ১৯৮৯ সালে যা সুধী সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তিনি একজন সজাগ দেশপ্রেমিক সমাজ সেবী। ছাত্র জীবনে তিনি একজন দক্ষ খেলোয়াড়ও ছিলেন।

আবুল বাসার খাঁ

আবুল বাসার খাঁ ১৯১৭ সালে ভাগ্যকুলের কামারগাঁওয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল হান্নান খাঁ (আদম খাঁ)। তিনি ভাগ্যকুল স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই কম এবং জগন্নাথ কলেজ থেকে বি কম পাশ করেন। ১৯৭২ সালে কর বিভাগের সিনিয়র অফিসার হিসাবে অবসর নিয়ে বর্তমানে তিনি একজন বিশিষ্ট আয়কর উপদেষ্টা।

সমগ্র বিক্রমপুরের মধ্যে তিনিই প্রথম সমগ্র পাকিস্তানে চাকুরীজীবীর (কর) সম্মানের অধিকারী। একজন সমাজসেবী হিসেবেও তিনি পরিচিত।

www.pathagar.com

কাজী কামাল আহমেদ

ব্যারিস্টার কাজী কামাল আহমেদ ১৯২৪ সালের ৩ মে টঙ্গী বাড়ি থানার ধামারণ কাজী বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলীগড়, এডিনবরা ও হল্যান্ড থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। উল্লেখ্য, তিনি পূর্ব জার্মানীতে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সালের ২৮ শে এপ্রিল তার মৃত্যু হয়।

মনসুরুল আমীন

বাংলাদেশের একজন অন্যতম সিনিয়র ব্যাংকার মনসুরুল আমীন ১৯২৪ সালে লৌহজংয়ের মাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে স্নাতক প্রাপ্ত হন। কলকাতার হাবিব ব্যাংকে নিযুক্ত হয়ে তিনি ব্যাংকিং সেবায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কর্মজীবনে রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মত গুরুত্বপূর্ণ পদ পর্যন্ত অগ্রসর হ'তে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে ১লা জানুয়ারী তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি ঢাকা ক্লাবের সভাপতি ছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া কর্মে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন।

ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ

ফয়েজউদ্দিন আহমেদ ১৯২৪ সালে লৌহজংয়ের কাজীর পাগলায় জন্মগ্রহন করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম, এ ডিগ্রী লাভের পর বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। পরে পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র এবং পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তা ছাড়া ১৯৮১ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অবসর গ্রহণের পর ১৯৮৫ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।

এ, কে, গঙ্গোপাধ্যায়

বিশিষ্ট ব্যাংকার এ, কে, গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীনগর থানার রুশদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএস পাস করেন। কিছুদিন ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করার পর তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে যোগ দেন। তিনিই একমাত্র বাঙালি যিনি ব্যাংকিং শাস্ত্রে মোজাফফর স্বর্ণপদক প্রাপ্তির দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর নেন।

www.pathagar.com

আবু নাযম হামিদুল্লাহ

আবু নাযম হামিদুল্লাহ শ্রীনগরের শমস্‌পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম হাবিবউল্লাহ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি নোট ছাপানো, মুদ্রা ব্যবস্থা ও ঋণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের মত জটিল বিষয়গুলো দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করেন। ১৯৭৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। জনাব হামিদুল্লাহ ১৯৪২ সালে মুন্সীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি কম পাশ করেন। ১৯৫০ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানে একজন অফিসার হিসেবে যোগ দেন। তিনি এ ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। পরে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে দেশে শিল্প প্রকল্প স্থাপনের লক্ষে এ ব্যাংক স্থাপন করেন। এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণে যেসব প্রকল্প স্থাপিত হয় সেসব প্রকল্পের জন্য তিনি কারিগরি ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করেন। তিনি এ ব্যাংকে থাকাকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ৩৫ টি জুট মিল, ৫৬টি টেক্সাইল মিল এবং শত শত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। তিনি ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক অল্প সময়ের মধ্যেই সাফল্য লাভ করে এবং সারা পাকিস্তানে ৬২টি শাখা স্থাপনে সক্ষম হয়। একজন কূটনীতিক হিসেবেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে কেনিয়া ও জাম্বিয়ায় দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮২ সালে দেশে ফিরে তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকটি উদ্যোক্তাদের দক্ষতার অভাবের কারণে চালু হতে পারছিল না। তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের মাত্র ১৭ দিনের মধ্যে ব্যাংকটি চালু করা সম্ভব হয়। তিনি সিটি ব্যাংক লিঃ কে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার করেন। তার নৈপুণ্য ও দক্ষতার কারণে এ ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ এক বছরের মধ্যে আড়াই কোটি টাকা থেকে ৯০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

কেন্দ্রীয়, বাণিজ্যিক ও শিল্প উন্নয়ন ব্যাংকিং সম্পর্কে তাঁর যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও প্রচুর জ্ঞান রয়েছে তা তার কর্মজীবনেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

তিনি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (ওয়াশিংটন)-এর একজন ফেলো। তিনি লণ্ডনের বার্কলেস ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকিংয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন। তিনি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৬৩ ও ১৯৬৭ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিল্পে অর্থ যোগান সম্পর্কিত সেমিনারে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭২, ৭৩ ও ৭৪ সালে আইএমএফ/আইবিআরডি'র বার্ষিক যৌথ সভায় যোগদান করেন। তিনি আইএমএফ/আইবিআরডির যৌথ কমিটির একজন বিকল্প সদস্য ছিলেন। আইডিপি'তে থাকাকালীন সময়ে তিনি বেসরকারী খাতে পাটকল স্থাপনের অনুমতি দান সংক্রান্ত 'অনুমতি দান কমিটির' একজন সদস্য ছিলেন। তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের ৪র্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা যাচাই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।

জনাব হামিদুল্লাহ ইউএনইপি এবং ইউএনসিএইচএস-এর স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আলবারাকা ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ এর এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিদেশে অবস্থান করছেন।

কে, জি, মহিউদ্দিন

কে. জি মহিউদ্দিন শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রামে ১৯২৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম এস এ খন্দকার। তিনি ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ পাস করেন এবং ১৯৫২ সালে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে খুলনা, রাজশাহী ও ঢাকা কোয়ার্টারে পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে এবং পরে স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর অবসর জীবন যাপন করছেন। অবসর জীবনে তিনি বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন ও মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির সাথে যুক্ত থেকে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

আমিনুর রহমান শামসুদ্দোহা

রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব আমিনুর রহমান শামসুদ্দোহা ১৯২৯ সালের ২৪শে জানুয়ারী পিতার কর্মস্থল মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের বাড়ি টঙ্গীবাড়ি থানার সরিষাবন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ের কর্মস্থল মুর্শিদাবাদ। পিতা এ,এইচ,এম শামসুদ্দোহা তদানীন্তন পাকিস্তানের কৃষি মন্ত্রী ছিলেন। দোহা স্কুল জীবনে কলকাতা এবং দার্জিলিং-এ লেখাপড়া করেন। তিনি কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে পদার্থ বিদ্যায়

www.pathagar.com

অনার্সসহ ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজী, ইকনমিক্স এবং গণিতসহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পদার্থ বিদ্যায় "গোয়ালিয়র" পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি এয়ার ট্রেনিং কোরের ক্যাডেট ছিলেন। ক্রীড়া জগতেও দোহা সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক্স টিমের ক্যাপ্টেন হিসাবে অনেক সুনাম অর্জন করেন এবং "এ্যাথলেটিক কালার" -এ ভূষিত হন। তিনি ১৯৪৬-৪৮ সালের বেঙ্গল অলিম্পিক গেমস্-এ অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক গেমস্ এর জন্য নির্বাচিত হন। তিনি টেনিস, ফুটবল এবং বক্সিং-এ ও পারদর্শী ছিলেন।

শিক্ষাগত কৃতিত্ব, খেলাধূলা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকেই তাঁকে প্রভূত সাহায্য করে। ১৯৫২ সালে তিনি কোহাট অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল থেকে "সেরা ক্যাডেট" হিসাবে সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি কোয়েটা স্টাফ কলেজ এবং ইংল্যাণ্ডের রয়াল মিলিটারি কলেজ অব টেকনলজি এণ্ড সায়েন্স থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। তিনি স্কুল অব আর্টিলারি এণ্ড গাইডেড মিসাইল, ওকালাহোমা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি "সি-ইন-সি-র সম্মান সূচক পদক" লাভ করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে সামরিক বাহিনীর মেজর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও কূটনৈতিক জগতে প্রবেশ করেন। সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং রাওয়ালপিণ্ডি ইসলামাবাদে দলকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৭০ সালে জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকেটে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রথম এবং একমাত্র বাঙালী প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১৯৬৯ সালে জনাব দোহা "ইন্টার উইং" নামে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার প্রতি সমর্থনের জন্য ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে তিনবার কারারুদ্ধ হন।

১৯৭১ সালের নভেম্বরে দোহা অন্যান্য আটক নেতাদের সাথে ঢাকা আগমন করেন এবং ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দোহা যুগোস্লাভিয়াতে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং একই সংগে রুমানিয়াতেও রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর

www.pathagar.com

রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন সময়ে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে সেখানে যান এবং প্রেসিডেন্ট টিটো বাংলাদেশ সফরে আসেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ইরানে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্টদূত নিযুক্ত হন এবং একই সঙ্গে তুরস্কেও রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি লণ্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার নিযুক্ত হন এবং ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে তিনি বাংলাদেশের নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্য ও বেতার উপদেষ্টা এবং ১৯৮২ সালের জুন মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন এরশাদ সরকারের রাজনৈতিক দল ঘোষণার পর প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করেন। তিনি দলের মহাসচিবের পদ গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান।

দোহা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সমস্ত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন, যথা, আলজির্য়াস (১৯৭৩), কলম্বো (১৯৭৬), হাভানা, ১৯৭৯ নয়াদিল্লীতে (১৯৮৩) যোগদান করেন। তিনি জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের হাভানা (১৯৮২), নিকোসিয়া (১৯৮২) এবং নিকারাগুয়া (১৯৮৩) বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকায় ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে নাইজারের নিয়ামেতে ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, ১৯৮২ সালের মে মাসে মরক্কোতে আল্-কুদ্স কমিটিতে যোগদান করেন এবং ১৯৮৩ সালে মারকাসে এবং ১৯৮৪ সালে রাবাতে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৮৪ সালে রাবাতে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন।

শামসুদ্দোহা কমনওয়েলথ রাষ্ট্র প্রধানদের বিভিন্ন সম্মেলনে, যথা, লুসাকা (১৯৭৯), মেলবোর্ণ (১৯৮১) নয়াদিল্লীতে (১৯৮৩) যোগদান করেন। তিনি কমনওয়েলথ কারিগরি সহযোগিতা হতবিলের চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৭৮ সালে কানাডা এবং ১৯৭৯ সালে মালটাতে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি উক্ত পদে ২ বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮২ সালে ফিজিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথের রাষ্ট্র প্রধানদের আঞ্চলিক অধিবেশনে যোগ দেন। তিনি জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদ এবং দ্বিতীয় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনেও যোগদান করেন।

জনাব দোহা "যুগোস্লাভ অর্ডার অব দি ফ্লাগ এণ্ড লেন্স" (প্রথম শ্রেণী) এবং দক্ষিণ কোরিয়া কূটনৈতিক সার্ভিস খেতাব "গোনাহা পদকে" ভূষিত হন।

শামসুদ্দোহা ইসলামিক উম্মাহর একতা ও সংহতির জন্য আন্তরিকভাবে বিভিন্ন ইসলামিক সংস্থার সাথে নিরলসভাবে কাজ করেন। তিনি ১৯৮১-৮২ সালে লণ্ডনে ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি এবং ১৯৭৮-৮১ সালে ট্রেজারার ছিলেন। তিনি ১৯৭৯

www.pathagar.com

সালে ইসলামিক ইনষ্টিটিউট অফ ডিফেন্স টেকনলজি ও ইসলামিক কাউন্সিল অফ ইউরোপ এর সদস্য ছিলেন।

১৯৮৮ সালের অক্টোবর থেকে দোহা নিজস্ব মুদ্রণালয় থেকে "ডায়ালগ" আন্তর্জাতিক ইংরেজী সাপ্তাহিক এবং "সংলাপ" বাংলা সাপ্তাহিক নিয়মিত প্রকাশ করেন। তার পত্নী বেগম ওয়াজিহা মোকাদ্দেম শামসুদ্দোহা লেবাননের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ত্রিপলীর সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত এবং "ডায়ালগ" সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যা। দোহার দুই পুত্র, শাহেদ শামসুদ্দোহা ও নাসির শামসুদ্দোহা আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং মহলে সুপরিচিত।

মোবারক আলী

শহীদ মেজর মোবারক আলীর বাড়ি বিক্রমপুর। পিতার নাম সাহেদ আলী শেখ। তিনি ১৯২৬ সালে লৌহজং থানার ঘড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অর্থাভাবে পড়াশুনা চালাতে না পারায় ১৯৪৩ সালেই সামরিক বিভাগে হাবিলদার পদে যোগদান করেন এবং পাঞ্জাব গমন করেন। ১৯৬৫ সালের ১০ ই সেপ্টেম্বর লাহোর রণাঙ্গনে ভারতীয় হামলার মুখে দেশ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। স্বাধীনতা রক্ষায় শহীদ মেজর মোবারক আলী নিজের রক্ত দিয়ে দেশপ্রেমের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে গেছেন।

আর খন্দকার

আর খন্দকার ১৯২৭ সালে লৌহজং থানার সাতবাড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম এ পাশ করেন। এক সময় ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে সাংবাদিকতা করেন দীর্ঘদিন।

সম্পাদক, ব্রিটিশ বার্তা ১৯৫৪-৫৭। পরে সেক্রেটারী বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন সংস্থা। তিনি প্রশাসনে আমেরিকা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

রুহুল কুদ্দুস

রুহুল কুদ্দুস মুন্সীগঞ্জের কোর্টগাও গ্রামে ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুন্সী জনাব আলী। তিনি মুন্সীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, কলকাতার সিটি কলেজ থেকে আইএ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি কম পাস করেন। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম পাস করেন। হরগঙ্গা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩-৭২ ওয়াপদার হিসাব ও অর্থবিষয়ক পরিচালক। ১৯৭৩ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থার অর্থ পরিচালক। ১৯৭৪-৭৭ সালে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের অর্থ উপদেষ্টা, ১৯৭৭-৮৩ জিয়া ফারটিলাইজার কোম্পানীতে প্রথমে অর্থ পরিচালক ও পরে ব্যবস্থাপনা

www.pathagar.com

পরিচালক। আইসিএমএ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেরও সদস্য বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন।

শামসুল হক

শামসুল হক ১৯৩০ সালের ২ মার্চ মালখানগরের নাটেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন এবং সিটি ব্যাংকেও কিছু সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর অবসর নেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি ও বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন।

রোমালউদ্দিন

কাজী রোমালউদ্দিন ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীনগর থানার ষোলঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,বি,এ ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর কানাডা থেকে সি এ ডিগ্রী অর্জন করে কানাডা ও আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন চার্টার একাউন্টস, কষ্ট একাউন্টস্ অডিটর এসোসিয়েশনের সদস্য। তিনি সরকারী ও বেসরকারী বহু সংস্থায় দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থার ফাইন্যান্স ডাইরেকটর থেকে বিআরটিতে যোগদান করার কিছু দিনের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের জন্ম লগ্ন থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি বিক্রমপুরে অনেক কল্যাণকর কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখে গেছেন।

বদরুদ্দীন আহমদ

ডঃ বদরুদ্দীন আহমদ ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী লৌহজং থানার মাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শামসুদ্দীন আহমদ। ১৯৫২ সালে তিনি আহ্সানউল্লাহ্ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্র প্রকৌশলে স্নাতক শ্রেণীতে ১ম শ্রেণীতে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। অতঃপর ১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলে পি,এইচ, ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ইন্সটিটিউট অব ফুয়েল লণ্ডন-এর সহযোগী সদস্য, ইন্সটিটিউট অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স লণ্ডনের স্নাতক সদস্য ও ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স ঢাকার সহযোগী সদস্য।

জনাব বদরুদ্দীন ১৯৬৬ সালে সাবেক ই,পি,আর,ডি, সি,তে যোগদান করেন। সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, বৃহৎ শিল্প বিভাগ, বি,আই,ডি,ডি ডাইরেক্টর (ইঞ্জিনিয়ার) বি,ই, এসি, ইত্যাদি পদে প্রায় পঁচিশ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

www.pathagar.com

তিনি ইউরোপীয় দেশসমুহে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্প পরিদর্শনে পাকিস্তান ও দূরপ্রাচ্য সফরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত "ইউনিডো"র মেশিন টুল্‌স সিম্পেজিয়ামেও অংশ নেন। ইস্পাত প্রকৌশল সংস্থার চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

জি এইচ হেদায়েত উল্লা ভূঁইয়া

জি এইচ হেদায়েত উল্লা ভূঁইয়া একজন বিশিষ্ট ব্যাংকার। ১৯৩৩ সালের ১লা মে রোবনা ঘরকান্দির গ্রামে তার জন্ম।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রিপন কলেজ থেকে বি,কম অনার্স পাস করেন। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬২ সাল একটানা এই দশ বছর ভারতস্থ হাইকমিশনে ডেপুটি হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

একজন সফল ব্যাংক অফিসার হিসেবেও তিনি অসাধারণ কর্মনৈপূণ্য দেখিয়েছেন। সেন্ট্রাল ব্যাংক লিমিটেড ইন্ডিয়া শাখায় তিনি ১৯৬২-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। যার প্রধান অফিস ছিল ঢাকায়।

ইউনাইটেড ব্যাংক রংপুরের প্রধান শাখায় তিনি ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। শান্তিনগর জনতা ব্যাংক শাখায় তিনি দীর্ঘ আট বছর সেকেন্ড অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া ইমামগঞ্জ করপোরেট ব্রাঞ্জ ঢাকা এখানে তিনি পরপর দুইবার ম্যানেজার হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি চিটাগাং লালদিঘী ইস্ট করপোরেট ব্রাঞ্চের ম্যানেজার কন্ট্রোলার, এজিএম ছিলেন।

১৯৮৩ সালে ক্রেডিট ডিভিশন ঢাকা প্রধান অফিসের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ইমামগঞ্জ ঢাকা সিটি ব্যাংক শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই ব্যাংকেরই ইমামগঞ্জ শাখার প্রধান অফিসার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজার ছিলেন ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৮৯ সালে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। ১৯৯৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

নূরুল মোমেন খান মিহির

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নূরুল মোমেন খান শ্রীনগর থানার ষোলঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন। Fulbright

www.pathagar.com

and Foreign Student Leadership Project বৃত্তি নিয়ে ১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীর অন্তর্গত রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন ও শ্রম অর্থনীতির উপর থিসিস্ দাখিল করেন।

শিক্ষা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৮ সালে গবেষণা সহকারী হিসেবে চাকুরী গ্রহণ করেন; পরে জাতিসংঘের নিউইয়র্ক সদর দপ্তর Interne Programme for College Students "এর আওতায় শিক্ষা লাভের জন্য মনোনীত হন ও কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সমাপণ করেন এবং ১৯৫৮ সালের ১১ জুলাই হতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘের Bureau of Economics Affairs-Fr Department of Economics and Social Affairs Division -এ কর্ম সম্পাদন করেন।

১৯৬০ সালের সি,এস,এস পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের অধীনে পুলিশ সার্ভিসে (P.S.P) যোগদান এবং সিলেটে এ,এস,পি হিসেবে, পটুয়াখালীতে এস,ডি,পি, ও হিসেবে, ডি,আই,জি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ)-এর স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে ও পরে সেন্ট্রাল ইনটিলিজেন্স ব্যুরোর করাচী ও পিণ্ডি অফিসে উপ সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরে পুলিশ সুপার হিসেবে সার্থকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফরিদপুরে পুলিশ সুপার থাকাকালীন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে নেতৃত্ব প্রদান করেন ও পরে স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় পাকবাহিনীর কাছে আটকা পড়েন।

স্বাধীনতার পর ডি,আই,জি, পদে পদোন্নতি লাভ ও ১৯-১২-৭১ থেকে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডি,আই,জি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স (এনএসআই) সৃষ্টির পর যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদায় বৈদেশিক বিষয়াবলীর পরিচালকের কর্মভার গ্রহণ ও প্রধানমন্ত্রীর সরকারী ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে যুক্তরাজ্য, ভারত, সুইজারল্যাণ্ড ও রাশিয়া সফর করেন। ১৯৭৩-'৭৬ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাই কমিশনে কাউন্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৬ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর যুগ্মসচিবের পদমর্যাদায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ঘোষিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সমীক্ষণের জন্য ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর করেন। উক্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় US-AID- এর বৃত্তি নিয়ে ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি,সি,তে অবস্থিত Centre for Population Activities এ

www.pathagar.com

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ব্যবস্থাপনায় উদ্ভুত সমস্যাদির উপর শিক্ষা লাভের জন্য গমন করেন।

১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও আভ্যন্তরীন নৌ চলাচল মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর চালনা পোর্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মৃত্যুর পূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন।

আবদুর রকিব খন্দকার

আবদুর রকিব খন্দকার ১৯৩৩ সালে সিরাজদিখান থানার ঘনশ্যামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং এম,এ, সমাপ্ত করার পর তিনি কিছুকাল নটরডেম কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদে কৃতিত্ব দেখান। তিনি বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল-এর দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া জনাব খন্দকার বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত।

এ, কে, এম আমিনুল হক

এ, কে, এম আমিনুল হক ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী লৌহজং থানার নওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম চৌধুরী জহুরুল হক।

জনাব আমিনুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাস করেন। তারপর হরগঙ্গা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ইকোনোমিক পুল এ যোগ দেন। পি,এস, এস পাস করার পর তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আয়কর আধিকরিক নিযুক্ত হন। ১৯৬৭-৭০ সালে তিনি কুয়েতে পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য সচিব ছিলেন। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কন্ট্রোলার অফ ভ্যালুয়েশন পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে ফিরে প্রথমে টি,সি,বি'র পরিচালক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থমন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি বিদেশে বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করে থাকেন। পরে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করে অবসর নেন।

মনযূর-উল করীম

বহুবিধ প্রতিভা ও গুণাবলীর সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী জনাব মনযূর-উল করীম শ্রীনগর থানার বারইখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী কর্মকর্তা

www.pathagar.com

হিসাবে সীমাহীন ব্যস্ততা সত্বেও সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ সেবা অঙ্গনে তাঁর অবদানের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সর্বত্রই তিনি স্বীয় কর্ম দ্বারা উল্লেখযোগ্য প্রশংসা অর্জন করেছেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন বিমানের এমডি পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তথ্য ও বেতার সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। পরে স্বরাষ্ট্র সচিব হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ ইউনিসেফের উপদেষ্টা। স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। এর স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৮০ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ স্কাউটের প্রধান জাতীয় কমিশনারের পদ অলংকৃত করে আসছেন। ১৯৮২ সালে প্রথম এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের স্কাউট কমিটির সদস্য ও পরবর্তীতে একই বছর সভাপতি আসন লাভের মধ্যে স্কাউট আন্দোলন জনাব করীমের অবদানকে অধিকতর সৌরভমন্ডিত করেছে। জনাব করীমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউট কর্তৃক কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী সৃষ্টি স্কাউট আন্দোলনে সূচনা করেছে এক নব দিগন্ত। এ সকল কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ বাংলাদেশ-অষ্ট্রেলিয়া শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং বাংলাদেশ-কোরিয়া স্কাউট আয়োজিত জনস্বাস্থ্য (সেনিটেশন) কর্মসূচী। জনাব করীম সর্বোচ্চ স্কাউট পদক সিলভার টাইগার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন। বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জেনেভা স্কাউট কমিটি তাঁকে স্কাউটের সর্বোচ্চ বিশ্ব খেতাব ব্রোঞ্জ উলফ এ ভূষিত করেছে। তাঁর সূদক্ষ নেতৃত্বে চরিত্র গঠনের আন্দোলন হিসাবে স্কাউট প্রতিষ্ঠান জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মৃতি পরিষদ স্কাউট আন্দোলনে জনাব মনযূর-উল করীমকে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শিল্পাচার্য স্বর্ণপদক '৯৩ প্রদান করেছে।

সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভা হিসাবে তিনি সমভাবে পরিচিত। তিনি ইমরান নূর ছদ্মনামে লিখেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন নামে তাঁর বিশটি প্রকাশনা আত্মপ্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আজকের শিশুদের জন্য ছড়া বই।

এছাড়া তিনি একজন ক্রীড়া সংগঠকও। বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক মেধা তাঁকে দান করেছে গৌরবজনক আসন। তিনি ১৯৭২ হতে ১০ বছর বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৩-৮৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশ চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভাপতি। একজন কৃতি হকি খেলোয়াড় হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালমনাই এসোসিয়েশন তাঁকে প্রদান করেছে হকি এওয়ার্ড।

www.pathagar.com

তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, রাশিয়া, গ্রীস, ভারত, তুরস্ক সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।

মীর শওকত আলী

মীর শওকত আলী একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ১৯৩৫ সালে শ্রীনগর থানাধীন দামলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত সচিব ছিলেন। স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৫৫ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হন। বর্তমানে তিনি দামলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লাহ্ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির সভাপতি।

মাহবুবুল আলম

মাহবুবুল আলম ১৯৩৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি লন্ডনের কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন থেকে সাংবাদিকতায় ফেলোশীপ লাভ করেন। ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাসচিব (বৈদেশিক প্রচার) নিযুক্ত ছিলেন। পরে ভূটানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করার পর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেস এ্যাটাসি'র দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।

নিজাম উল ইসলাম

বিশিষ্ট ব্যাংকার নিজাম উল ইসলাম ১৯৩৬ সালের ১লা অক্টোবর লৌহজং থানার মাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নূরুল ইসলাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। অতপর অফিসার হিসাবে তদানীন্তন হাবিব ব্যাংকে যোগ দেন। এরপর বিভিন্ন ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কাজ করেন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত হন এবং অগ্রণী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে জনতা ব্যাংকে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ সালে ডি এম ডি হিসেবে অবসর নেন।

www.pathagar.com

নুরুলিসলাম শামস্

নুরুলিসলাম শামস্ শ্রীনগর থানার কামারগাঁও গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শামসউদ্দিন আহমদ খান। বিশেষ প্রতিভার অধিকারী শামস্ মাত্র ২১ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একত্রে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে বি, এস, সি (ডবল) পাশ করেন। ১৯৬০ সালে পদার্থ বিজ্ঞান এবং ১৯৬১ সালে গণিত শাস্ত্রে এম,এ,ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র ২৪ বছর বয়সে একজন সি এস পি হয়ে জামালপুরের এস ডি ও হিসেবে নিযুক্ত হন।

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও বিজ্ঞান চর্চার চেয়ে সাহিত্য চর্চায় মনোযোগ ছিল বেশী। তিনি ছড়া, গল্প, ও কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতেন।

১৯৭১ সালে যখন হানাদার বাহিনীর আক্রমণে সমস্ত দেশ ক্ষত বিক্ষত তিনি তখন খুলনার ডিসি। তিনি এবং সে সময় বিক্রমপুরের আরেক কৃতি সন্তান খুলনায় কর্মরত এসপি আব্দুর রকিব খন্দকার লঞ্চযোগে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন। পথে বরিশালে নামলে তারা ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে বন্দী হন এবং বরিশালের পুলিশ লাইনের খোলা ময়দানে বিচারে তাদের গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করার ঘোষণা করা হয়। কিছু বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা খুলনা থেকে আগত তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের বিবৃতি এবং নুরুল ইসলামের লেখা মুক্তি সংগ্রামের ওপর রচিত কবিতা আবিস্কারের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে তাদের হত্যার নির্দেশ তুলে নেয়া হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে ফিরে এসে তিনি দেশের সংগ্রামী কর্মী হয়ে বেঁচে থাকলেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্বে দেশ সমাজ উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্কাউট আন্দোলন পুরোধায় যে ব্যক্তিত্বের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে তিনি হলেন নুরুল ইসলাম শামস্। দেশ বিদেশের স্কাউট আন্দোলনে, উন্নয়নে তার অবদান ও কৃতিত্ব অনেক। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের চীফ ন্যাশনাল কমিশনার ছিলেন। তিনি চাকুরী জীবন শুরু করেন এস ডি ও হিসেবে। এস ডি ও থেকে ডিজি ইন্ডাষ্ট্রিজ, পরবর্তীকালে সরকারের যুগ্ম সচিব থাকাকালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৯৮১ সালের ২৮ এপ্রিল তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ নূরুল ইসলাম শামস দেশের মানুষের কাছে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার কর্ম প্রতিভার জন্য।

মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম

প্রাক্তন নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মুহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম এনসিসি, বিএন ১৯৪০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর লৌহজং থানার মাওয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম মমিনুল ইসলাম ছিলেন একজন সরকারী চাকুরিজীবী।

www.pathagar.com

জনাব ইসলাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীর এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। একজন সুযোগ্য এবং সুদক্ষ সাবমেরিনার হিসেবে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবমেরিন গাজী এবং হাঙ্গরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফ্রান্স এবং তুরস্কের উচ্চতর সাবমেরিন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যাণ্ডের নিউ পোর্টস্থ নেভাল কমাণ্ড কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন অর্জনকারী প্রথম বাংলাদেশী অফিসার। এছাড়াও তিনি যুক্তরাজ্য থেকে মাস্টার মেরিনার সার্টিফিকেট লাভ করেন।

রিয়ার এডমিরাল ইসলাম স্বদেশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ, ঘাঁটি এবং নৌসদর দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ কমাণ্ড ও স্টাফ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে নৌ অপারেশনস, নৌ পরিকল্পনা ও নৌ গোয়েন্দা পরিদপ্তরের পরিচালকের দায়িত্ব উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট আলী হায়দার, আবু বকর ও ওমর ফারুকের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন। তিনি তিন বছর কমোডর কমাণ্ডিং বিএন ফ্লোটিলা এবং দু'বছর কমোডর কমাণ্ডিং চট্টগ্রাম-এর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী থেকে নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারী নৌপ্রধান (অপারেশনস)-এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি নৌসদরে প্রায় দু'বছর সহকারী নৌ প্রধান (মেটেরিয়েলস)-এর দায়িত্বও পালন করেন। ১৮ বছরেরও অধিক সময় তাঁর অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ সী সার্ভিসের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এ সময়ে তিনি দেশে ও বিদেশে অনেক নৌমহড়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রিয়ার এডমিরাল ইসলাম ১৯৮৩ সালে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মায়নমার (বার্মা) সফর করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ১৯৮৫ সালে তিনি জাতিসংঘের চল্লিশতম সাধারণ পরিষেদর অধিবেশনে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৮৮ সালে পাকিস্তান সফরকারী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮৯ সালে প্রথমবারের মত সার্কভুক্ত দেশ ভারত, পাকিস্তান ও মালদ্বীপে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী জাহাজের পতাকা প্রদর্শক শুভেচ্ছা সফরে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি দূরপ্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজের শুভেচ্ছা সফরে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিসর, ইতালী, তুরস্ক, সেনেগাল, মাদাগাস্কার, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, জাপান, সুইজারল্যাণ্ড, এ্যাঙ্গোলা এবং যুগোশ্লাভিয়া সফর করেন।

www.pathagar.com

বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলায় অনুরাগী রিয়ার এডমিরাল ইসলাম এ্যাথলেটিক্স, টেনিস, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় বিশেষভাবে উৎসাহী। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনী ও পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর একজন কৃতি ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে ব্লু প্রাপ্ত।

মুঃ মাহমুদুল হক

মুঃ মাহমুদুল হক শ্রীনগর থানার বাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি সোনালী ব্যাংকে যোগ দেন। সোনালী ব্যাংকের রিজিওনাল ম্যানেজার ছিলেন। পরে জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। জি এম-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার পর ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি রোটারীসহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত আছেন।

খায়রুল আলম খান

বিএফডিসির ডাইরেক্টর খায়রুল আলম খান ১৯৪১ সালের ১৪ নভেম্বর শ্রীনগর থানার পশ্চিম মুন্সিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব কালু খান। তিনি দেশে শিক্ষালাভের পর যুগোশ্লাভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (মেরিন) ও এমওটি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি এ সময় যুগোশ্লাভ এবং জার্মান ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি তদানীন্তন ইপিআইডিসিতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদান করেন। কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বিআইডিসির ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ সরকারের নৌ ও প্রকৌশল অধিকর্তা, বিএফডিসি ফিশ হারবার, চট্টগ্রামে প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং বিএফডিসি ঢাকায় ডিভিশন চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক সময় তিনি যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটোর দোভাষী রূপে কাজ করেছেন।

মোহাম্মদ মাহে আলম

মোহাম্মদ মাহে আলম ১৯৪১ সালে শ্রীনগর থানার রাঢ়িখাল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম খোরশেদ আলম। তিনি প্রথমে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু (জেসি) হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ও এম,এ, কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। ১৯৬২ সালে এম,এ পাশ করার পর ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজীর প্রফেসর হিসেবে বিভিন্ন সময় জগন্নাথ কলেজ, সলিমুল্লাহ কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৬ সালে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে যোগদান করেন এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। রংপুরের ডিসি নিযুক্ত হওয়ার পর উন্নয়নমূলক অনেক কাজ তাঁর হাত দিয়ে সম্পন্ন হয়।

সরকারী কাজে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবেও দীর্ঘকাল কাজ করেন। এর মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও রাজউক উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালের দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ

এম.এ. ওয়াদুদের জন্ম ১৯৪১ সালের ৩১শে আক্টোবর লৌহজং থানার বহর গ্রামে। পিতা মৃত মৌঃ বোরহান উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ঐতিহ্যবাহী কলমা স্কুল, খুলনার কমার্স কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এগ্রি বিজিনেসে এম, এস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দেশ বিদেশের অনেক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলাইজার ডেভলপমেন্ট সেন্টার থেকে "ফার্টিলাইজার মার্কেটিং প্রোগ্রাম" এর উপর এবং রেলওয়ে একাউন্টস্ একাডেমি ইকোনমিক্স" এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় ও জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতির উপরও বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেণ।

অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত পাক্ষিক ম্যাগাজিনের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। বিশেষতঃ ইকোনমিক এ্যন্ড বিজিনেস রিভিউ ম্যাগাজিনের সম্পাদক মন্ডলীর তিনি একজন সদস্য ছিলেন। সমাজ সেবামূলক কাজেও এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এবং সেবামূলক কাজের জন্য তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক পান। ব্যক্তি জীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব মরহুম জনাব এ,টি,এম, সৈয়দ হোসেনর জামাতা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাগ্নী জামাই। বাংলাদেশ কৃষ্টি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সদস্য পরিচালক (অর্থ) এর দায়িত্বে তিনি দক্ষতার পরিচয় রাখেন।

গিয়াসউদ্দিন পাঠান

গিয়াসউদ্দিন পাঠানের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ। জন্ম ১৯৪১ সাল। ১৯৫৫ এ মুন্সীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে মেট্রিক ও হরগঙ্গা থেকে আইএ পাস করেন। কর্মজীবনে মুন্সীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতার পর ওয়াপদায় কিছুদিন চাকরি করেন। পরে সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) চাকরি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৎস্য ও

www.pathagar.com

পশুপালন বিভাগে সচিবের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

এ এস আশরাফ উদ্দিন আহমদ

এ এস আশরাফ উদ্দিন আহমদ ১৯৪১ সালে বিক্রমপুরের সিরাজদিখান থানাধীন খিলগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল, এল, বি ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব আহমদ ১৯৬৫ সালে তদানিন্তন হাবিব ব্যাংক লিঃ এ প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি করাচিস্থ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ব্যাংকিং-এর উপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ৩১ বছর ব্যাংকিং জীবনে তিনি শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক প্রধান, অনুষদ সদস্য এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অগ্রণী ব্যাংক এর মহাব্যবস্থাপক পদ তার কর্ম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

চাকুরী জীবনে তিনি দেশ ও বিদেশের নানা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ঃ বি আই বি এম কর্তৃক পরিচালিত যথাক্রমে ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স কোর্স, প্রজেক্ট এপ্রাইজাল ও ফিজিবিলিটি স্টাডি কোর্স, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজম্যান্ট এন্ড পলিসি বিষয়ক সেমিনার, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এগ্রিকালচার প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং কোর্স, থিএমডিসি কর্তৃক ট্রানজেকশনাল এনালাইসেস কোর্স এবং জাতীসংঘের মহিলা উন্নয়ন তহবিল (UNFEM) ও বিএমডিসির যৌথ উদ্যোগে "Gender Sensitization" বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ।

জনাব আহমদ ১৯৮১ সালে বিশ্বব্যাংক আয়োজিত ভারতের পুনায় কলেজ অব এগ্রিকালচারাল ব্যাংকিং এ উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ইউএনডিপি/আইএলও আয়োজিত বিভিন্ন কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ সমূহে শিক্ষা সফরের জন্য ভারত ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৯ সালে শ্রীলংকার ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব শ্রীলংকা কর্তৃক আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন।

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংক ছাড়াও একজন প্রশিক্ষক (অতিথি বক্তা) হিসেবে তিনি বি আই বি এম, বিসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও মাইডাস এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ১৯৯২ সালে বাংলাদেশস্থ বিশ্বব্যাংক মিশন কর্তৃক আয়োজিত 'ইনফরমাল ফাইনান্সিং অব স্মল এন্টারপ্রাইজেস' শীর্ষক ওয়ার্কশপে অন্যতম রিসোর্স

www.pathagar.com

পার্সোন্স হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব আহমদ ১৯৯৫ সালে "ইফাদ" অর্থায়িত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। জনাব আহমদ দেশের ব্যাংকিং ও আর্থ সামাজিক বিষয়ের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। একজন সাহিত্যসেবী হিসেবেও তিনি অবদান রাখছেন। তার লেখা ছোট গল্প ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পায়। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও সংশ্লিষ্ট। তিনি মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির আজীবন সদস্য, কায়কোবাদ সাংস্কৃতিক পরিষদের উপদেষ্টা, কায়কোবাদ স্মৃতি ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস এলোমনাই এসোসিয়েশনের সদস্য, বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতির (বিএসটিডি) সদস্য।

এছাড়া তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত "মহাকবি কায়কোবাদ" এর উপর বিশেষ অনুষ্ঠান মালায় অংশগ্রহণ করেন। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৫ সালে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক লাভ করেন।

শহিদুল হক

১৯৪২ সালের ১৯ আগস্ট মুন্সীগঞ্জের কাজী কসবা গ্রামে শহিদুল হক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ জহুরুল হক। বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হন। তিনি বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক থেকে মুন্সীগঞ্জ জেলার বহু মেধাবী ছাত্রকে সংস্থা থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়ে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করে দিয়েছেন। এছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তার সহযোগিতা ছাড়াও এলাকার উন্নয়নে তার অবদান অপরিসীম।

মীর মোজাম্মেল আলী

মীর মোজাম্মেল আলী একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ১৯৪৩ সালের ১৮ আগস্ট শ্রীনগর থানার দামলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত মীর মকবুল আলী।

মীর মোজাম্মেল আলী পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বহু সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। দীর্ঘদিন তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বিদ্যালয় ও কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা টিএন্ডটি কলেজ সহ আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সাথে জড়িত। এছাড়া তিনি এলাকার বহু বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে প্রশংসণীয় ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি (বেনবেইজ) এর উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

www.pathagar.com

নাসিরউদ্দিন আহমেদ

ব্যাংকিং জগতের আরেক নক্ষত্রের নাম নাসির উদ্দিন আহমেদ। ১৯৪৪ সালে বিক্রমপুরের শমসপুর গ্রামে তার জন্ম। তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের কমার্স ব্যাংক লিঃ-এ তার কর্মজীবন শুরু হয়। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে জনাব আহমেদ বিভিন্ন সময়ে উত্তরা ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং সিটি ব্যাংকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে বর্তমান কর্মস্থল আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সৌদি যৌথ মুলধনে প্রতিষ্ঠিত আল বারাকা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান হিসাবে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করে যান।

১৯৭০ সালে সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত ৬ মাসব্যাপী ইন্টানন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কোর্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ২২টি আফ্রো-এশিয়ান দেশের ব্যাংক কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, পাকিস্তান থেকে তিনিই একমাত্র এই কোর্সে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত "বাংলাদেশের সার ব্যবসা পরিচালনা এবং বাণিজ্যিক ঋণ প্রদান" সংক্রান্ত একমাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যান্ডে প্রশিক্ষণ নেন। জনাব আহমেদ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, সিটি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট-এর একজন অতিথি বক্তা। তিনি বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন ও বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বৃটেন, মিসর, সৌদি আরব, পাকিস্তান, দুবাই, কুয়েত, আবুধাবী ও বাহরাইনসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

জনাব আহমেদ তাঁর কর্মপ্রবাহ কেবল মাত্র ব্যাংকিং পেশাতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত বৈদেশিক লেনদেন ও বাণিজ্যের উপর তাঁর প্রথম বই A Hand Book of Foreign Exchange বইটি দেশ-বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

ব্যাংকিং পেশায় অবদানের জন্য ১৯৮২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ব্যাংক সমিতি তাঁকে "ফেলোশীপ" প্রদান করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্বর্ণপদক লাভ করেন।

এম, এ, সাইম

এম. এ. সাইমের বাড়ি সিরাজদিখানের মুলাবদিয়া। পিতা বজলুর রহমান। ভূগোলে এম, এস, সি; ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল টেকনোলজী, জিডি আর জাপান এ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বর্তমানে পরিচালক বস্ত্র পরিদপ্তর। তিনি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। টেক্সটাইল বিষয়ক পত্রিকা টেক্সটাইল এর সম্পাদকও তিনি।

আব্দুল লতিফ

এডঃ আব্দুল লতিফ ১৯৪৫ সালের ৩০ জানুয়ারী শ্রীনগর থানার কোলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আলহাজ্ব ইমানউদ্দিন।

জনাব আব্দুল লতিফ ১৯৬০ সনে ঐতিহ্যবাহী রাঢ়ীখাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস, এস, সি, ১৯৬২ সনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৬৪ সনে বি. কম এবং ঢাকা সেন্ট্রাল ল'কলেজ থেকে ১৯৬৮ সনে প্রথম ব্যাচে এল. এল. বি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি পেশা হিসেবে আইন ব্যবসায় নিজেকে না জড়িয়ে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করে বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের পদে কর্মরত আছেন। একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সহকর্মীসহ সকলের কাছে পরিচিত। ছাত্র জীবনে তিনি রাজনীতি এবং সংস্কৃতি অঙ্গনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী কলেজে অধ্যয়ন সময়ে তিনি কলেজ Constitution এর সদস্য ছিলেন। স্থানীয় সংগঠন কোলাপাড়া ইয়ং ক্লাব পরিচালিত মহুয়া ও টিপু সুলতান নাটকে অভিনয় করেন। ঢাকা কোর্টের কর্মচারী পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্টের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য ১৯৬২ সালে এক শিক্ষা সফরে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান সফর করেন।

আবদুল হালীম খন্দকার

প্রকৌশলী আবদুল হালীম খন্দকার ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী শ্রীনগর থানাধীন মদনখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম খন্দকার আবদুল বারী ও মায়ের নাম আরজান নেসা।

জনাব আবদুল হালীম ১৯৬১ সালে চুড়াইন তারিনী বামা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন, ১৯৬৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ২য় বিভাগে আই, এস, সি ও ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা থেকে ২য় বিভাগে বি, এস, সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবে কর্মরত আছেন।

ড ঃ মোঃ আব্দুল আহাদ মিয়া

গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইন্‌ষ্টিটিউটের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি কৃষিবিদ ডঃ মরহুম মোঃ আব্দুল আহাদ মিয়া ১৯৪৭সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কুসুমপুর গ্রামে

www.pathagar.com

এক সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ.জি, ডিগ্রী গ্রহনের পর ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইন্‌ষ্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এস.জি এজি এবং ১৯৮৬ সালে ভারতের বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এস.ডি. ডিগ্রী অর্জন করনে।

দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ আহাদ মিয়া বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীলজাত এবং এগুলোর উৎপাদন কলাকৌশলের উপর অসংখ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যা বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ ভুমিকা রেখেছে। সদালাপী এবং পরপোকারী ডঃ আহাদ মিয়া চাকুরি জীবন ছাড়াও বিভিন্নি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদ গাজীপুর জেলা শাখার প্রথম নির্বাচিত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ এনামুল হক

মোঃ এনামুল হক ১৯৫২ সালে ১ জানুয়ারী মুন্সীগঞ্জের চিতৈল্লা বাজারের মোলার চরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুল গফুর সরকার। তিনি সয়েল সাইন্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তিনি অগ্রণী ব্যাংকে যোগদান করেন। এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে তিনি শুধু একজন দায়িত্বশীল ব্যাংকার নন একজন সংগঠকও। দীর্ঘ সময় অগ্রণী ব্যাংক অফিসার সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ব্যাংক অফিসার্স ফেডারেশন বাংলাদেশেরও সভাপতি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মেম্বার।

মইনুল হোসেন

জাতীয় স্মৃতিসৌধের নক্‌শাকার, স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন ১৯৫২ সালের ২রা মে টংগীবাড়ী থানার দামপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম অধ্যাপক সৈয়দ মুজিবুল হক, দাদার নাম কবি সৈয়দ এমদাদ আলী এবং নানার নাম কবি গোলাম মোস্তফা। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইউনিভারসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যন্ড টেকনোলজি থেকে মইনুল হোসেন কৃতিত্বের সাথে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে মইনুল হোসেন স্থাপত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পন্ন করেন।

কাওরান বাজারস্থ আই, আর, ডি,পি-এর প্রস্তাবিত ভবনের নকশা নির্মাণ ও ঢাকা মিউজিয়ামের প্রাথমিক নকশা অংকন তারই কৃতিত্ব। আশুগঞ্জের ফারটিলাইজার এ্যন্ড

www.pathagar.com

কেমিক্যাল করর্পোরেশন লিমিটেড ভবনের নকশা তৈরীর কাজে সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেন। কালিয়াকৈরে নির্মিত বাংলাদেশ -থাই এলুমোনিয়াম কোম্পানী লিঃ ভবনের নকশা অংকন, চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ১৮০০ সিট বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, সাতক্ষীরার টেলিভিশন কেন্দ্রের ভবনের নকশা নির্মাণ, কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন উইং এর অধীনে খাদ্য গুদাম তৈরী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের প্রশাসন ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানার ভবন নির্মাণ, বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী নির্মাণ, উত্তরা মডেল টাউনের আবাসিক এলাকাটির নকশা, এটমিক এনার্জি কমিশনের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার টেকনোলজি অডিটরিয়ামের নকশা তার কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। উপরোক্ত কর্মকান্ড ছাড়াও আবুধাবীতে তিনি একটি উচ্চমানের হাউজিং এর নকশা তৈরী করেন। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৭ সালে সৈয়দ মইনুল হোসেনকে একুশে পদক প্রদান করেন। এছাড়া সৈয়দ মইনুল হোসেনকে বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন তার কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন স্বর্ণ পদক'৯২ দিয়ে সম্মানিত করেন।

এ. কে. এম. আক্তারুজ্জামান

এ. কে.এম. আক্তারুজ্জামান বিক্রমপুরের সিরাজদিখান থানাধীন মধ্যপাড়া গ্রামে ১৯৫৩ সালের ৩মার্চ জন্ম গ্রহন করেন। পিতা মরহুম নুরুল হুদা।

জনাব জামান ১৯৬৮ সালে ইছাপুরা হাইস্কুল হতে মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি. এবং ১৯৭০সালে ঢাকা কলেজ হতে এইচ.এস.সি. পাশ করেন। তিনি ১৯৭৩সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ (অনার্স) এবং ৭৪সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.এ .ডিগ্রী অর্জন করেন ।

জনাব আক্তরুজ্জামান স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্রাবস্থায় ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ঢাকার আসাদ গেটে ছাত্র নেতা আসাদ হত্যার প্রতিবাদ মিছিলে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনে তিনি বিশিস্ট রাজনীতিবিদ কফিল উদ্দিন চৌধুরী এম.সি.এর পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রমে ভূমিকা রাখেন। শিক্ষা জীবন শেষে ১৯৭৮ সালে প্রফেশনারী অফিসার হিসাবে সোনালী ব্যাংকে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি একই ব্যাংকের সদরঘাটস্থ প্রিন্সিপাল অফিসে সহকারী মহাব্যস্থাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

জনাব আক্তারুজ্জামান একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। '৭১এর আগষ্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা

www.pathagar.com

চালিয়ে যান। এর পর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহনের উদ্যেশে ২১আগষ্ট প্রায় ২৪ জন সঙ্গীসহ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেন। আগরতলা পৌঁছে কংগ্রেস ভবনে ৭/৮ দিন অবস্থান করেন। এসময়ে আগরতলাস্থ ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বাসস্থানে তার নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল কোর গঠনের আলোচনা হয় কিন্তু তিনি কোলকাতায় চলে যাওয়ায় এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হওয়া যায়নি। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৫ দিন হাপানিয়া ইয়থ ক্যাম্পে অবস্থানের পর সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের উদ্দ্যেশে চড়িলাম ট্রেনিং কেম্পে যান। সেখানে ২১ সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত থ্রী-নট্-থ্রী, ষ্টেনগান ও গ্রেনেট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন।

ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে ৭ ডিসেম্বর তিনি ২৪ জনসহ মোট ৫০/৬০ জনের মত একটি মুক্তিযোদ্ধা দল সশস্ত্র অবস্থায় সোনামুড়া বর্ডার হয়ে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করে কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে পাকসেনাদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সে এলাকায় অবস্থানকারী অন্যান্য কিছু মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপও অংশ নেয়। যুদ্ধে ১৯জন পাকসেনা নিহত ও প্রচুর অস্ত্রসহ গোলাবারুদ উদ্ধার হয় এবং রাজাকাররা আত্মসমর্পণের পর তাদের মিত্রবাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হয়। পাকবাহিনীর অংশ বিশেষ চাঁদপুর অভিমুখে পালিয়ে যায়।

সাংসারিক জীবনে পিতা হিসেবে জনাব আক্তারুজ্জামানের অন্যতম সাফল্য তিনি মেধাবী চার কন্যা ও দু'পুত্রের গর্বিত জনক। তাঁর দ্বিতীয় কন্যা তাহমিনা জামান গোধূলী ১৯৯৮ সালের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় মানবিক বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বিক্রমপুরের মুখোজ্জল করে। বর্তমানে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যয়ন করছে।

মোঃ জয়নাল আবেদীন

মোঃ জয়নাল আবেদীন ১৯৫৪ সনে শ্রীনগর থানাধীন বেজগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মোঃ ইউনুস মিয়া।

জনাব জয়নাল আবেদীন পেশায় একজন ব্যাংকার। বর্তমানে কৃষি ব্যাংকের মহা-ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত। কর্মজীবনে তিনি সকলের কাছেই একজন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত।

স্কুল ছাত্র কালীন সময়েই জয়নাল আবেদীন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং ১১ দফা আন্দোলনে অংশ নেন। '৭০-এর নির্বাচনের পর পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী যখন ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করছিল সেই সময়কার আন্দোলনমুখর উত্তাল দিনগুলোতে তিনি এলাকার জনগণকে সংগঠিত করছিলেন। ১৩ মার্চ থানা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের

www.pathagar.com

উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় তিনি পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলা পতাকা উড়িয়ে দেন। ২৮ মার্চ তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে শ্রীনগর থানা লুট করেন। জনাব আবেদীন মুক্তিযুদ্ধে সংক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কাছে শুধু সস্তা শ্লোগান নয়, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি সকল ভয় ভীতি ও প্রলোভনকে পরাভূত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখেছেন।

এছাড়া তিনি বিক্রমপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। বহু সমাজসেবা মূলক সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে তিনি একজন সচেতন ও বিবেকবান মানুষ হিসেবে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আশরাফ আলম কাজল

আশরাফ আলম কাজল ১৯৫৭ সনে নানাবাড়ি মতলব উপজেলার লালপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তার পৈত্রিক নিবাস মুন্সিগঞ্জ থানার কোটগাঁও। বাবার নাম মোঃ ইয়াকুব আলী তালুকদার।

জনাব আশরাফ আলম কাজল ১৯৭১ সালে মুন্সিগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এস,এস,সি, ১৯৭৩ সালে হরগঙ্গা মহাবিদ্যালয় থেকে এইচ, এস,সি, ১৯৭৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে বি, এস,সি অনার্স এবং ১৯৭৯ সনে এম, এস,সি পাশ করেন। ১৯৬৪ সনে মন্সিগঞ্জ সৃজনী কচিকাঁচার মেলা থেকে সংগঠন জীবন শুরু। ১৯৬৯ এর উত্তাল ছাত্র আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ২৪ এপ্রিল এস,এস,সি পরীক্ষা বয়কট করেন এবং পরীক্ষায় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে অনিকেত পত্রিকার একটি লেখার জন্য কারাবরন করেন। স্বাধীনতা উত্তর ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মুন্সিগঞ্জ জেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় যুবক শ্রেণী যাতে বিভ্রান্তিতে না পড়ে সে জন্য মুন্সিগঞ্জ শহরে 'ঘাস ফুল নদী' নামে তারুন্যে উজ্জল সংগঠন গড়ে তোলেন। যার প্রবাহমানতা এখনও। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ এন্ট্রি ড্রাগ ফেডারেশন গড়ে তোলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ এন্ট্রি ড্রাগ ফেডারেশনের মহাসচিব হিসেবে দেশব্যাপী মাদক বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন ব্যাংকার। সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ঘাস ফুল নদীর' প্রধান উপদেষ্টা।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে তিনি ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও থাইল্যাণ্ড ভ্রমন করেছেন। মাদক বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পালক অ্যাওয়ার্ড ১৯৯৯ পেয়েছেন।

ইফতেখার আহমেদ

ইফতেখার আহমেদ বিক্রমপুরের বাসাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম খন্দকার ফজলুর রহমান। তিনি ইংরেজীতে এম,এ,পি,টি,এস। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বোর্ড অব রেভিন্যুর ফাষ্ট সেক্রেটারী।

www.pathagar.com

আইন ব্যবসায় বিক্রমপুরের কৃতিত্ব

আইন ব্যবসায় অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ যিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, অবিভক্ত বাংলার সেই বিচারপতি স্যার চন্দ্র মাধব ঘোষ বিক্রমপুরেরই কৃতী সন্তান। তিনি তার অসাধারণ মেধা, শ্রম ও শক্তি দিয়ে বিক্রমপুর তথা সমগ্র বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। সেই থেকে আজো অনেকেই যারা কৃতিত্বের সাথে আইন ব্যবসার সাথে জড়িত থেকে বিক্রমপুরের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছেন।

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ ১৮৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিক্রমপুরের ষোলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম দূর্গাপ্রসাদ বাবু মাতা বজ্রযোগিনী গুহ বংশের কন্যা চন্দ্রমালা। গ্রাম্য স্কুলে সামান্য লেখাপড়ার পর ভবানীপুর একটি স্কুলে পড়তে দেয়া হয়। ১৮৪৫ সালে জুনিয়ার শীপ পরীক্ষায় বৃত্তি পান। ১৮৫৬ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়তে থাকেন। এবং ১৮৫৯ সালে আইনের শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এরপর ২১ বছর বয়সে (১৮৫৯ সালের শেষ ভাগে) বর্ধমানে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হন।

তদানীন্তন জজ মিঃ বাকল্যান্ড চন্দ্রমাধবের কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রসংসা করেন। তিনি কিছুকাল ডেপুটি কালেক্টর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৪ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনিত হন এবং একই সালে হাইকোর্টের বিচারপতি পদ লাভ করে বিক্রমপুরের মুখোজ্জল করেন। তিনি সর্বোচ্চ সম্মান নাইট উপাধিতেও ভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, আইন বিভাগীয় পরামর্শ সভার অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। স্বীয় জন্মস্থান ষোলঘর গ্রামের প্রতি তিনি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। বহু অর্থ ব্যয়ে সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি ১৮৪৫ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে ঢাকার কালুশংকর রায় চৌধুরীর ছয় বছরের কন্যা হেমন্ত কুমারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ২০শে জানুয়ারী ১৯২৮ সালে কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

গুরু প্রসাদ সেন

গুরু প্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৪০ সালের ২০ মার্চ ডোমসারে। ঢাকার পগোজ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৪ সালে এম এ পাস করেন। গুরু প্রসাদ সেনই পূর্ববঙ্গের প্রথম এম এ। ১৮৬৫ সালে তিনি বিএল পরীক্ষায় পাস করেন এবং প্রাদেশিক শাসন বিভাগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথমে কৃষ্ণনগর ও পরে বাঁকিপুরে কাজ করেন। সেখানে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের

www.pathagar.com

সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সরকারী পদ ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে ওকালতি শুরু করেন। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নীলকর চাষীদের পক্ষাবলম্বনে সংগ্রাম। বিহারের প্রথম ইংরেজী পত্রিকা 'বিহার হেরাল্ড' ১৮৭৪ সালে প্রকাশের কৃতিত্ব তাঁরই। দরিদ্র ছাত্রদের হোস্টেল এবং ঢাকায় ও বাঁকিপুরে দু'টি স্কুল স্থাপন করেন। নিজ গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মাণেও উদ্যোগী ছিলেন। বিহারে ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) তাঁর চেষ্টায়ই সম্ভব হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। জুরির বিচার ব্যবস্থা উঠানোর চেষ্টা হলে তাঁর রচিত পুস্তিকা বিলেতেও প্রশংসিত হয়।

তিনি ধর্ম বিশ্বাসে উদারপন্থী এবং বিধবা বিবাহে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বিপদগামী মেয়েদের বিবাহ ও পুনর্বাসনে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখেছেন। ১৯০০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কীর্তি এই শিক্ষানুরাগী শিক্ষাবিদের মৃত্যু হয়।

দুর্গা মোহন দাস

দুর্গা মোহন দাস ১৮৪১ সালে তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাশীশ্বর। পিতার কর্মক্ষেত্র বরিশালে অবস্থানকালে চৌদ্দবছর বয়সে প্রদর্শনী বৃত্তি পেয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ১৮৬১ সালে আইনের প্রথম পরীক্ষায় পাস করেন। ১৮৬৩ সালে বরিশালে ফিরে সরকারী উকিল হন। ১২৭১ সালে প্রধানত তার চেষ্টায় বরিশালে কয়েকটি কায়স্থ বালবিধবার পুনর্বিবাহ হয়। পূর্ববঙ্গে এ প্রচেষ্টা প্রথম। এ কাজের জন্য তাকে বহু সামাজিক ও আর্থিক পীড়ন সহ্য করতে হয়।

তিনি নিজেও বিপত্নীক হওয়ার পর অতুল প্রসাদ সেনের বিধবা মাতাকে বিবাহ করেন। ঈশ্বর চন্দ্র ভিন্ন আর কেউ বাংলাদেশে বিধবা বিবাহের জন্য এত অর্থ ব্যয় করেননি। উদ্ধার প্রাপ্ত বালবিধবা ও কুলীন কন্যাদের তিনি নিজগৃহে আশ্রয় দিয়েছেন। ১৮৭৬ সালে কলকাতার পৌরসভার সদস্য হন। উল্লেখ্য, তাঁর পুত্রদের মধ্যে এস আর দাস ও বিচারপতি জ্যোতিষ রঞ্জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র ও দার্শনিক পন্ডিত প্রশান্ত কুমার রায় তাঁর জামাতাএবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রফুল্ল রঞ্জন দাস

১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রফুল্ল রঞ্জন দাস তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভুবন মোহন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯০৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৭

www.pathagar.com

সালে পাটনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করে বিচারপতি পদ লাভ করেন। সাহিত্যানুরাগী হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মথ অ্যান্ড দি স্টার। এছাড়া দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকাতেও কবিতা লিখতেন। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে তার মৃত্যু হয়।

ক্ষিতিশ চন্দ্র নিয়োগী

বিশিষ্ট আইনবিদ ও রাজনীতিবিদ ক্ষিতিশ চন্দ্র নিয়োগী ১৮৮৮ সালে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সতীশচন্দ্র। ঢাকা কলেজের স্নাতক এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম এ পাস করেন। পরে আইনে স্নাতক হয়ে কলকাতা হাইকোর্ট ও দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে প্র্যাক্টিস করেন। ১৯২১-২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য এবং ১৯২১-৩৪ সালে আইন সভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৫-৪০ সালে রাজন্যবর্গের মন্ত্রীদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে পুনরায় আইনসভার সদস্য হন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর নেহেরু মন্ত্রিসভার ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ও পরে বাণিজ্য মন্ত্রী হন। ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় তিনি ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপ্যাধায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ও ১৯৫৩ সালে প্লানিং কমিশনের সদস্য হন। ১৯৫৩-৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন নীতি ও সমগ্র দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শদাতা ছিলেন এবং ট্যারিফ কমিশনের সভাপতিত্ব করেন। ইউনেস্কোর মানবাধিকার কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।

সি. আর. দাস

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট স্বরাজ আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা, বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক, আইনজীবি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বরেণ্য নেতা, যিনি স্বরাজ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে বার বার তিনি কারাজীবন বরণ করেছেন, যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য জাক জমক পূর্ণ জীবনের সকল উপকরণ পরিহার করে নির্লোভ নিরাসক্ত সাত্ত্বিকের জীবন যাপন করেছেন, অত্যন্ত দূরদর্শী বিরল বাগ্মী সেই প্রতিভাদীপ্ত সি.আর দাসের জন্ম স্বর্ণগর্ভা বিক্রমপুরের তেলিরবাগে। এই কৃতি সন্তানের জন্য বিক্রমপুর গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। চিত্তরঞ্জন দাস পরাধীন বৃটিশ যুগে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি শুধু তিনি বৃটিশের রোষানলে পতিত দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার বীর সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা দান করেছেন। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকেই আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয় তাঁর অসাধারণ আইনজ্ঞান, কুটতর্ক ও যুক্তিতে

www.pathagar.com

সরকারী পক্ষের আনীত অভিযোগগুলো কুয়াশার মতো উবে যেত তবুও যখন বিচারক বারীন্দ্র কুমার উল্লাস করের ফাঁসির আদেশ দেন তখন দেশ বন্ধু বিচারককে বলেন, আমি তাদেরকে বাঁচিয়ে আনবই। তিনি কথা রেখেছিলেন, তাদের মুক্ত করে ছেড়েছিলেন। সেই সীমাহীন অন্যায় অত্যাচার আর পরাধীনতার যুগে যে সকল বীর সংগ্রাম, অগ্নি পুরুষ বৃটিশ শাসনের জিঞ্জির ভাঙ্গতে গিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোষ ও ষড়যন্ত্র মামলায় পড়েছেন, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে তাদের সমর্থনে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এর মাঝে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা, আলীপুর ট্রাঙ্ক হত্যা মামলা -প্রতি ক্ষেত্রেই মিথ্যা মামলায় জড়ানো অভিযুক্তদের তিনি মুক্ত করেন। তাদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, পুলিন বিহারী দাস অন্যতম। খ্যাতনামা আইনজীবী সি আর দাস দেশ প্রেমিকের পক্ষে কাজ করে আইনজীবী হিসেবেই মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নেন এবং তার কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ব্যারিস্টার জীবনের এক বিরাট সাফল্য লাভ করেন। দেশপ্রেমিকের কাজ করতে গিয়ে তিনিও ভাবিত হন। কেন আমরা নিজ দেশে পরবাসী, পরাধীন। তাই তিনি ডাক দেন স্বরাজ আন্দোলনের। ব্যারিস্টারী ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের কাজে। বিরাট আয় ত্যাগ করেন। সমস্ত সম্পত্তি দান করেন দেশের কাজে। খাঁটি দেশ প্রেমিকের পক্ষেই এই কাজ সম্ভব। তাই ব্যারিস্টার সি আর হলো দেশ বন্ধু।

আইনজীবি হিসাবে ইতিহাস খ্যাত এই মহান পুরুষ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করতে গিয়ে উচ্চ বর্নের হিন্দুদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। তাই তো কবি গুরু তার মৃত্যুতে লিখে গেছেন তার অমর কবিতা খানি–

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।

বিচারপতি খন্দকার মোহাম্মদ হাসান

বিচারপতি খন্দকার মোহাম্মদ হাসান ১৯০৬ সালে লৌহজং থানার নওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম খন্দকার ইন্তাজউদ্দিন আহমেদ।

জনাব মোহাম্মদ হাসান একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে মেট্রিক ও আই.এস.সি পাশ করেন। অতপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে মাষ্টার্স করেন।

একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৩৩ সালে। লেখাপড়া শেষে কলকাতা হাইকোর্টে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর ঢাকায়

www.pathagar.com

এসে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনি ফেডারেল কোর্ট অব পাকিস্তানের সিনিয়র এ্যাডভোকেট হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

তিনি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে একজন বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং জীবন বীমা করপোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১২ই জুলাই ১৯৯৪-এ তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফজলে কাদেরী মুহাম্মদ মুনিম

বিশিষ্ট আইনবিদ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ফজলে কাদেরী মুহাম্মদ মুনিম ১৯২৪ সালের ১লা ডিসেম্বর সিরাজদিখান থানার খিলগাঁও গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মৌলভী আব্দুল খালেক আল কুরায়শী।

জনাব ফজলে মুনিম ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান), ১৯৪৭ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ (কলা), ১৯৪৯ সালে আইন শাস্ত্রে স্নাতক ও ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর ১৯৬০ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে আইন শাস্ত্রে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া ১৯৫৯ সালে ব্রিটেনের লিংকস ইন, এ ব্যারিষ্টার এট ল ডিগ্রী লাভ করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি দেশ বিদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভূক্ত হন। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে সিনিয়র এ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভূক্ত হন। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকে আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭০ এ পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনের মধ্যে ১৯৭০ সনে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগ, ১৯৭২-৭৩ সনে বাংলাদেশ সরকারের আইন ও সংসদ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, ১৯৭৬-৮২ সনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপীলেট ডিভিশনে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ এবং ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনাব ফজলে কাদেরী বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স ঢাকা'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এক সময় তিনি এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিল, পাকিস্তান বার কাউন্সিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে তিনি ১৯৭২ সনে শাসনতন্ত্র রচনায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

ছিলেন। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উল্লেখযোগ্য ভোট অর্জন করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি কারা সংস্কার বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে চার সদস্য নিয়ে সৌদি আরব, জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, সুইডেন, হল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, জাপান ও হংকং সফর করেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী কোর্ট অফ জাষ্টিস এর সংবিধিবদ্ধ আইন রচনার জন্য তিনি ও, আই, সির বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ১৯৮১ সনে।

জনাব ফজলে কাদেরী সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৬৪ সনে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে গোল বৈঠক কনফারেন্স, ১৯৬৮ সনে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক আইন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বার্কশসার সম্মেলন, ১৯৬৯ সনে জাতিসংঘের সাধারণ এসেম্বলীর প্লেনারী সেশন, ১৯৭০ এ ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক আইন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বার্কশসার সম্মেলন, ১৯৭৩ এ আইনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি আয়োজিত আইভরি কোর্ট সম্মেলন, ১৯৭৫ সনে অষ্টাদশ অষ্ট্রেলিয়ান লিগ্যাল কনফারেন্স আয়োজিত ক্যানবারা সম্মেলন, ১৯৭৬ এ জাতিসংঘ সাধারণ এসেম্বলী প্লেনারী সেশন, এশিয়ান ও আফ্রিকান লিগ্যাল কনসালটেটিভ কমিটি আয়োজিত কুয়ালালামপুর সম্মেলন, আন্তর্জাতিক আইন সংস্থা আয়োজিত মাদ্রিজ সম্মেলন, জাতিসংঘ আয়োজিত নিউইয়র্ক সাগর আইন সম্মেলন ও ১৯৮৩ তে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশের প্রতিনিধিরূপে জেদ্দা, যুক্তরাজ্যের আইন প্রতিষ্ঠান, বার এসোসিয়েশন ও আইনের স্কুল পরিদর্শন, হংকং এ অনুষ্ঠিত সপ্তম কমনওয়েলথ আইন সম্মেলন ১৯৮৪ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক অ্যাপিলেট জাজেস এবং কমনওয়েলথ চীফ জাষ্টিস সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বর্নাঢ্য জীবনের অধিকারী এ মানুষটি ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুবরণ করেন।

শফিউদ্দিন আহমেদ

বিশিষ্ট আইনজীবী ও দানশীল ব্যক্তিত্ব শফিউদ্দিন আহমেদ ১৯২৫ সনে সিরাজদিখান থানার কুসুমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু হলেও পরবর্তিতে তিনি একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জীবদ্দশায় তিনি নিজ এলাকার বহু লোককে চাকুরি ও আর্থিক সাহায্য করেছেন। দানশীল এই ব্যক্তি মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ১৯৭৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান

বিশিষ্ট আইনজীবি ব্যারিষ্টার মতিউর রহমানের জন্ম ১৯৩৫ সালে টঙ্গীবাড়ি থানার সরিষাবন গ্রামে। জনাব রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে লন্ডনের লিংকনস্ ইন থেকে ১৯৬৭ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন।

বর্তমানে তিনি সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজের পার্ট টাইম অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের লেকচারার ও সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে সুনামের সাথে আইন ব্যবসা করে যাচ্ছেন।

দবির উদ্দিন আহমেদ

বিশিস্ট আইনজীবি ও প্রাক্তন ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল দবির উদ্দিন আহমেদ ১৯৩৭ সনে ১২ই জানুয়ারী লৌহজং থানার মৌছা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার বাবার নাম ওসমান আলী।

জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ শিক্ষা জীবন শেষে ইনকাম ট্যাক্স প্রাকটিশনার হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আয়কর আইনজীবি সমিতির সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ঐ আয়কর আইনজীবি সমিতির যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ টেক্স বার এসোসিয়েশন নামকরন হয়, তার কার্যকরী পরিষদের সদস্য, সহকারী সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আয়কর আইনজীবি সমিতির সাধারন সম্পাদক হিসেবে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সকল আয়কর আইনজীবিদের নিয়ে সম্মেলন করেন এবং ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশ টেক্স ল ইয়ার এসোসিয়েশন নামে আইনজীবিদের একটি জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ঐ সংগঠনের মহাসচিব ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব দবির উদ্দিন ছাত্র জীবনে দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি এবং ঐ কলেজ শাখার ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের সময় তিনি ডাকসুর কমন রুম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি হিসেবে মামলা পরিচালনা করেন। আয়কর আইনজীবি সংগঠনের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি আয়কর আইনজীবিদের জন্য বহু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এবং আয়কর আইন বিষয়ে জাতীয় পত্র পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি করেন । বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদ, কর আইনজীবি শাখার সভাপতি। এছাড়া মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির আজীবন সদস্য। এ সমিতির ইলেকশন কমিশনের প্রথমে সদস্য ও পরবর্তীতে পর পর দু'বার চেয়্যারম্যান হিসাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য ১৯৯৭ সনে তিনি পবিত্র হজ্জ ব্রত

www.pathagar.com

পালন করেন এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে 'হজ্জে যাও' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন ।

বিচারপতি কে এম হাসান

বিচারপতি কে এম হাসান ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস লৌহজং থানার নওপাড়া। পিতা মরহুম বিচারপতি খন্দকার মোহাম্মদ হাসান।

জনাব কে. এম. হাসান বি এ (অনার্স) এম এ এবং এল এল বি ডিগ্রী গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি একজন ব্যারিষ্টার এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এস. এস করেন। তিনি ইরাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে সুপ্রিম কোর্টে একজন বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান।

জনাব হাসান বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স এর তিনি অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক এবং ডিরেক্টরও ছিলেন। তিনি আমেরিকার বার এসোসিয়েশনেরও মেম্বার ছিলেন। এ যাবৎ তিনি দেশ-বিদেশে বহু সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করেছেন।

ওমর ফারুক

ব্যারিস্টার ওমর ফারুক লৌহজং থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করে ব্যারিস্টারী পড়তে বিলাত যান। সেখান থেকে ব্যারিস্টারী পাস করার পর ১৯৭০ সালে ইনার টেম্বল বারে যোগদান করেন। তিনি ৭০-এর শেষ দিকে দেশে ফিরে বাংলাদেশ বারে যোগদান করেন এবং ৭১ এ স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ইংলিশ বারে যোগদানের জন্য ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গের মানবাধিকার কোর্টে কেস ফাইল করার ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি 'ইমারজেন্স অব বাংলাদেশ' বই ও অন্যান্য বেশ কিছু মৌলিক প্রবন্ধের রচয়িতা এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

মোঃ মোশারফ হোসেন খান

মোঃ মোশারফ হোসেন খান ১৯৪২ সালের ৫ জুন লৌহজংয়ের মেদিনীমন্ডল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আলেপ খান। শিক্ষা জীবন শেষ করেন বি.এ.এল.এল.বি করে।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট। এছাড়া তিনি দীর্ঘ দিন মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মুন্সীগঞ্জ জেলার উন্নয়নে তার অবদান স্বীকৃত।

www.pathagar.com

ঢালী মোয়াজ্জেম হোসেন

বিশিষ্ট আইজীবী ঢালী মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৪৮সালের ৮ই মার্চ লৌহজং থানার কোরহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ চাঁন ঢালী। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে প্রাকটিস করছেন।

উল্লেখ্য, ঢালী মোয়াজ্জেম হোসেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সাহসী সৈনিক। দেশ মাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে নিজের বর্তমানকে বিপন্ন করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তার নেতৃত্বে গোয়ালীমান্দ্রা যুদ্ধ বিক্রমপুরের একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়।

জনাব ঢালী পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজনীতির সাথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা। এছাড়া তিনি বহু সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত।

মাহবুবে আলম

বিশিষ্ট আইনজীবি ও বাংলাদেশ সরকাররের প্রাক্তন অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ১৯৪৯সনের ১৭ ফ্রেরুয়ারী লৌহজং থানার মৌছামান্দ্রা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার বাবার নাম ওহাজ উদ্দিন আহমেদ।

১৯৭৩ থেকে আইনজীবি হিসেবে কর্মরত জনাব মাহবুবে আলম ১৯৭৫ সনে হাইকোর্টের সনদ, ১৯৮০ সনে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে সনদ , ১৯৯৮ সনে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবি হিসেবে সনদ লাভ করেন । অতপর ১৯৯৯ সনের ১৪ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

জনাব মাহবুবে আলম ১৯৭৭-৭৮ সনে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক , ১৯৯৩- ৯৪ সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবি সমিতির সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ -৮৪ সনে স্থানীয় স্কুল কাজির পাগলা এটি ইনষ্টিটিউশনের গভর্নিং বডির অভিভাবক প্রতিনিধি পদে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া তিনি ১৯৭৮ সনে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সংসদীয় বিষয়ে পড়াশুনার জন্য ছয়মাস ভারতে অবস্থান করেন। ১৯৯৩ সনে ল এশিয়ার (আইনজীবিদের সংগঠন) কনফারেন্সের জন্য শ্রীলংকা ও ১৯৯৫ সনে ভারতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সার্ক ল কনফারেন্সে যোগ দেন। ব্যক্তিগত জীবনে জনাব মাহবুবে আলম একজন নিষ্ঠাবান ও রুচিশীল মানুষ।

www.pathagar.com

আব্দুল মান্নান

এডভোকেট আব্দুল মান্নান ১৯৪৯ সলের ২৯, নভেম্বর শ্রীনগর থানার কামারগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার বাবার নাম শেখ আব্দুল গনি।

জনাব আব্দুল মান্নান একজন সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও শুধুমাত্র, মেধা ও প্রবল উদ্যোগশক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনি ভাগ্যকুল হরেন্দ্র লাল উচ্চবিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি, ফরিদপুর বরেন্দ্র কলেজ থেকে এইচ. এস. সি, ও সিটি ল'কলেজ থেকে এল,এল,বি ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর বিভিন্ন জেলায় জেলা জ জের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। সহকর্মীদের কাছে তিনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত।

মোঃ শাহ্জাহান মিঞা

এডভোকেট শাহ্জাহান মিঞা ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীনগর থানার দেউলভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আব্দুল আজিজ মিয়া।

আইন ব্যবসার পাশাপাশি জনাব শাহ্জাহান বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলা জজ কোর্টের পি.পি. ছিলেন। শ্রীনগর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। এছাড়া তিনি দুই দুইবার বি.আর.ডি.বি.-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বিলকিস বেগম

বিলকিস বেগম ঐতিহ্যবাহী বিক্রমপুরের টংগীবাড়ী থানার আড়িয়ল গ্রামে ১৯৫৫ সালে জন্ম নেন। পিতার নাম মোঃ হবিজউদ্দিন। তিনি এ ভি জে এম গার্লস স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এস,এস,সি পাস করে নারায়ণগঞ্জের তুলারাম কলেজ থেকে এইচ এস সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে সম্মানসহ সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। অতপর ১৯৮২ সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা শিল্প ব্যবস্থাপনায় পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন এবং প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ধানমন্ডি 'ল' কলেজ থেকে এল, এল বি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮১ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনে উর্ধ্বতন সমন্বয় কর্মকর্তা হিসাবে পরিকল্পনা বিভাগে যোগদান করেন। তিনি বিসিক এর প্রধান বিভাগ, প্রশাসন, এম আই এস এবং প্রকল্প বিভাগে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে শিল্প ব্যবস্থাপনা বিভাগে উর্ধ্বতন অনুষদ সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সালে পদোন্নতি পেয়ে তিনি উপ-মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিলকিস বেগম সেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ঃ

www.pathagar.com

সদস্য ঃ বাংলাদেশ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
নির্বাহী ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা।
সদস্য ঃ বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞান সমিতি।
আজীবন সদস্য ঃ মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি।
আজীবন সদস্য ঃ বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন।
আজীবন সদস্য ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভলপমেন্ট, ঢাকা।
আজীবন সদস্য ঃ কমিউনিটি হেলথ রিসার্চ এসোসিয়েশন।
প্রশিক্ষণ সচিব ঃ বাংলাদেশ শিল্প ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট।
সমাজকল্যান ও মহিলা বিষয়ক সচিব ঃ সমাজ বিজ্ঞান ফোরাম '৭৮।
মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি ও বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের তিনি একজন সক্রিয় কর্মী।

এফ, কে, এম আহসান মাহবুব

এফ, কে এম আহসান মাহবুব ১৯৫৬ সনের ৩০ এপ্রিল এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তার বাবা মরহুম বিচারপতি ডঃ এফ, কে এম এ মুনিম।

জনাব আহসান মাহ্বুব ১৯৭৩ সনে সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল থেকে এস. এস. সি, ১৯৭৫ সনে নটরডেম কলেজ থেকে এইচ, এস, সি, ১৯৭৭ সনে একই কলেজ থেকে বি, এ ১৯৮০ সনে সেন্ট্রাল ল কলেজ থেকে এল. এল. বি ও ১৯৯০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাস্টার্স করেন।

১৯৮৩ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকা ডিষ্ট্রিক কোর্ট এবং ১৯৮৫ সনের ১১ জুন বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিসনের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি হিসেবে কাজ শুরু করেন।

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট ডঃ এম জহিরের অধীনে কোর্ট ব্যবস্থাপনা ও কোর্ট বিলম্বকরন বিষয়ে তিনি সহকারী গবেষক হিসেবে এক বছর কাজ করেন। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দ্বিতীয় সড়ক পুনর্বাসন প্রজক্টে (RRMP-11) এর আইন উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৯৩ সনের নভেম্বর থেকে ১৯৯৬ এর মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৪ সনের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৩৯ তম সেশনের সাধারণ সভায় বাংলাদেশ দলের উপদেষ্টা হিসেবে অংশ গ্রহন করেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব সহ তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। তাঁর অবস্থান ১ বছর তিন মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের এ্যাটর্নী জেনারেল হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি সুপ্রিম কোর্ট বারএসোসিয়েশনেরও একজন সম্মানিত সদস্য।

www.pathagar.com

জাহিদ হোসেন

বাড়ি সিরাজদিখান থানার কুসুমপুর। জন্ম ১৯৫৮। বাবা সফিউদ্দিন আহমেদ ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। আইন ব্যবসার পাশাপাশি জনাব জাহিদ সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত। এর মধ্যে ওয়ারী সমাজসেবার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্বরত আছেন। এছাড়া একজন রোটারিয়ান হিসেবেও সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। উল্লেখ্য ২০০১ সালের স্বাধীনতা দিবসে ঘোষিত রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা আহবায়কও তিনি।

জাকির হোসেন

এডভোকেট জাকির হোসেন ১৯৫৯ সালের শ্রীনগর থানার কোলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আলহাজ্ব আজিজুর রহমান বাদশা মিয়া।

জনাব জাকির হোসেন স্যার জেসি বোস ইনষ্টিটিউশন থেকে এসএসসি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে আইএ, এবং জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাষ্টার্স করেন এর পর ঢাকা সেন্ট্রাল ল কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সেন্ট্রাল ল কলেজের প্রভাষক ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইন জীবি হিসাবে কর্মরত আছেন। এছাড়া এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সেকশনের আইনজীবি গ্রুপের সভাপতি।

উল্লেখ্য জনাব জাকির হোসেন ছাত্র জীবনে নাট্য সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ঢাকা পদাতিকের একজন নিয়মিত নাট্য শিল্পী হিসেবে তিনি একাধিক মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেছেন। ৮০ দশকের একজন নিয়মিত মুকাভিনেতা হিসাবেও তার পরিচিতি ব্যাপক।

www.pathagar.com

ক্রিড়াঙ্গনে বিক্রমপুর

বিক্রমপুরের কৃতি সন্তানেরা তাদের ক্রিয়া নৈপুন্য দিয়ে শুধু বিক্রমপুরকে নয় সমগ্র বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাতারু ব্রজেন দাস, মোশারফ হোসেন, মল্লবীর শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায় বিক্রমপুরেরই কৃতি সন্তান।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালে বিক্রমপুরের আড়িয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মল্লবীর হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারত থেকে বিদেশ পর্যন্ত। তরুণ শ্যামাকান্ত ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নকালেই নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা অনুশীলন শুরু করেন। ঢাকার লক্ষীবাজারে সে সময় বিখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের নিকট কুস্তি শিক্ষা নেন। আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সেই তিনি পাঞ্জাবের ভূট্টা সিং পালোয়ান, যুক্ত প্রদেশের জয়মাল সিংকে কুস্তিতে পরাজিত করে দেশ জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। দু'বছর ত্রিপুরার মহারাজার পার্শ্বচর রূপে কর্মরত থাকার পর বরিশাল জেলা স্কুলের ব্যায়ামের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এর মাঝে পাটনার নওয়াবের চিড়িয়াখানার বাঘিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হলে নওয়াব কর্তৃক বাঘিনী ও একহাজার টাকা পুরস্কার পান। বাংলা ১২৯৪-এ তিনি ফ্রেড কুকের ইংলিস সার্কাসে যোগদান করেন। সার্কাস দলের হিংস্র জীবজন্তুর খেলাতে তিনি পারঙ্গম হয়ে ওঠেন এবং দেশ জোড়া খ্যাতি লাভ করেন। ১২৯৫ -এ তিনি নিজেই এক বিরাট সার্কাস দল গঠন করেন। কিন্তু এই দলটি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি আবার নতুন দল তৈরি করেন। "গ্রান্ড শো অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস"। তিনি নিজ বুকের ওপর ১২/১৩ মন ওজনের পাথর ভাঙ্গতেন। এভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যায়াম অনুশীলন, আত্মনির্ভরশীলতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করাই ছিল তার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। পিতার মৃত্যুর পর ৪২ বছর বয়সে "তিব্বতী বাবা" নামে জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে "সোহহং স্বামী" নামে পরিচিত হন এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা সব কিছু ত্যাগ করে বিবাগী হন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যেঃ সোহহং তত্ত্ব, সোহহং সংহিতা, বিবেক গাথা, কপর্লদ ও ভগবদ্গীতার সমালোচনা। মল্লবীর শ্যামাকান্ত ৬ ই ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

অভিলাষ ঘোষ

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কৃতি ফুটবলার তৎকালীন মোহনবাগান ক্লাবের অধিনায়ক অভিলাষ ঘোষ ১৮৯৪ সালে বিক্রমপুরের পাউলদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম অভয় চরন।

www.pathagar.com

১৯১১ সালের আই.এফ.এ-র শীল্ড জয় করে মোহনবাগান ক্লাব বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে যে নবচেতনার জোয়ার জাগিয়েছিল, সেই জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন অভিলাষ। পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহ স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই ফুটবলে নাম করেন। ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের সহায়তায় মোহন বাগান ক্লাবের দলভুক্ত হবার সুযোগ আসে। ১৯১১ সালে আই.এফ.এ. শীল্ডের সেমিফাইনাল খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে দ্বিতীয় দিনের খেলায় বিপক্ষ দলের দুর্ভেদ্য গোলকীপারকে অতিক্রম করে তিনিই প্রথম গোল দেন। ফাইনাল খেলায় এক গোলে পিছিয়ে থাকা মোহনবাগানের পক্ষে অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী গোলটি পরিশোধ করার পর খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে একটি গোল দিয়ে সেন্টার ফরওয়ার্ড অভিলাষ ঘোষ মোহনবাগানের শীল্ড বিজয় নিশ্চিত করেন। এরপর তিনি মোহনবাগানের নিয়মিত সেন্টার হাফে খেলেছেন। ১৯২০-২২ সালে এই ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন। খেলোয়াড়ি জীবন ছাড়া তিনি ব্রিটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'ক্রকবণ্ড টী কোম্পানী'র পদস্থ অফিসার ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পঙ্কজ গুপ্ত

ক্রীড়াজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র পঙ্কজ গুপ্ত ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগর-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে আই এ এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে আইএফ এ প্রশাসনে প্রবেশ করেন। ১৯২৪ সালে জাভা সফরকারী আইএফএ দলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সালে লসএঞ্জেল্‌স্ অলিম্পিক থেকে শুরু করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশে ম্যানেজার, সহ-ম্যানেজার বা ডেলিগেট হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বিশ্ব ফুটবল কংগ্রেসে দু'বার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ফুটবল দল নিয়ে রাশিয়া যান। ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হয়ে ১৯৬৪ ও '৫২ সালে ইংল্যান্ড, ১৯৪৭, '৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বহুস্থান সফর করেন। ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব স্থাপনে এবং ইডেন উদ্যানে স্টেডিয়াম স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। খেলাধুলায় অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির জন্য বৃটিশ সরকার তাকে এম বি ই উপাধি দেন। খেলার জগতে প্রথম পরিচয় একজন বিখ্যাত হকি আম্পায়ার হিসেবে। ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

ব্রজেন দাস

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস শুধু বিক্রমপুর নয় সমগ্র বাংলাদেশ ও বাংলার গর্বের ধন। বিক্রমপুরের কুচিয়ামোরা গ্রামে ১৯২৭ সালের ৭ ডিসেম্বর তার জন্ম। তিনি

www.pathagar.com

গ্রামের পাঠশালায় পড়ালেখা শেষ করে ঢাকায় জুবলী স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে কলকাতায় পড়ালেখা শেষ করেন। কলেজ জীবন থেকেই তিনি সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং সুনাম অর্জন করেন। কলেজ জীবন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তৎকালে তিনি সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ, শ্যামাপদ গোস্বামী ও মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের নিকট আধুনিক সাঁতারের কলাকৌশল শেখেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা ষ্টেডিয়াম চ্যানেল কোর্স করার প্রস্তুতি হিসেবে একনাগাড়ে প্রথমে ১২ মাইল, ২৪ মাইল এবং ৪৮ মাইল অনবরত সাঁতার কাটেন। ১৯৫৮ এ নারায়ণগঞ্জ হতে চাঁদপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৫ মাইল সাঁতার সমাপ্ত করেন এবং ১৯৫৮ এর মার্চে পাকিস্তান চ্যানেল কোর্স গঠন হলে তাকে ইংল্যান্ডে চ্যানেল কোর্স প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করা হয়। ১৯৫৮ এর ১৮ আগস্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৯ জন বাছাই করা সেরা সাঁতারুদের সাথে ইংল্যান্ডের চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরুষ প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এবং প্রথম এশিয়া চ্যানেল বিজয়ী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ঐ বছরই ইটালী থেকে আমন্ত্রণ আসায় সেখানে গিয়ে সমুদ্রে ৩৩ কিলোমিটার সাঁতারে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৯ এ আবার ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৬০ এ চারবার চ্যানেল কোর্স সমাপ্ত করার গৌরব অর্জন করেন এবং বিশ্ব রেকর্ডের তালিকায় নাম উঠান। এর পূর্বে মাত্র একজন চারবার চ্যানেল কোর্স করার গৌরব লাভ করেছিলেন।

১৯৬১ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স হতে ইংল্যান্ডের সমুদ্র পথে ২ বার অতিক্রম করে নজীরবিহীন দু'টি রেকর্ড স্থাপন করেন এবং দ্রুততম ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

ব্রজেন দাস ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার বিরল বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন এবং রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তার নিকট এ জন্য অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের লাইফ সেভিং সোসাইটি ও চ্যানেলসুইমিং এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে প্রাইড অব পারফরমেন্স উপাধি দেন। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার খেলাধুলায় তাকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন।

১৯৬৪ সালে তিনি আমেরিকার আটলান্টা সিটিতে ওয়ার্ল্ড লং ডিসটেন্স সুইমিং ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডের চ্যানেল কোচিং কমিটি তাকে 'কিং অব চ্যানেল' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদ অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক দিয়ে এই কৃতি সন্তানকে সম্মানিত করেন। সম্প্রতি এই কৃতি সাতারুর জীবনাবসান ঘটে।

www.pathagar.com

প্রতাপ শংকর হাজরা

কৃতি ফুটবলার প্রতাপ শংকর হাজরার বাড়ি বিক্রমপুরের লৌহজং থানায়। তিনি ভিক্টোরিয়ার মাধ্যমে ১৯৩১ সালে প্রথম বিভাগ ফুটবলে অংশ নেন। এরপর মোহামেডান-এ। ওয়ারী ক্লাবের হয়ে প্রথম বিভাগ হকিতে খেলতে আসেন ১৯৫৭ সালে। ১৯৬৫ থেকে ৬৯ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। ১৯৬২-৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হকি দলে নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। প্রতাপ রাশিয়া, ইরান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ভারত সফর করেছেন। তার রিসিভিং, টারনিং ক্ষিপ্রতা আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে।

মোঃ মহিউদ্দিন

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন টোকিওতে অনুষ্ঠিত ওয়াল্ড ভারসাইন্ট স্পোর্টস-এ পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরপর চার বছর ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ-এর ক্রীড়া সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। মিঃ মুন্সীগঞ্জ, মহিউদ্দিন দেশের একজন খ্যাতনামা কুস্তিগীর। মুক্তিযোদ্ধা এবং পরবর্তীকালে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মুন্সীগঞ্জের সমাজ কল্যাণমূলক অনেক সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত। তিনি ঢাকা স্টেডিয়াম মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি।

মোঃ শাহ আলম

কৃতি এ্যাথলেট মোঃ শাহ আলমের জন্ম ১৯৫৩ সালে। ১৯৭১-এ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪টি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক লাভ করেন। ৪০০ মিঃ দৌড়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেন।

১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪টি স্বর্ণ পদক লাভ করেন এবং ৪০০ মিঃ দৌড়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ১৯৮১-৮২ সালে ভারতের পতিয়ালা থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সহকারী কোচ।

মোশাররফ হোসেন খান

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাতারু মোশাররফ হোসেনের বাড়ি বিক্রমপুরের টঙ্গীবাড়ী থানার ধামারণ গ্রামে। বাবার নাম আব্দুল বারী খান। তিনি হরগঙ্গা কলেজ থেকে বি কম পাস করেন। ১৯৬৯ থেকে সাঁতার অনুশীলন শুরু। ১৯৬৯ সালে প্রাদেশিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় ২টি স্বর্ণ ও ১টি রৌপ্য পদক অর্জন তাকে আরো উৎসাহিত করে। ১৯৭২ সালে প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় সাঁতারে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন ও ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় জাতীয়

www.pathagar.com

সাঁতারে ৭টি বিষয়ে প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ৮টিতে অংশ গ্রহণ করে ৮টিতেই নতুন রেকর্ড করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হন।

১৯৭৪ সালে তৃতীয় বাংলাদেশ জাতীয় সাঁতারে ৮টিতে অংশগ্রহণ করে ৮টিতেই নতুন রেকর্ডের মাধ্যমে প্রথম এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হন।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ অলিম্পিকে ১০টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ১০টিতেই প্রথম হয়ে শ্রেষ্ঠ অলিম্পিয়ান শিরোপা অর্জন করেন। ১৯৭৭ সালে ভারতে আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় ২টি বিষয়ে সর্ব ভারতীয় নতুন রেকর্ড ও ২টিতে পশ্চিমবংগ রেকর্ড ভংগ করে প্রতিযোগিতার সেরা প্রতিযোগী হন।

১৯৭৭ সালে ভারত বাংলাদেশ শ্রীলংকা ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তিনটি বিষয়ে উপমহাদেশীয় নতুন রেকর্ড করে প্রথম হন এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তানেও সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনুরূপ সাফল্য অর্জন করে বাংলাদেশের মুখোজ্জল করেন।

১৯৭৮ সালে কানাডায় একাদশ কমনওয়েলথ সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে হিটে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এশিয়ান অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প সংস্থার অধিনায়ক হিসেবে ১৯৭২ থেকে ৭৮ পর্যন্ত সকল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে তিনি 'রাষ্ট্রীয় পুরস্কার' লাভ করেন। এছাড়া জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি অনেক পুরস্কার ও পদক লাভ করেন এবং চ্যানেল অতিক্রমকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশেষ আত্মপ্রকাশ করেন।

মজিবুর রহমান সিকদার

মজিবুর রহমান সিকদার ১৯৫৬ সালের ২৩শে এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী থানার ধামারন গ্রামের সম্ভ্রান্ত সিকদার পরিবারে জন্মগ্রহন করেন । তার পিতার নাম আলী আকবর সিকদার, মাতার নাম সাফিয়া বেগম।

জনাব সিকদার ধামারণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বজ্রযোগিনী জে,কে, বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ে তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন সমাপন করে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত রামপাল মহাবিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন এবং পরে জগন্নাথ কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি, এ, পাশ করেন।

www.pathagar.com

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতি, খেলাধুলা ও সমাজকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্থান আন্তঃ স্কুল, বাংলাদেশ আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল, সাঁতার ও এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় সাফল্য জনক কৃতিত্ব অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি বি, টি, এম, সি'র একজন খেলোয়ার হিসাবে ১ম বাংলাদেশ জাতীয় সাঁতার ও এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন এবং বিষেশ কৃতিত্ব অর্জন করে জাতীয় ক্রীড়াবিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। দীর্ঘ দিন তিনি বি, টি, এম, সি'র জাতীয় টিমের একজন সফল ক্রীড়াবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালে জাতীয় এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের তত্বাবধানে এবং জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশিক্ষন কোর্সে অংশ গ্রহন করে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং স্থানীয় এ্যাথলেটিক কোচ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মজিবুর রহমান সিকদার ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালেন ১১ দফার আন্দোলন এবং ১৯৭১সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন।

কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ টেক্সাটাইল মিলস কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ টি এণ্ড টি বোর্ড সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। ১৯৯১-১৯৯৬ সন পর্যন্ত বি, এন, পি সরকারের আমলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পর্যায়ক্রমে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম, শামসুল ইসলামের সহকারী একান্ত সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মজিবুর রহমান সিকদার থানা, জেলা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত, তিনি বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ জেলা পর্যায়ের সুপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ সংগঠন "মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি" র যুগ্ম-মহাসচিব। ইতিপূর্বেও তিনি অত্র সমিতির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে জনাব সিকদার সদালাপি, পরোপকারী ও নিরংকার স্বাভাবের একজন মানুষ।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অঙ্গনে বিক্রমপুরের অবদান

রাজনৈতিক অঙ্গনে বিক্রমপুরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ ভূখন্ডের অনেক ত্যাগি পুরুষ তাদের জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। রাজনীতি অঙ্গণের প্রবাদ পুরুষ সি. আর দাস বিক্রমপুরেরই কৃতি সন্তান। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামেও বিক্রমপুরের কৃতি সন্তানদের ভূমিকা দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। সমকালীন রাজনীতিতেও বিক্রমপুরের কৃতী সন্তানরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছেন।

মুকুন্দ দাস

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ চারন কবি মুকুন্দদাস ১৮৭৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিক্রমপুরের টঙ্গীবাড়ি থানার অন্তর্গত বামরী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গুরু দয়াল দে। মাতা শ্যাম সুন্দরী দেবী।

মুকুন্দ দাসের বাল্য নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর। রামানন্দ গোঁসাইর নিকট দীক্ষা নেয়ার পর তার নাম হয় মুকুন্দ দাস। এবং এ নামেই তিনি পরিচিত। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বৈষ্ণব মুকুন্দ দাসের হৃদয়তন্ত্রী মাতৃমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে। অশ্বিনী কুমার দত্তের সংস্বর্গে এসে তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। এরপর ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার জন্য গান ও নাটক করতে থাকেন। বাংলার ছোট লাট ফুলার সাহেবকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন- ফুলার আর কি দেখাও ভয়।/ দেহ তোমার অধীন বটে/ মন তো তোমার অধীন নয়/ হাত বাধিবে পা বাধিবে/ ধরে না হয় জেলেই দিবে/ মনকি ফেরাতে পারবে।/ সেতো পূর্ণ স্বাধীন রয়।

সুরকার মুকুন্দ দাসের কণ্ঠ রোধ করার জন্য সরকার ৩৬ বার ইংজ্যংশন জারি করেন। এবং তার মাতৃপুজা নাটক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মুকুন্দ দাসের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট ছিল তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তিনি তার মুসলমান মালীর জন্য মসজিদের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

মুকুন্দ দাস তার কর্মময় জীবনের স্বীকৃতি স্বরুপ সাতশ মেডেল পেয়েছিলেন। এবং কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে সন্তান বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাকে বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারন সম্রাট বলে সম্মানিত করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে ১৮ই মে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে এই আপোষহীন মুক্তি সংগ্রামীর জীবনাবসান ঘটে।

www.pathagar.com

সরোজিনী নাইডু

অবিভক্ত বাংলার তুখোড় রাজনীতিক নারী মুক্তির অগ্রদূত, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব, কবি ও সংগঠক সরোজিনী নাইডু বিক্রমপুরের তথা সারা বাংলাদেশের গর্ব। তার পিতা বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক, শিক্ষাবিদ অঘোর নাথ। তিনি হায়দ্রাবাদ নিজামের আমন্ত্রণে সেখানে নিজাম কলেজ স্থাপন করেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেন। সরোজিনী নাইডু পিতার সেই কর্মস্থল হায়দ্রাবাদে ১৮৭৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের লৌহজং এর ব্রাহ্মনগাঁও গ্রাম।

সে যুগে এই উপমহাদেশের মেয়েরা ছিল অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং সমস্ত দিক থেকেই অবহেলিত। সে যুগের একটি বাংগালী মেয়ের সংক্রিয় রাজনীতি করে খ্যাতি অর্জন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ছিল বিস্ময়কর ঘটনা।

সরোজিনী নাইডু ছিলেন অসাধারন প্রতিভার অধিকারীনি। তিনি ১৮৯১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ইংরেজীতে দু'হাজার লাইনের একটি ইংরেজী নাটক লিখে হায়দ্রাবাদ নিজাম প্রদত্ত তিন হাজার পাউণ্ড বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। ১৮৯৫-১৮৯৮ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কিংস কলেজ ও পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরেন। ১৮৯৮ সালে মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তিনি। এ ছাড়া ইংরেজী ভাষায় বাগ্মিতার জন্যও সুনাম কুড়িয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৮-এ ভারতের স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝাবার জন্য আমেরিকায় গমন করেন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলন করে কারা বরণ করেন। এরপর মহাত্মা গান্ধীর লবন সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৪৭ -এ ভারত স্বাধীন হলে তিনি উত্তর প্রদেশের রাজপাল নিযুক্ত হন।

সরোজিনী নাইডু শুধুমাত্র একজন সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নন। তিনি একজন সুসাহিত্যিকও বটে। তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্য চর্চা করে খ্যাতি লাভ করেন। সূদুর ইংল্যাণ্ড থেকে তার কাব্য প্রকাশ করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার কবিতার অনুবাদ করেন।

তার অসাধারণ প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তার নামানুসারে ভারতের একটি সড়কের নাম করেছেন সরোজিনী নাইডু রোড।

www.pathagar.com

কেদার রায়

ইতিহাস প্রসিদ্ধ বারো ভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের বাড়ি দক্ষিণ বিক্রমপুর। তিনি শ্রীপুরে (দক্ষিণ ঢাকা) বিক্রমপুরের রাজধানী স্থাপন করে ১৬০২ সালে সন্দ্বীপ অধিকার করেন। তখন সন্দ্বীপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র ও নৌকেন্দ্র ছিল। ক্রমে এ অঞ্চল মোঘল, পর্তুগীজ ও আরাকানীদের দ্বন্দ্বস্থলে পরিণত হয়। কেদার রায়ের সুশিক্ষিত নৌবাহিনী ছিল। ১৬০২ সালে এই নৌবাহিনীর প্রধান পর্তুগীজ কার্ভালো কর্তৃক মানসিংহের নৌসেনাপতি মুক্তারায় নিহত হয়। কেদার রায় মানসিংহের নিকট পরাজিত হয়ে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বাধীনই ছিলেন। পরে আরাকানী মগদের সঙ্গে ঢাকা আক্রমণকালে (১৬০৩) বিক্রমপুরের কাছে মানসিংহের হাতে পরাজিত ও মৃত্যুবরণ করেন। পদ্মায় বিলীন হয়ে যাওয়া রাজবাড়ীর মঠ তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি পর্তুগীজ মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ও গীর্জা নির্মাণে অনুমতি দেন। ভূঁইয়া চাঁদ রায় তার অগ্রজ।

উর্মিলা দেবী

নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী উর্মিলা দেবী ১৮৮৩ সালে তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভুবন মোহন দাস। স্বামী অজন্ত নারায়ণ সেন, ভাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। নারী মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামী নেত্রী হিসেবে তিনি নিজেকে জড়িত করার জন্যে তার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। লেখালেখিতেও তার মনোযোগ ছিল। তাঁর রচনার মধ্যে 'পুষ্পহার' উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখের স্মৃতিকথা তিনি রচনা করে গেছেন। ১৯৫৬ সালে তার মৃত্যু হয়।

মাখন লাল সেন

মাখন লাল সেন ১৮৮১ সালে টংগীবাড়ী থানার সোনারং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা গুরুনাথ। তিনি বিপ্লবী নেতা ও সাংবাদিক ছিলেন। ১৯৩০ সালে কিছুদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিজে 'ভারত' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতায় তিনি বহু গুণী সাংবাদিকের গুরু ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কফিল উদ্দিন চৌধুরী

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরী ১৮৯৮ সনে শ্রীনগর থানাধীন মজিদপুর দয়হাটা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলতাফ উদ্দিন চৌধুরী ।

জনাব কফিল উদ্দিন চৌধুরী খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'হাঁসাড়া কালি কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে মেট্রিকুলেশন পরিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ন হন। এরপর কলকাতায়

www.pathagar.com

রিবন কলেজে পড়াশুনা করে আই এ এবং বি,এ পাশ করেন। এক সময় কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং কিছুদিন পর ছেড়ে দেন। অতপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল,এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা থেকে ফিরে এসে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আইনজ্ঞ হিসাবে মুন্সিগঞ্জে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আইন ব্যবসায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় ঢাকার নবাব বাড়ীর সমর্থক রাজনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এই তথাকথিত 'খাজা পার্টির' বিরুদ্ধে 'প্রজা পার্টির' আন্দোলনে বৃহত্তর ঢাকা জেলা কফিল উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ছিল। ১৯৪৮ সনে প্রতিষ্ঠিত মুন্সীগঞ্জ এসোসিয়েশন বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি ছিলেন। তখন তিনি ঢাকা জেলা পরিষদেরও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন।

পাকিস্তান আন্দোলন ঘনীভুত হলে জনাব চৌধুরী জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সনে পূর্বপাকিস্তান পরিষদে শ্রীনগর-সিরাজদিখান থেকে মুসলিম লীগ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে নির্বাচিত হন। বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি আইন মন্ত্রনালয়, বন মন্ত্রণালয়, সড়ক ও যোগাযোগ বিভাগ এবং ভূমিমন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

এক বর্ণিল জীবনের অধিকারী এ মানুষটি ১৯৭২ সনে ১২ই মে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

শাহেদ আলী

অগ্নিযুগের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কমিউনিস্ট এবং কৃষক নেতা শাহেদ আলী ১৯০০ সালের ২ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার শুরদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিটু বেপারি। মা, বাবা, ভাই-বোনের কৃষক পরিবারে তিনি ছিলেন কিছুটা অন্যরকম।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার পর বিপ্লবী কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ কৃষক কর্মিসভায় যোগদান করতে শ্রীনগর থানার কুকুটিয়া ইউনিয়নের নাগরভাগ গ্রামে যান। সভায় যুব কৃষক শাহেদ আলীর সঙ্গে পরিচয় হয় জিতেন ঘোষের। ঐ সভা থেকেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন যুব কৃষক শাহেদ আলী। ১৯২৪ সালে জিতেন ঘোষ বার্মায় চলে গেলে শাহেদ আলী রহমান মাষ্টার ও সুশীল বাবুকে নিয়ে শ্রীনগর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জিতেন ঘোষ এবং তাঁর উদ্যোগে নিজ ইউনিয়ন কুকুটিয়াতে মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে হাজার হাজার কৃষক, জেলে, তাঁতী যোগদান করেছিলেন। ঐ সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শাহেদ আলী।

১৯৪৬ সালে ভারত উপমহাদেশে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর অন্যটি বর্গাচাষীদের তেভাগা আন্দোলন। ঐ সময় বিক্রমপুরের একদল সাম্প্রদায়িকতাবাদী নানাভাবে দাঙ্গার উস্কানি দিতে থাকে। সেখানে কৃষক নেতা শাহেদ আলীর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট কর্মীরা কয়েকমাস ব্যাপী দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে সভা, বৈঠক, বিভিন্ন ধরনের প্রচার এবং সময় সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বিবদমান দুই সম্প্রদায়ের মাঝখানে পড়ে দাঙ্গার আগুন থেকে সে অঞ্চলকে রক্ষা করেন।

১৯৪৭ সালে কুকুটিয়ার একটি কৃষক কর্মিসভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে গ্রেপ্তার হন শাহেদ আলী। ১৯৫০ সালে কৃষক নেতা শাহেদ আলী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ১৪ এপ্রিল প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার শত শত লোক নিহত হয় ও বাড়িঘর, সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। সে সময় শাহেদ আলীর নেতৃত্বে একটি 'রিলিফ টিম' ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রিলিফের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

তাঁর কাজের ফলে ১৯৭০ সালের মার্চে কতোগুলো জরুরি দাবি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা শহরে সর্বকালের বৃহত্তম শোভাযাত্রা। আড়াই মাইল ব্যাপী ওই শোভাযাত্রা ঢাকা শহরবাসীর মনে এক চমক সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি নিজ এলাকায় ফিরে এসে বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ কৃষক সমিতির এক প্রতিনিধি এবং মার্চ মাসে বেলাবোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন ১০ বছর। ১৯৭৩ সালে তিনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।

বীরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত

১৯১০ সালের ১৪ জানুয়ারী পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুল আলমকে হত্যা করেন। সামসুল আলম আলিপুর বোমার ষড়যন্ত্র মামলার তদবির করতেন। বিচারে বীরেন্দ্র দত্তের ফাঁসি হয়। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১৯ বছর। এই মহাবীর ১৮৯১ সনে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

দেশের মুদ্রণ শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তি শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় ১৯০০ সালে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যতীন্দ্রনাথ। সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কলকাতা সাউথ সুবারবন কলেজ (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ) থেকে আই এ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ পাস করেন। বিপ্লবী 'যুগান্তর দলের প্রকাশনার প্রয়োজনে ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রী সরস্বতী প্রেস লি-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। মূখ্যতঃ তাঁরই চেষ্টায় ১৯৩৬ সালে প্রথম প্রিন্টিং প্রেস ওনার্স এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। কলকাতার যাদবপুরস্থিত 'রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজি'-এর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অব মাস্টার প্রিন্টার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের বাইরে বহুবার মুদ্রণ শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমেরিকার বিখ্যাত সংস্থার প্রথম ভারতীয় ফেলো। শরৎ সমিতির সম্পাদক ও বহু সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিনয় কৃষ্ণ বসু

দুঃসাহসিক রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে অংশগ্রহণকারী এবং অত্যাচারী পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ লোম্যানের হত্যাকারী বিনয় বসু ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুরের রাইত ভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম রেবতী মোহন বসু এবং মাতার নাম নন্দ রানী। ১৯৩০ সালে লোম্যানকে হত্যা ও ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ হডসনকে মারাত্মক আহত করে সুপতি রায়ের সহচার্যে কলকাতা চলে যান। বিনয়ের সন্ধান পাবার জন্য সরকার তৎকালীন সময়ের ১০,০০০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। বিনয়ের মতো এমন একটা ছেলেকে পুনরায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন অনেকেই। শুধু তাই নয় তার বিদেশ গমনের অর্থ সংগ্রহও হলো। ঠিক হলো সে যেন সমুদ্রগামী জাহাজে ছদ্ম নামে বিদেশ চলে যান। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে এই দেশ প্রেমিক বীর যোদ্ধা ঘোষণা করলেন সে বিদেশে যাবে না এবং পরবর্তী ACTION-এও থাকেব। অতপর ১৯৩০ সালের ৮ ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং-এ হামলায় অংশগ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষমুখে দেন। মৃত্যুকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য নিজের রিভলবার দিয়ে ডান কানের উপর বা দিকে গুলি করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে এনে তার দেহ থেকে বিষ বের করা হলেও মাথার ক্ষত বেয়ে মগজ চুয়ে পরতে থাকে। এ রকম অবস্থায় বিনা ঔষধে এই ত্যাগি পুরুষ ১৯৩০ সালের ২০ ডিসেম্বর দেহত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

দীনেশ গুপ্ত

দুর্ধর্ষ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের অন্যতম নায়ক দীনেশ গুপ্তের জন্ম ১৯১১ সালের ৬ই ডিসেম্বর। তার পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের যশোলং গ্রামে। ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহী। কলেজ থাকাকালীন সময়েই তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২৯ সালে মেদিনীপুরের একটি কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। একই সালে মেদিনীপুর থেকে এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে ভর্তি হয়ে বন্দুক চালনাও শেখেন। ১৯২৯ সালে ইংরেজ অফিসারদের প্ররোচনায় ঢাকায় সাম্প্রদায়িক কলহের সূচনা হলে দীনেশের দল এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৩০ সালে ৮ ডিসেম্বর অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র সংগ্রামের অংশ হিসেবে ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিং হামলার নেতৃত্ব দেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ সরকার তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা দেন। দীনেশের প্রাণ রক্ষার্থে অগণিত সভা মিছিল হয়েছে। দেশের পত্রিকাগুলো তার প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারকে বোঝাতে চেয়েছেন। এমনকি মহাত্মাগান্ধী ও বড়লার্ট আরউইনের সাথে দেখাও করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তার প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। ৬ জুলাই দীনেশ গুপ্ত তার বাবা-মা ও দাদার সাথে শেষ সাক্ষাৎ করেন এবং তখন প্রফুল্ল মনে তাদের আনা আম, মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। সে বলেন, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আমার প্রভুর কাছে যাচ্ছি। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রইল যে মৃত্যুর পূর্বে মাতৃভূমিকে স্বাধীন দেখে যেতে পারলাম না। তার মা বলেছিলেন তিনি এই দুঃখ সহ্য করতে পারবেন না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন দাদা যেন মাকে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' গ্রন্থটি পড়ান তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন পুত্র বিয়োগের ব্যাথা কিভাবে সহ্য করতে হয়। অবশেষে ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই মঙ্গলবার তার ফাঁসি হয়। ফাঁসি মঞ্চে যাবার প্রাক্কালে সে মেজিস্ট্রেটকে উদ্দেশ্য করে বলেন আজ দেশ মাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তারপর বন্দোমাতরম ধ্বনি করতে করতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে। সে সময় তার উচ্চারিত শেষ কথা মা আমি যদি তোমার দুঃখের কারণ হয়ে থাকি আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

দীনেশের এই ত্যাগ শুধু বিক্রমপুরবাসীর জন্যই নয় সমগ্র জাতির জন্য গর্বের।

বাদল গুপ্ত

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূর্য সৈনিক বাদল গুপ্ত ১৯১২ সালে পূর্ব শিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অবনীনাথ। বাদলের অপর নাম সুধীর গুপ্ত। বিপ্লবী দল 'বি,ভি'-র সভ্য হিসেবে ৮ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে তিনি বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত বঙ্গের কারাসমুহের

www.pathagar.com

অভিকর্তা কর্ণেল সিম্পসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অভিযান চালান। এই অভিযানকে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা 'ভারান্দা ব্যাটল' (অলিন্দ যুদ্ধ) নামে অভিহিত করেছিল। অভিযানে তাদের গুলি চালনার ফলে আই,জি,কর্ণেল সিম্পসন নিহত এবং অন্যান্য কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী আহত হয়। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হলে উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হয়।

বিপ্লবীত্রয়ের গুলি ফুরিয়ে গেলে তাঁরা গ্রেফতার এড়াবার জন্য 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খান। সঙ্গে সঙ্গেই বাদলের মৃত্যু হয় এবং বিনয় হাসপাতালে মারা যান (১৩ ডিসেম্বর) মৃতপ্রায় দীনেশকে খুব চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলার পর বিচারে তার প্রাণদন্ড হয়।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম সিরাজদিখান থানায়।

বৃটিশ সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজদিখানের ইছাপুরায় আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়।

এ সময় যুবক কালীপদ অত্যাচার বিলুপ্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। পুলিশ গোপন সূত্র ধরে একজনকে গ্রেফতার করে এবং সেই ব্যক্তির সাহায্যে তিনি ধৃত হন এবং ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ১৬-২-১৯৯৩ সালে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন।

সি. আর. দাস

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট স্বরাজ আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা, বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক, আইনজীবি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বরেণ্য নেতা, যিনি স্বরাজ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে বার বার তিনি কারা জীবন বরণ করেছেন, যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য জাক জমক পূর্ণ জীবনের সকল উপকরণ পরিহার করে নির্লোভ নিরাসক্ত সাত্ত্বিকের জীবন যাপন করেছেন, অত্যন্ত দূরদর্শী বিরল বাগ্মী সেই প্রতিভাদীপ্ত সি.আর দাসের জন্ম স্বর্ণগর্ভা বিক্রমপুরের তেলিরবাগে। এই কৃতি সন্তানের জন্য বিক্রমপুর গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। চিত্তরঞ্জন দাস পরাধীন বৃটিশ যুগে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি শুধু তিনি বৃটিশের রোষানলে পতিত দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার বীর সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা দান করেছেন। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকেই আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয় তাঁর অসাধারণ আইনজ্ঞান, কুটতর্ক ও যুক্তিতে সরকারী পক্ষের আনীত অভিযোগগুলো কুয়াশার মতো উবে যেত তবুও যখন বিচারক

www.pathagar.com

বারীন্দ্র কুমার উল্লাস করের ফাঁসির আদেশ দেন তখন দেশ বন্ধু বিচারককে বলেন, আমি তাদেরকে বাঁচিয়ে আনবই। তিনি কথা রেখেছিলেন, তাদের মুক্ত করে ছেড়েছিলেন। সেই সীমাহীন অন্যায় অত্যাচার আর পরাধীনতার যুগে যে সকল বীর সংগ্রামী, অগ্নি পুরুষ বৃটিশ শাসনের জিঞ্জির ভাঙ্গতে গিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোষ ও ষড়যন্ত্র মামলায় পড়েছেন, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে তাদের সমর্থনে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এর মাঝে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা, আলীপুর ট্রাঙ্ক হত্যা মামলা -প্রতি ক্ষেত্রেই মিথ্যা মামলায় জড়ানো অভিযুক্তদের তিনি মুক্ত করেন। তাদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, পুলিন বিহারী দাস অন্যতম। খ্যাতনামা আইনজীবী সি আর দাস দেশপ্রেমিকের পক্ষে কাজ করে আইনজীবী হিসেবেই মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নেন এবং তার কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ব্যারিস্টার জীবনের এক বিরাট সাফল্য লাভ করেন। দেশপ্রেমিকের কাজ করতে গিয়ে তিনিও ভাবিত হন। কেন আমরা নিজ দেশে পরবাসী, পরাধীন। তাই তিনি ডাক দেন স্বরাজ আন্দোলনের। ব্যারিস্টারী ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের কাজে। বিরাট আয় ত্যাগ করেন। সমস্ত সম্পত্তি দান করেন দেশের কাজে। খাঁটি দেশপ্রেমিকের পক্ষেই এই কাজ সম্ভব। তাই ব্যারিস্টার সি আর দাশ হলো দেশ বন্ধু।

আইনজীবি হিসাবে ইতিহাস খ্যাত এই মহান পুরুষ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করতে গিয়ে উচ্চ বর্নের হিন্দুদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়ে ছিলেন। তাই তো কবি গুরু তার মৃত্যুতে লিখে গেছেন তার অমর কবিতা খানি–

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।

যোগেন্দ্রদাশ গুপ্ত

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন ছিলো অনুশীলন সমিতি। যোগেন্দ্রদাশ গুপ্ত ছিলেন এই অনুশীলন সমিতির সভ্য। তিনি বহু বৈপ্লবিক কাজেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিক্রমপুরের কলমায় যে প্রসিদ্ধ জমিদার বাড়িটি ছিলো অনুশীলন সমিতির আশ্রয় কেন্দ্র সেটা ছিলো তাদেরই বাড়ি।

আশুতোষ দাস গুপ্ত

গরুর গাঁ গ্রামের আশুতোষ গুপ্ত ছিলেন শ্রী পুলিন দাসের সহকর্মী, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত। তিনিও বাহ্রা ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিলেন। আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে জীবনের বহু মূল্যবান সময় তাকে জেলে কাটাতে হয়।

www.pathagar.com

আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক নেতা আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মুন্সীগঞ্জ শহরের কোটগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন বিত্তশালী তালুকদার ইব্রাহীম হোসেন। মা এলেমজান বিবি। আবদুল হাকিম কয়েকটি পাঠশালায় অধ্যয়ন করে মুন্সীগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা কলেজ থেকে তিনি আইএ পাস করেন।

পড়ালেখা শেষ করে তিনি কলকাতা গিয়ে মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সুলতান' পত্রিকায় কিছুদিন সহ-সম্পাদক রূপে কাজ করেন এবং ঘোরতর অসুস্থতা নিয়ে মুন্সীগঞ্জে ফিরে আসেন এবং ১৯২৩ সালে মুন্সীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এর সাথে সাথে তিনি ঢাকা জেলার ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান, বিক্রমপুর কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে মুন্সীগঞ্জ মুসলিম সমিতিও দেশ বিভাগের পর মোহাজের সমিতি স্থাপন করে মোহাজেরদের সহায়তা দেন।

তিনি একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। 'প্রবাসী', 'সওগাত', 'মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা', 'সাধন', 'মানবী ও মর্মবাণী', সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'ভারত বর্ষ', 'মাহেনও', ইত্যাদি পত্রিকায় তার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী ছাপা হয়। তিনি 'বিক্রমপুরের কথা' 'সাহিত্য কথা', 'চীনে ইসলাম', 'ফুলের ডালি', 'বিক্রমপুরে মুসলিম কীর্তি ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯৬২ সালে মুন্সীগঞ্জ থেকে 'গ্রামের কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং দীর্ঘদিন মৌলিক গণতন্ত্রীদের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি কাজ করে।

মুন্সীগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কাজী কমরুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, চরডুমুরিয়া এম ই স্কুল, কোটগাঁও বালিকা বিদ্যালয় তার প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। এছাড়া বহু স্কুল, মাদ্রাসা তার প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। তিনি ১৯৪৬ সাল থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন। তাছাড়া তিনি ১৯৫৯ সালে প্রাদেশিক গভর্ণরের উপদেষ্টা ও ১৯৬৩ সালে তমিজউদ্দিন খানের পরলোকগমনের পর তাঁর শূন্য আসনে নির্বাচিত হন। অকৃতদার মিষ্টভাষী সদালাপী বহু গুণের অধিকারী আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ৯৪ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালের ৪ জুলাই পরলোক গমন করেন।

www.pathagar.com

জিতেন ঘোষ

স্বনামধন্য লেখক ও রাজনীতিবিদ জিতেন ঘোষ লৌহজং এর কুমারভোগ গ্রামে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৭ সালে কাজির পাগলা অভয় কুমার তালুকদার হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২০ সালে আই, এ পাশ করার পর বি, এ ভর্তি হন। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। স্কুলে থাকাকালীন অবস্থায়ই 'যুগান্তর পার্টির' সাথে যুক্ত হন এবং বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রদের ভেতর বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করেন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেন। ১৯২৫-এ বিপ্লবী পার্টির সংগঠক হিসেবে বার্মা গমন করেন এবং সেখানে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করেন। বার্মায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৩০ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩১ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সাত বছর বিনা বিচারে আটক থাকার পর ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে ঐ বছরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন। এরপর কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। কৃষকদের সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪০ সালে ১৭ জন কমিউনিস্ট নেতার সাথে গ্রেফতার হন এবং প্রায় পর পরই মুক্তি লাভ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় চাঁদা তুলে তিনি বিক্রমপুরে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমপুরে তাঁতি ও জেলেদের কোঅপারেটিভ গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ ও শ্রম অতুলনীয়। ১৯৪৭ সালে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৩ এর শেষ ভাগে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৭ সালে রেকর্ড বর্গার অধীনস্থ আন্দোলন শুরু। হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে এই আন্দোলনে জয়যুক্ত হলে দেশের ১৫ হাজার কৃষক জমির পূর্ণ মালিকানা লাভ করে। এ সময় বেশ কিছুদিন অন্তরীণ জীবন যাপন করেন।

১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বিশেষ ভুমিকা পালন করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বস্ত্র, অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ করেন। ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠিত হলে এ সংগঠনের কৃষক ফ্রন্ট জাতীয় কৃষক লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। লেখক কর্মী হিসেবে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল 'জেল থেকে জেলে' 'গরাদের আড়াল থেকে' 'অগ্নিদিনের বার্মা' 'এই লেনিনের দেশে' 'রক্তাক্ত উষা' 'সম্মুখের বিজয়'। ১৯৭৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলকাতায় তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

জ্ঞান চক্রবর্তী

শ্রীনগর থানার দোগাছি গ্রামে ১৯০৫ সালে জ্ঞান চক্রবর্তীর জন্ম। তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদ ও লেখক। স্কুলে পড়াকালীন সময়ই বারো তেরো বছর বয়সে সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ঢাকার গোপন সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে যা 'জ্ঞান ঠাকুরের গ্রুপ' নামে পরিচিত। এসবের মধ্যেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই এস সি পাস করেন এবং ১৯৩০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এস সিতে ভর্তি হন। কিন্তু গোপন বিপ্লবী কর্মের জন্য ঐ বছরই গ্রেফতার হতে হয় তাকে। কোলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলখানায় অবস্থানের পর দুর্গম অরণ্যঘেরা বক্সাবন্দী শিবিরে প্রেরিত হন। ১৯৩৮-এ দেউলী বন্দী শিবির থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং সে বছরই কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পার্টির সভ্য পদ লাভ করেন।

১৯৩৮ সালে ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় 'গণসাহিত্য চক্র' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করেন। ঐ প্রকাশনী থেকে দশটি বই প্রকাশ হয়। তাঁর উদ্যোগে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ' গড়ে ওঠে। এই সংঘের সক্রিয় কর্মী ছিলেন রণেশ দাশ গুপ্ত, সত্যেন সেন, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ নূরুদ্দিন, অজিত গুহ প্রমুখ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। ৭২ বছর জীবনের ২৫ বছরই কেটেছে জেলখানায়, নয় বছর আত্মগোপনে। তাঁর গ্রন্থসমূহ 'ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'অতীত যুগ' 'অমর লেনিন' 'কৃষক নেতা জীতেন ঘোষ'। তিনি ১৯৭৭ সালের ১১ আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মুহম্মদ কোরবান আলী

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম কোরবান আলী লৌহজং থানার কান্দিপাড় গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল তমিজউদ্দিন আহমদ। ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ এবং ১৯৫০ সালে এল এল, বি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে কোরবান আলী ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৪ এবং ১৯৭৫ সালে কারা বরণ করেন। তিনি দেশের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। ১৯৫৪ সালে তিনি লৌহজং থেকে তদানীন্তন আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত

www.pathagar.com

হন। ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের তিনি ছিলেন চীফ হুইপ। পরবর্তী দিনগুলোতে বিভিন্ন সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব কোরবান আলী স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন।

১৯৭৩ সালে তিনি লৌহজং থেকে এমপি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৫ সালে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনাব কোরবান আলী ১৯৮৪ সালে জনদলে যোগদান করেন। পরে তিনি এরশাদ সরকারের অধীনে পাট ও বস্ত্র, ভূমি, শ্রম ও জনশক্তি, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বন্দর ও জাহাজ চলাচল মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ৬৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ওয়াজিদ আলী খান

শ্রীনগর থানার অন্তর্গত পশ্চিম মুনশা গ্রামে ১৯২৮ সালের পয়লা এপ্রিল ওয়াজিদ আলী খানের জন্ম। শৈশব ও যৌবনের প্রারম্ভ কাটে বাবা হাজী মোঃ কালু খানের কর্মস্থল ধুবড়ীতে। স্কুলের লেখাপড়া সেখানেই সম্পন্ন করেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজ হতে প্রথম বিভাগে আই এ পাস করেন। মাওলানা ভাসানীর ডাকে মুসলিম মনে স্বাধীনতার জাগরণ আনবার জন্য তিনি রংপুর জেলার গ্রামে গ্রামে কর্মী হিসেবে আন্দোলন করে বেড়ান। ১৯৪৭ এ সিলেটের রেফারেন্ডামের সময় ওয়াজেদ আলী সেখানে কর্মীর কাজ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাজশাহী কলেজ থেকে 'পলিটিক্যাল ইকনমি'তে তিনি অনার্স করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য ঢাকায় যখন ছাত্রসমাজ জোর দাবি উথাপন করে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয় তখন রাজশাহী কলেজের ছাত্ররাও এগিয়ে আসে। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এদেরই কয়েকজন অনশন ধর্মঘট শুরু করে। অনশন ধর্মঘটী ছাত্রদের একজন হলেন ওয়াজিদ আলী খান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ পড়তে পড়তে তিনি ইপি সি এস ও সি এস পি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫২ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে প্রবেশ করেন। বিক্রমপুর পরগণার প্রথম সি এস পি সদস্য হলেন ওয়াজিদ আলী খাঁন।

কর্মক্ষেত্রের বিস্তার ছিল ব্যাপকভাবে বহুস্থানে। সি এস পি প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১৯৫৫ সালে জামালপুরে এসডিও, ১৯৫৬ সালে বরিশালে এডি এম ও তারপর ময়মনসিংহে এ সি আর।

ডেপুটি কমিশনার হিসেবে খুলনা ও চট্টগ্রাম জেলায় ছিলেন। তদানীন্তন পূর্ব পাক সরকারের কৃষি বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারী পদেও কাজ করেছেন। প্রতিটি কর্মস্থলে

www.pathagar.com

নিরলসভাবে দৃঢ়তার সাথে দেশের ও সমাজের প্রগতির জন্য, উন্নয়নের জন্য, কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন।

১৯৬২ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে ডেপুটি সেক্রেটারী, এস্ট্যাবলিশমেন্ট পদে থাকাকালীন অবস্থায় বহু পদস্থ বাঙালি কর্মচারিকে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটে প্রবেশ করিয়ে বাঙলার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন। প্রবাসী বাঙালি কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য কাজ করেছেন। এই প্রচেষ্টার পথে ঊর্ধ্বতন পক্ষ থেকে বাঁধা এসেছে, বহুক্ষেত্রে বিরাগভাজনও হয়েছেন।

১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাক রেলওয়ে বোর্ডের অর্থ সদস্য এবং ১৯৬৯ সালে প্রাদেশিক অর্থ সেক্রেটারীর পদে বহাল হয়ে দৃঢ়তা ও সততার সাথে কাজ করেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রেলওয়ে বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সাথে বিধ্বস্ত রেলপথের দ্রুত সংস্কার সাধন করেন। বাংলাদেশের প্রথম রেলওয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ঘুনেধরা রেল ব্যবস্থার কাঠামোকে দ্রুত সচল ও কর্মতৎপর করে তোলার জন্য এক রিপোর্ট পেশ করেন। সারা দেশব্যাপী এক জরীপ চালিয়ে তবেই এই রিপোর্টে সিদ্ধান্ত পেশ করা হয়। তার জীবনের শেষ কর্মস্থল ছিল বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ববোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে। সততা, কর্মদক্ষতা ও দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে নিজ কর্মক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। স্বীকৃতি হিসেবে সম্মান পেয়েছেন তমঘায়ে পাকিস্তান ও সিতারায়ে কায়দে আজম উপাধির মধ্য দিয়ে। কর্মসূত্রে দেশ-বিদেশে বহু জায়গায় তিনি গিয়েছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক অর্থনীতি ও প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৬-৬৭ সালে সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ারসে (আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের কেন্দ্রে) ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৭৪ সালের ১২ই এপ্রিল লন্ডনে ছয়চল্লিশ বছর বয়সে বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী বিক্রমপুরের এই কৃতি সন্তান ইন্তেকাল করেন। স্বল্প পরিসরের জীবনে নিজের আদর্শের মূল্যবোধকে সততা, দৃঢ়চিত্ততা ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে রক্ষা করে গেছেন।

আবদুল করিম বেপারী

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক আবদুল করিম বেপারী ১৯২৯ সালে মুন্সীগঞ্জ থানার রামগোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজী কালান বেপারী। জনাব আবদুল করিম বেপারী ১৯৬২ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চার বছর ঢাকা জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও জড়িত আছেন।

www.pathagar.com

এ এইচ এম শামসুদ্দোহা

এ এইচ এম শামসুদ্দোহা টঙ্গীবাড়ী থানার সরিষাবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুলিশ বিভাগে ডিআইজি ও আইজি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর জীবন লন্ডনে কাটানোর সময় সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেন।

শামসুল ইসলাম

শামসুল ইসলাম ১৯৩২ সালে রামপাল ইউনিয়নের সুখবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম হাজী ওসমান গণি।

জনাব ইসলাম ১৯৫৮ সাল থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরিবার পরিকল্পনা সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১৯৬৬ সালে তিনি হাই কোর্টের এডভোকেট হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর পুরনো পেশায় ফিরে আসেন এবং সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর জাতীয়তাবাদী দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আজো বহাল আছেন। জনাব ইসলাম ১৯৯১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ও পরে খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব ইসলাম ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বাণিজ্য ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিক্রমপুরের ইতিহাসের ওপর বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখে সুনাম কুড়িয়েছেন। তিনি এলকার বেশ কিছু উন্নয়নমূরক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় নির্বাচনে তিনি এম, পি নির্বাচিত হন এবং বাংলাদেশ সরকারেরর ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

কে. এম. আমিনুল ইসলাম

কে, এম, আমিনুল ইসলাম ১৯৩২ সালে বিক্রমপুরের লৌহজং থানার মেদিনীমণ্ডল গ্রামের খান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মরহুম সেজাল খান। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৮০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কাজির পাগলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে করটিয়া সাদত কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আইএসসি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ও আহসান উল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উভয় স্থানে নির্বাচিত হন। তিনি নিজেকে একজন প্রকৌশলী হিসেবে

www.pathagar.com

গড়ার উদ্দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রাবস্থায় ১৯৫১ সালে তিনি খেয়াল বশে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার রিক্রুট পরীক্ষায় অংশ নেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি বিমান বাহিনীর অফিসার পদে যোগদান করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে কমিশন প্রাপ্তির পরে আমিনুল ইসলাম কর্মজীবনের সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭০-৭১ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স-এর প্রধান (গ্রুপ ক্যাপ্টেন) ছিলেন। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে তিনি ভারতে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এয়ার কমোডোর পদে পদোন্নতি পেয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের মহা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালের অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উত্তীর্ণ হন।

তারই প্রচেষ্টায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমান মেদিনীমণ্ডল গিয়ে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের মাটি কাটার কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮২-৮৭ সালে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের কাজ দ্রুত শেষ করে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করার পেছনে আমিনুল ইসলামের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়াও ঢাকা-টঙ্গীবাড়ী, বালিগাঁও-লৌহজং সড়ক উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, মাওয়া-শ্রীনগর-ভাগ্যকুল সেচ প্রকল্প ও ঢাকা-মাওয়া সড়কের ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত আবাসিক প্রকল্প গ্রহণে তার ভূমিকা ব্যাপক।

এলাকার শিক্ষা বিস্তার বিশেষ করে বিক্রমপুরের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ সরকারী করণে আমিনুল ইসলামের অবদান অপরিসীম।

১৯৮৯ সালে মুন্সীগঞ্জ মহকুমাকে স্বতন্ত্র জেলায় রূপান্তরের দাবিতে বিক্রমপুরবাসী যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও টেলিফোন সংযোগ স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি ফাউন্ডেশনের সভাপতি পদে একটানা বহাল থেকে দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন স্বর্ণ পদক '৯২ দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে একটি পরিচিত নাম। তিনি ১৯৩৯ সালের ১০ জানুয়ারি বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার দোগাছি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আহমেদ আলী। তিনি ১৯৫৪ সালে

www.pathagar.com

ঢাকা সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় প্রথম কারাবরণ করেন। এরপর তিনি স্বাধীকার হতে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত বহুবার কারাবরণ করেন। রাজনৈতিক অঙ্গণে তিনি কারাগারের পাখি হিসেবে পরিচিত।

১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীদের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিন টার্ম তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন মহানায়ক। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিবনগর হতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭২ সালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চিফ হুইপ নির্বাচিত হন। পরের বছর পুনরায় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে শ্রীনগর-লৌহজং এলাকা হতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দেশের চিপ হুইপ নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি মন্ত্রীসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালে তিনি ডেমোক্রেটিক লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি জনদল গঠন করেন এবং ১৯৮৪ সালে মন্ত্রীসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি গঠন করে দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য এবং সেই বছরই তিনি জাতীয় পার্টির মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে তিনি সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে ১৯৮৮ সালে পুনরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ উপনেতা নিযুক্ত হন। ১৯৯১ সালে রংপুরের পীরগঞ্জ এলাকা হতে উপ-নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশের বহু জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত। স্কুল কলেজসহ বহু প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন। ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী, সুদক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বি বক্তা হিসেবে সুপরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

www.pathagar.com

কে, এস, নবী

ব্যারিস্টার কে, এস, নবী বিক্রমপুরের শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কে ডব্লিউ নবী। ১৯৬০ সালে নটরডেম কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে একই বছর ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য লন্ডনে যান। ১৯৬৪ সালে ব্যারিস্টার হয়ে অত্যন্ত অল্প বয়সে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৬৩ সালে তিনি যুক্তরাজ্য ও ওয়েল্‌স-এ পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের বয়োজ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ও ৭৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের বয়োকনিষ্ঠ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন সুদক্ষ বিতার্কিক। সেন্ট্রাল ল' কলেজে জুরিসপ্রুডেন্স পড়ান। এছাড়া সি, এ, কোর্সের শেষ বর্ষের ছাত্রদেরও তিনি বাণিজ্যিক আইন পড়িয়ে আসছেন। তিনি অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। ব্যারিস্টার কে, এস, নবী দীর্ঘদিন যাবত রাজনীতির সাথে জড়িত। বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক।

মোহাম্মদ আবদুল হাই

মোহাম্মদ আবদুল হাই রাজনীতিবিদ ও সংগঠক। স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। নবীন ও উদ্যমী সমাজকর্মী। তিনি বিক্রমপুর সমিতি ও মুন্সীগঞ্জ রেডক্রসের আজীবন সদস্য। বিক্রমপুর সুধী সমাবেশ ৭৮ এর খাদ্য উপ-পরিষদের আহবায়ক হিসেবে তিনি আপ্যায়নের সমুদয় ব্যয়ভার একাই বহন করে বিক্রমপুরের সুধীজনের নিকট সমাদৃত হন। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এমপি নির্বাচিত হন। বিএনপি সরকারের আমলে নির্বাচিত এমপি ও স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি এম. পি নির্বাচিত হন।

মধুসূদন দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মধুসূদন দে। ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই প্রিয় মধুদা। এ নামেই তিনি সবার কাছে পরিচিত। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে যার অবদান অপরিসীম। সে সময়কার প্রগতিশীল সকল ছাত্র আন্দোলনের একজন নেপথ্য কর্মী ছিলেন তিঁনি। তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল তিনি সকল ছাত্র সংগঠনের কাছেই বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাই সবচে' গোপন খবরও ছাত্র নেতারা মধুদাকে জানাতে কার্পণ্য করতেন না। শুধু তাই নয়, অনেক সময় মধুদা নিজে তাঁর ক্যাশ থেকে টাকা দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। '৭০-এর নির্বাচনে তিনি গ্রামের মানুষদের সংগঠিত করে এক মহান দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধ প্রস্তুতির লক্ষ্যে ঢাকার সায়েন্স এনেক্স ভবনের পেছনে যে ট্রেনিং হয় মধুদা সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

www.pathagar.com

এভাবেই মধুদা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এই অবদানের অপরাধেই ২৫শে মার্চ রাতে তিনি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নির্মমভাবে নিহত হন। এ মহান দেশপ্রেমিকের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরের শ্রীনগর।

এ কে এ ফিরোজ নুন

রাজনীতিবিদ, লেখক ও গবেষক এ কে ফিরোজ নুন শ্রীনগরের শমস্‌পুর গ্রামে ১৯৪৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ হোসেন সুবা মিয়া।

তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। ৬ ও ১১ দফা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বারাবরণও করেন তিনি। তাছাড়া বাংলা ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি বিএনপি'র নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া রোড এন্ড হাইওয়ে ইনকোয়ারী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। রুগ্ন শিল্প কমিটির গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল-এর আহবায়ক। লেখক ও গবেষক হিসেবে প্রচুর খ্যাতির অধিকারী তিনি। প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনৈতিক দর্শনের উপর পাঁচটি বই বের হয়েছে তার। ১৯৮১ সালে হজ্বব্রত পালনসহ রাষ্ট্রীয় সফরে বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি গীতিকার, লেখক, গবেষক ও টিভির জনপ্রিয় উপস্থাপক হিসেবেও ব্যাপক পরিচিত।

নূহ-উল-আলম লেনিন

নূহ-উল-আলম লেনিন ১৯৪৭ সালের ১৭ এপ্রিল লৌহজং থানার কুমারভোগ ইউনিয়নের অন্তর্গত রাণীগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আব্দুর রহমান মাষ্টার বিট্রিশ বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। মা মোমেনা খাতুন একজন সাধারণ গৃহবঁধু হলেও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনিও কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন।

এক সংস্কার মুক্ত প্রগতিশীল পরিসরে নূহ-উল-আলম লেনিনের জন্ম। বিক্রমপুর অঞ্চলের যে মুষ্টিমেয় মুসলমান পরিবার আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক প্রাপ্ত হয় লেনিন এর পরিবার তার অন্যতম।

নূহ-উল-আলম লেনিনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ হয় ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মনগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন

www.pathagar.com

হয়ে ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে বি,এ, অনার্স ও এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর আইন ও সমাজ বিজ্ঞানের কোর্স সম্পূর্ন করলেও রাজনৈতিক কারনে ঐসব বিষয়ে আর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

লেনিন কিশোর বয়স থেকেই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত হন। লেখালেখিও তার কিশোর বয়সেই শুরু। কিশোর বয়সে তিনি 'খেলাঘর' সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। নিজ গ্রামে 'সবুজের আসর' নামে খেলাঘরের শাখা গঠন ও লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। নাটক, আবৃত্তি ও সঙ্গীত ছিল তার প্রিয় বিষয়। ব্রাহ্মনগাঁও হাইস্কুলে অধ্যয়ন কালে ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৬৩ সালে রুজদি হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বিক্রমপুর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা লেনিন এই সম্মেলন থেকে ছাত্র ইউনিয়নের আঞ্চলিক কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়ন মহকুমা সম্মেলনে তিনি মহকুমা কমিটির সদস্য হন। ১৯৬৪ সালে শিক্ষা আন্দোলনে বিক্রমপুর অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। এই সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সহপাঠী ছাত্রদের নিয়ে দাঙ্গা বিরোধী জনমত গড়ে তোলার ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৪ সালের সম্মিলিত বিরোধী দল কপ এর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করেন।

১৯৬৫ থেকে ৭১ পর্যন্ত ঢাকার প্রতিটি ছাত্র-গন আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন। তিনি ১৯৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন। ১৯৬৭ এর পর থেকে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্মকান্ডের সংগঠক হিসেবে আন্দোলন সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে তিনি সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে বেড়ান এবং ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুতে বিশেষ অবদান রাখেন। উনসত্তরের গন অভ্যুত্থানের সময় নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই বছর তিনি ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সালে ছাত্র ইউনিয়নের দ্বাদশ সম্মেলনে সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৭২ সালের ত্রয়োদশ সম্মেলনে সহ-সভাপতি এবং ১৯৭৩ সালে চতুর্দশ সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের যৌথ প্যানেলে নূহ-উল-আলম লেনিন সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়ন লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করলে বাকশালের অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগের অন্যতম কর্মকর্তা ১৯৭৫ -৭৬ সালে কঠোর সামরিক শাসন ও দমন পীড়নের মধ্যেও

www.pathagar.com

মাথায় গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে নূহ-উল-আলম লেনিন অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে জাতির জনকের হত্যার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সংগ্রাম সংগঠিত করেন। নূহ-উল আলম লেনিন মুক্তিযুদ্ধে ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর অন্যতম সংগঠক হিসেবে বৃহত্তর ঢাকা জেলার কর্মকান্ড পরিচালনা করেন।

লেনিন ১৯৬৯ সালে গোপন কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে তিনি বৃহত্তর ঢাকা জেলা পার্টির সম্পাদক ও কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে লেনিন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ১৯৮৮ সালের প্রেসিডিয়াম সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে জেনারেল জিয়া তাকে গ্রেফতার করে। জিয়া ও এরশাদ আমলে সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নূহ-উল-আলম লেনিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং একই বছর মে মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। সমগ্র জীবন তিনি অন্য কোন পেশায় না গিয়ে রাজনীতির সার্বক্ষনিক কর্মী হিসেবে ত্যাগ তিতিক্ষা ও দুঃখ দারিদ্যের মধ্যে জীবনাযাপন করেন। বর্তমানে রাজনীতির পাশাপাশি একটি ঔষধ কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। সার্বক্ষনিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য বেশি সময় না পেলেও নূহ-উল-আলম লেনিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে, আত্মগোপনে ও জেলে বসে পড়াশুনা ও লেখালেখি করেছেন। কোন কোন লেখা ছদ্ম নামেও প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তার লেখা ও সম্পাদিত -প্রায় ডজন খানেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'তেভাগা সংগ্রাম' (সম্পাদিত) ' আসামীর অন্বেষা' (প্রবন্ধ সংকলন), 'সূর্য করপুটে' (কবিতা সংকলন), 'একুশ শতকে অভিযাত্রা' (সম্পাদিত ফটোঅ্যালবাম), 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ' কনজুম পাহাড়ে শান্তির ঝরনাধারা' (সম্পাদিত), 'স্বাধীনতা ও উত্তরকাল (প্রবন্ধ সংকলন), ব্রাত্যজন কথা (প্রবন্ধ সংকলন), 'সমুখে শান্তি পারাবার' (প্রবন্ধ), ''শান্তির পথযাত্রী' (সম্পাদিত), 'Symbol of peace(সম্পাদিত), 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড প্রতিবাদের প্রথম বছর (যুগ্ম রচনা), এবং 'সর্বব্যাপী বঙ্গবন্ধু' (প্রবন্ধ সংকলন) ইত্যাদি। দেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিকগুলোতে তিনি কলম লেখেন। তাঁর সম্পাদনায় 'পথরেখা' নামক 'সমাজ-অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হচ্ছে।

নূহ-উল-আলম লেনিন ১৯৭২ সালে ছাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ১৯৭৩ সালে বার্লিন এ অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব যুব উৎসবে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রতিনিধিদলের অন্যতম নেতা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির আমন্ত্রনে সস্ত্রীক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে কোলকাতা এবং ৯৬ সালে নেপালের কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কৃষক সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেন।

লেনিনের স্ত্রী কলেজ শিক্ষিকা কাজী রোকেয়া সুলতানা সাবেক ছাত্রনেত্রী, শামসুন্নাহার হলের প্রথম ভিপি এবং একজন খ্যতিমান মুক্তিযোদ্ধা। তাদের দুই কন্যা সন্তান, অধ্যয়নরত।

আলহাজ্ব মকবুল হোসেন

জনাব মকবুল হোসেন ১৯৪৮ সালে বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব মোঃ আলী সরকারী চাকুরীজীবী ছিলেন। পরবর্তীকালে অবসর জীবনে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন।

জনাব মকবুল হোসেন আরিয়ল স্বর্ণময়ী হাইস্কুল হতে মেট্রিক, জগন্নাথ কলেজ হতে এইচ. এস.সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজকল্যাণে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এল. এল. বি ডিগ্রীও লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি লেখাপড়া ছাড়াও ছাত্র রাজনীতিতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ষাট দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তুখোড় ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল ব্যাপক। জনাব মকবুল হোসেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রলীগের পর যুবলীগ পরবর্তীতে আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি দীর্ঘদিন কারা নির্যাতন ভোগ করেন। '৯৬ সালেও তিনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। তিনি '৯১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাসের বিপক্ষে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরবর্তীতে সর্বদলীয় প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর পক্ষে দলীয় নির্দেশে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন। ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর এলাকা হতে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৬৮ সালেই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। শূন্য থেকেই শুরু। ঠিকাদারী দিয়ে শুরু করেন তাঁর পথ চলা। পরে পরিবহণ ব্যবসা। এভাবে আস্তে আস্তে গড়ে তুলেছেন একটি ব্যবসা-সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্য তিনি একদিনে গড়ে তোলেননি। এর সাথে মিশে আছে তাঁর লক্ষদিনের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতা।

www.pathagar.com

'৬৮ থেকে '৯৮ এই তিন দশকে তিনি একে একে গড়ে তুলেছেন পান্না টেক্সটাইল (স্পিনিং) মিল্‌স লিঃ, মোনা গ্রুপ অব গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রিজ, এ্যামিকো ল্যাবরেটরীজ লিঃ, মোনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ, মোনা গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, মোনা প্রোপারটিজ কমপ্লেক্স, মোনা ওভারসীজ কোম্পানী প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান।

তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। তাঁর বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে গেছেন সাফল্যের শীর্ষে। তিনি একজন বিশিষ্ট সফল বীমা ও ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তা। সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ, পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স কোঃ লিঃ, সন্ধানী ক্রেডিট কো অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ প্রভৃতি কোম্পানীর সাথে তিনি জড়িত। জনাব মকবুল হোসেন একজন সংবাদপত্রসেবী। তাঁর সম্পাদনায় ও মালিকানাধীনে দৈনিক আল-আমিন প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিতভাবেই। জনাব হোসেন একজন শীর্ষস্থানীয় রপ্তানীকারক এবং একজন সি আই পি। বাংলাদেশ শিল্প ও বনিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত।

জনাব মকবুল হোসেন এম পি একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও শিক্ষা উদ্যোক্তা। তিনি বহু স্কুল, কলেজ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্বঃ কলেজ, নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা মহিলা কলেজ, ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা ষ্টেট কলেজ, অক্সফোর্ড কলেজ, কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় কলেজ, জরিনা সিকদার বালিকা বিদ্যালয় কলেজ, মেহেরুন্নিসা কলেজ, মোহাম্মদপুর গালর্স হাই স্কুল, রহমত এ আলম ইসলামিক মিশন (এতিমখানা ও মাদ্রাসা), আদর্শ ইসলামিয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। তিনি মোহাম্মদপুর ল' কলেজ এর প্রতিষ্ঠাতা। সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই প্রচুর স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তন্মধ্যে শের-ই-বাংলা জাতীয় স্বর্ণপদক, বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী স্বর্ণপদক, বিজয় দিবস স্বর্ণপদক, শহীদ বদিউজ্জামান স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ উন্নয়ন সংস্থা স্বর্ণপদক উল্লেখযোগ্য।

জনাব মকবুল হোসেন আধুনিক পরিবহণ শিল্পের পথিকৃত। আজ দেশে অত্যাধুনিক বিলাসবহুল সুপিরিয়র কোচ, এসি কোচ প্রচলনে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবহণ সেক্টরের মান উন্নয়নে তিনি ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন। রাজধানীতে যানজট নিরসনে মেট্রো সার্ভিস, দ্বিতল বাস সার্ভিসের প্রচলন তাঁরই অবদান।

উল্লেখ্য, জনাব মকবুল হোসেন এর সহধর্মিনী মিসেস গোলাম ফাতেমা তাহেরা খানম মোনা মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ জাতীয়

www.pathagar.com

সমবায় ইউনিয়ন এর পরিচালক, মোনা গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দৈনিক আল আমিনের নির্বাহী সম্পাদক সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। মিসেস হোসেন মোহাম্মদপুর ল' কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, এছাড়া তিনি কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। জনাব মকবুল হোসেন পারিবারিক জীবনে একজন সফল মানুষ। তিনি তিন পুত্র এক কন্যার জনক। তার তিন পুত্রই বিদেশ থেকে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেছে। ছোট মেয়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুলে অধ্যয়নরত। জনাব মকবুল হোসেনের অবসর বলে কিছু নেই। মানুষের সেবার মাধ্যমে দিন শুরু হয়, আর মানুষের সেবার মধ্যেই তাঁর রাত আসে। এটাই তাঁর একমাত্র আত্মতৃপ্তি। এ তৃপ্তিই তিনি আমৃত্যু পেতে চান।

শহিদ নজরুল

ঊনিশ শ' ঊনসত্তর। সারাদেশ পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠছে। ঢাকা তখন মিছিলের শহর। এমনি এক মিছিলের সাহসী সৈনিকের নাম নজরুল ইসলাম। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর মুন্সিগঞ্জ সদর থানার রমজান বেগ গ্রামে তার জন্ম। বাবা আক্রাম আলী ও মা আছিয়া খাতুন।

ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত নজরুল ২ মার্চ বলাকা ভবনে অবস্থিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কার্যালয় থেকে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে পতাকা উড়িয়ে কলাভবনের ছাত্র জমায়েতে আ. স. ম. আব্দুর রবের হাতে তুলে দেন। ৩রা মার্চ তিনি স্বাধীন বাংলার ইস্তেহার পাঠ করেন এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে যুদ্ধ প্রস্তুতির লক্ষ্যে ৪ ট্রাক কেমিক্যাল উদ্ধার করে। এসময় তার সহযোগি ছিল ছাত্র নেতা খসরু, সেলিম ও মন্টু। ৪ঠা মার্চ সহকর্মীদের সাথে নিয়ে একটি আধা সামরিক গাড়ি ও ৮টি সরকারি কারে আগুন ধরিয়ে দেয়। ৬ মার্চ প্রতিরোধ আন্দোলন বেগবান করার লক্ষ্যে সহযোগিদের নিয়ে বায়তুল মোকাররম, নিউমার্কেট ও নবাবপুরের সবগুলো বন্দুকের দোকানে বিক্ষিপ্ত অপারেশন পরিচালনা করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ৮ মার্চ ৪টি মিলিটারি জিপ ও দু'টি ট্রাক সিজ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে বি.এল.এফ. গজারিয়া থানা কমান্ডার হয়ে নিজস্ব এলাকা বাউসিয়ায় প্রবেশ করেন। এরপর তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে চলতে থাকে গেরিলা আক্রমণ। দাউদকান্দি ফেরিঘাট থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে এক যুদ্ধে সাতজন শীর্ষ স্থানীয় হানাদার নজরুলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু শত্রু পক্ষে আচমকা গ্রেনেড নিক্ষেপে নিহত হয় এই মহান মুক্তিযোদ্ধা।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ্-হিল-বাকী সাজু

এক অকুতোভয় সৈনিকের নাম আব্দুল্লাহ-হিল-বাকী। দুই পাকিস্তানের ব্যবধান তার মনকে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করে। এই ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার স্বপ্নে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে ছাত্র রাজনীতিতে। আ. স. ম. আব্দুর রব, ডলি, মমতাজ, ইনু, শাহজাহান সিরাজ, মোঃ আরিফ ও নূরে আলম সিদ্দিকীর মতো তৎকালীন তুখোড় ছাত্র নেতাদের সাথে ছিল তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

১৯৭১ সালে মার্চ এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে গড়ে তুলেন বাংলাদেশ আত্মঘাতি সমিতি, যার দ্বিতীয় প্রধান ছিলেন বাকী নিজে। এসময় তার দল ভূতপূর্ব লাটভবন আক্রমণ করে, ভবনের কিছু অংশ ক্ষতি সাধন করে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাকীর জীবনে আসে সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ। দেশ-মাতৃকার জন্য কিছু একটা করার এই তো সময়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে একের পর এক সাফল্যজনক অভিযানে পশ্চিমা ম্যালেটারিদের পাগল করে তোলে। হঠাৎ একদিন ধরাও পরে। কিন্তু অপূর্ব কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে আসে। জীবনের ঝুকি নিয়ে একের পর এক লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হেনে বাকী ওদের কাছে এক আজগুবী বস্তুতে পরিণত হয়। কোন এক অভিযানে যাওয়ার সময় হঠাৎ আক্রমণে বাকী আহত হয়ে মিলেশিয়ার হাতে ধরা পড়ে। সাথীদের নাম না বলাতে বাকীর উপর চলে অমানুষীক নির্যাতন। নির্যাতনের এক পর্যায়ে দু'চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে চির নিদ্রায় শায়িত হন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। বাকীর এই আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে তাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এ সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আব্দুল্লা-হিল-বাকী ১৯৫০ সালের ১৯ জুন লৌহজং উপজেলার অন্তর্গত টেউটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আব্দুল বারী ও মাতার নাম আমেনা খাতুন।

সালাউদ্দিন বাদল

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সালাউদ্দিন বাদল ১৯৫২ সনের ১৩ নভেম্বর নানা বাড়ি আবদুল্লাহপুরের সালিমাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস মুন্সিগঞ্জ থানার পঞ্চসার সর্দারপাড়া। বাবা মরহুম শফিউদ্দিন আহাম্মদ ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি। তৎকালীন সময়ে বিক্রমপুর এবং ঢাকায় ছিল তার সুপরিচিতি।

জনাব সালাউদ্দিন বাদল বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। তিনি জয় বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্য জোট ও আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি, ঢাকা

www.pathagar.com

মহানগর আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক, আব্দুল্লাহপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি, শহীদ স্মৃতি দাতব্য চিকিৎসালয়, উয়ারী ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, উয়ারী উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান, ঐতিহ্যবাহী ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ভাইস চেয়ারম্যান, সর্দারপাড়া জামে মসজিদ ও মদন মহন জামে মসজিদের সভাপতি, সিলভার ডেল প্রিপ্রারেটরী স্কুলের নির্বাচিত সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি, জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, উয়ারী যুব সংঘের সভাপতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি তার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এস, বি এন্টারপ্রাইজের চেয়ারম্যান ও ট্রাইমেক্স ইন্টারন্যাশনালের ডাইরেক্টর।

জনাব বাদল বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে দিল্লী উৎসব ১৯৯৮ এ যোগ দেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভারত, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তান সফর করেন।

সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী সালাউদ্দিন বাদলের সৃজনশীল কর্মের মধ্যে বাংলাদেশ বেতারে নবীন কণ্ঠ ও শিক্ষার্থীদের আসরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদনা, নাটক উপস্থাপনা ও পরিচালনা, শরৎচন্দ্রের ঋণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষ্ট মাষ্টার নাটকের নায়ক চরিত্রে অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তিনি প্রতি বছর 'পিতা' নামে একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণিকা সম্পাদনা করে আসছেন। লড়াই ও 'সূর্য শপথ' নামে তিনি আরো দু'টি স্মরণিকা সম্পাদনা করেন। 'জনতার জয়', 'জনতার নৌকা', 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' অডিও ক্যাসেট পরিচালনা ও গ্রন্থনা করে তিনি সুধী মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, '৯৬ এর নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি 'জনতার নৌকা' ক্যাসেটটি সারা দেশে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়।

সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কাজে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি আমরা সূর্যমূখী সম্মাননা পদক ২০০০, কথা লোলিত কলা একাডেমী পদক ১৯৯৯, ঢাকা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক স্বর্ণপদক, কবি গোবিন্দ স্মৃতি পদক ও বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে বিশেষ সম্মাননা পদক ও সার্টিফিকেট লাভ করেন। জনাব বাদল ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী, সদা হাস্যময় উচ্ছল প্রাণের একজন প্রাণবন্ত মানুষ।

সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি ১৯৬২ সালের ৩ রা নভেম্বর লৌহজং থানার শামুরবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ নূরুল ইসলাম খান।

www.pathagar.com

সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি ১৯৭৮ সনে ধানমন্ডি সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ১৯৮০ সনে হলিক্রস কলেজ থেকে এইচ, এস, সি, ১৯৮৩ তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে অনার্স এবং ১৯৮৪ তে একই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৯৩ থেকে ৯৪ পর্যন্ত ঢাকা ইস্পাহানি স্কুল এণ্ড কলেজে শিক্ষকতা করেন। এছাড়া ১৯৯৫-৯৬ এ দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অরগানাইজার এবং ১৯৯৭-৯৮ এ একই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও দরিদ্র গ্রামীন মহিলা সংগঠনের সভাপতি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহংকারী, সদালাপী ও একজন পরশ্রমী মানুষ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি ইতিমধ্যেই রাজনীতির অঙ্গনে তার সুদৃঢ় আসন তৈরী করে নিতে সক্ষম হয়েছেন এবং অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিপুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মাহী বি. চৌধুরী

তরুণ রাজনীতিবিদ মাহী বি. চৌধুরী বিক্রমপুরের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও বাবা বিএনপির প্রভাবশালী নেতা বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডাঃ বি. চৌধুরী।

মাহী বি. চৌধুরী মুন্সীগঞ্জ-১ আসনে উপ-নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন বিনয়ী ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ।

www.pathagar.com

শিল্প-বাণিজ্য

ব্যবসা বাণিজ্যে বিক্রমপুরের সুনাম অনেক দিনের। এই অঞ্চলের মানুষদের সমগ্র বাংলাদেশে রয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে এদের ব্যবসায়ীক অগ্রগতি। নিরলস শ্রম ও মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহারে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ক্ষেত্রে রয়েছে এ অঞ্চলের মানুষের অগ্রাধিকার।

কলমার সিনহা পরিবার প্রতিষ্ঠা করেছে এদেশের একটি নামকরা ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দি একমি, যে প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রকাশনা শিল্পে বিক্রমপুরের অবদান অসামান্য। প্রখাত শিশুসাহিত্যিক প্রয়াত নাসীর আলী সিকদার নওরোজ সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য মানের প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশনা করে এদেশের প্রকাশনার জগতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বর্তমানে তার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় ইফতেখার রসুল জর্জ ও এনায়েত রসুল সুনামের সাথে প্রকাশনা শিল্পে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রকাশনা শিল্পে বর্তমানকালে বিক্রমপুরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম বিশাকা প্রকাশনী। সংস্থার সত্তাধিকারী জনাব শাহজাহান বাচ্চু অত্যন্ত ঝুকি নিয়ে শুধুমাত্র কবিতার বই প্রকাশ করে যাচ্ছেন। এ যাবত তার প্রকাশনার সংখ্যা দুই শতাধিক।

'শিখা প্রকাশনী' বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনী সংস্থা। টঙ্গীবাড়ি থানার ধামারন কাজী বাড়ির মরহুম কাজী শাহজাহান ১৯৬২ সনে এই প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে- নজরুল ইসলাম বাহার ও শামীম বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা করছেন। সৃজনশীল এই প্রকাশনী থেকে এযাবত ২১০টির মতো বই প্রকাশিত হয়েছে।

কোল্ড ষ্টোরেজ শিল্পে বিক্রমপুরবাসীরা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিরাট একটি শিল্প বেল্ট গড়ে তুলেছেন। পোষাক শিল্পেও বিক্রমপুরের অবদান অসামান্য। ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর রহমান ও ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল হক মোল্লা যৌথভাবে একটি গার্মেন্টস্ শিল্প গড়ে তুলেছেন ঢাকার চৌধুরী পাড়ায়। ঢাকার কয়েকটি বিখ্যাত টেইলারিং প্রতিষ্ঠান যেমন, ষ্টার টেইলার্স, সানমুন টেইলার্স বিক্রমপুরবাসীর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান।

খাদ্যশিল্পেও বিক্রমপুরের সফলতা অসামান্য। আন্তর্জাতিকমানের এবি বিস্কুট ফ্যাক্টরীর মালিক জনাব ইসমাইল খানের বাড়ি বিক্রমপুর। উল্লেখ্য, গুণগত মান ও উৎকৃষ্টতার জন্য এবি বিস্কুট আন্তর্জাতিক বিস্কুট ট্রফি লাভ করেছে। রাজধানীর সবচেয়ে নামী খাবার হোটেল কস্তুরীর মালিক জনাব আলী আহম্মেদ খান বিক্রমপুরের সন্তান। বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভান্ডার দেশের মিষ্টি জগতের উল্লেখযোগ্য নাম।

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ে জনাব আব্দুল হালিম প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে বিক্রমপুরের সবচেয়ে সফল ও গৌরবোজ্জল অবদান দেশের বস্ত্রশিল্পে। নতুন ও পুরাতন কাপড়ের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ইসলামপুর। এখানকার সিংহভাগ সফল ব্যবসায়ীর বাড়ি বিক্রমপুর।

সমগ্র বাংলাদেশের লঞ্চ ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শক ওয়াহিদ এন্ড কোং স্বাধীন নামের একটি ছোট লঞ্চ দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেন। এরপর আসেন কাদির ব্রাদার্সের সালাম চৌধুরী, আফসার উদ্দিন ব্যাপারী, গাজী শামসুল হক, খান জেনারেল নেভিগেশনের দৌলত খান, আবুল হোসেন খান।

এলুমিনিয়াম ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ঢাকার মিটফোর্ড এলাকা। এখানকার নব্বই শতাংশেরও বেশী ব্যবসায়ির বাড়ি বিক্রমপুর। এলুমিনিয়াম শিল্পে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে ক'জন ব্যবসায়ী পথিকৃতের ভুমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে শ্রীনগর থানার কোলাপাড়া গ্রামের অধিবাসী ওয়াহিদ মিয়া, হাজী মোঃ মোহসীন মিয়া ও আলহাজ্ব আবদুল লতিফ মিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিক্রমপুরের কাসা পিতল ও স্বর্ণ শিল্পীদের সুনাম সুপ্রাচীনকাল থেকেই। আজও ঢাকা শহরে ও তার আশপাশের কাসা পিতল ও স্বর্ণ শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক কারিগরই বিক্রমপুরের।

আব্দুর রব চৌধুরী

এ. রব চৌধুরী বাংলাদেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী। একসময় তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি ঢাকাস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত মিঃ ডেভিড এন. মেরিলের সাথে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শিল্পায়নের সম্ভাবনা নিয়ে মত বিনিময় করেন। প্রথিতযশা এ শিল্প ব্যক্তিত্বের গ্রামের বাড়ি সিরাজদিখান থানার কুসুমপুর গ্রামে।

মোঃ হাবিবুর রহমান

মোঃ হাবিবুর রহমান একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি এ,বি, বিস্কুট কোম্পানী লিঃ, আজাদ ব্রেড এণ্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ এবং আজাদ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকার চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

আলহাজ্ব মোঃ হাবিবুর রহমান একজন নিবেদিত প্রাণ সমাজ সেবক। তিনি মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি, বিক্রমপুর ফাউণ্ডেশন এর কর্মকর্তা এবং বিক্রমপুরের সমাজ সেবা মূলক কাজে আন্তরিকতার সাথে জড়িত। মুন্সীগঞ্জ জেলার উন্নয়নেও তিনি দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে যাচ্ছেন।

এ কে এম শামসুল হক

ইস্টার্ণ নিউজ এজেন্সির অন্যতম পরিচালক শিল্পপতি জনাব এ কে এম শামসুল হক ১৯২৫ সালে বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাল্যকালের শিক্ষা মুন্সীগঞ্জে সমাপ্ত হয়। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি কলকাতা ফায়ার সার্ভিসে যোগ দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিসে যোগদান করেন।

১৯৫৮ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ী মহলে খুব পরিচিত হয়ে উঠেন তিনি। তার ব্যবসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইম্পোর্ট, এক্সপোর্ট, ইণ্ডেনটিং, সাপ্লাই ও কন্সট্রাকশন প্রভৃতি। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। সেগুলো হলো, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ইরাক, সৌদিআরব, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ভারত, ইটালী, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সিঙ্গাপুর, বেলজিয়াম, জার্মানী, স্পেন ও পৃথিবীর আরো অনেক দেশ। জনাব হক আমেরিকা ও ইইসিভুক্ত দেশগুলোতে ১৯৭৮ সালে সরকারী ডেলিগেট হিসেবে সফর করেন।

এনার একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব শামসুল হক আরো বহু কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও পরিচিত। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম খান বাদল

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম খান বাদল ১৯৩৫ সালের ৬ই জানুয়ারী মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার মৌছামান্দ্রা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম আঃ ওয়াহাব খান। ছাত্রাবস্থায় ১৯৫৩ সালে জনাব নজরুল ইসলাম খান বাদল তার পিতাকে হারান, বড় ছেলে হিসাবে পিতার অবর্তমানে তাকে সংসারের হাল ধরতে হয়। তদানিন্তন ইষ্ট পাকিস্তান জুট মার্কেটিং কর্পোরেশনে তিনি পার্সেজিং অফিসার হিসাবে কর্ম-জীবন শুরু করেন, ১২ বছর চাকুরী করার পর তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় আত্ম-নিয়োগ করেন। সততা ও নিষ্ঠার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আস্তে আস্তে ব্যবসায় উন্নতি করেন এবং গড়ে তোলেন এক বিশাল যাত্রীবাহী, অয়েল টেংকার,

www.pathagar.com

কোষ্টাল সহ সমুদ্রগামী কার্গোভেসেলের বহর। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট শিপিং ব্যবসায়ী হিসাবে সু-পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

জনাব নজরুল ইসলাম খান বাদল ছাত্রাবস্থায় একজন বিশিস্ট ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন, তিনি একাধারে একজন ক্রীড়া সংগঠক, বিশিস্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সনে মুন্সীগঞ্জ-২ (লৌহজং-সিরাজদিখান) নির্বাচনী এলাকা হতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়াও তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব সদস্য, বাংলাদেশ লায়ন্স ফাউণ্ডেশনের আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ মুক ও বধির সমিতির আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য, ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য ও বর্তমান সভাপতি, ঢাকা মহানগর ফুটবল ক্লাব সমিতির এবং বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান সহ-সভাপতি। স্থানীয়ভাবে তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার সর্ব বৃহৎ সংগঠন "মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি"র আজীবন সদস্য ও ১৯৮৯-৯৮ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ঐতিহাসিক বিক্রমপুরের ঐতিহ্যবাহী "বিক্রমপুর ফাউণ্ডেশন" এর আজীবন সদস্য ও বর্তমান সহ-সভাপতি।

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম খান বাদল সমাজসেবা মূলক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে সফলতার জন্য এবং বিশিষ্ট সংগঠক হিসাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে স্বর্ণপদক ও সম্মান সূচক ক্রেষ্ট প্রাপ্ত হন। সমাজসেবা মূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯১ সনে তিনি "অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক", বিশিষ্ট সংগঠক হিসাবে ১৯৯২ সনে "মাওলানা ভাসানী স্বর্ণ পদক" প্রাপ্ত হন।

এছাড়াও তিনি মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সমিতি কর্তৃক স্বর্ণ পদক এবং সমিতির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে মুন্সীগঞ্জ জেলাবাসীর প্রতি অনবদ্য সেবামূলক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা কর্তৃক "বিক্রমপুর রত্ন" খেতাব প্রাপ্ত হন ও সমিতির সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন।

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম খান বাদল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি হিসাবে ১৯৯৮ সনে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এশীয় ফুটবল অনুর্ধ ১৯ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ফুটবল দলের দল প্রধান হিসাবে শ্রীলংকা সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নৌ-নীতি কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ যাত্রীবাহী নৌ-যান মালিক সমিতির সদস্য, বাংলাদেশ অয়েল টেংকার মালিক সমিতির সদস্য, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

কার্গোভেসেল মালিক সমিতির সদস্য এবং কোষ্টাল শীপ ও ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি। ঢাকা মহানগর ফুটবল ক্লাব সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি কর্তৃক "বিক্রমপুর রত্ন" খেতাব প্রাপ্ত হওয়ায় ৪-৩-৯৯ তারিখে লালকুঠি মিলনায়তনে ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। তিনি ১৯৯৪ সনে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন, পারিবারিক জীবনে তিনি ৩ পুত্র সন্তানের জনক। সবকিছু মিলিয়ে তিনি একজন সফল ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি।

আলী আহম্মেদ খান

একজন রুচিশীল ব্যবসায়ীর নাম আলী আহম্মেদ খান। তিনি ১৯৩৯ সালের ৫ জানুয়ারী লৌহজং থানার শামুরবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোসলেহ উদ্দিন খান।

জনাব আলী আহম্মেদ লৌহজং স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে জগন্নাথ কলেজ থেকে লেখাপড়া শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মজীবন শুরু করেন। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে কিছুদিন মালবাহী লঞ্চ ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু এ ব্যবসায় সার্বক্ষনিক লেগে থাকতে হয় বলে খুব বেশী দিন এ ব্যবসার সাথে তিনি জড়িত থাকতে পারেননি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লিভার ব্রাদার্সে চাকুরীতে থাকাকালীন তাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতে হতো। এ সময় তাকে বিভিন্ন রেস্তোঁরায় খাবার গ্রহণ করতেও হতো। সেসব রেস্তোঁরার খাবার মান তাকে খুবই মর্মাহত করতো। ঐ সময়েই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন জীবনে কখনো সময় সুযোগ এলে একটি উন্নতমানের খাবার ব্যবসা করবেন। মোটামুটি এটাকে তিনি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালের জুন মাসে ঢাকার ১৫ পুরানা পল্টনে 'কস্তুরী' নামে একটি ছোট্ট রেস্তোরা করেন। রেস্তোঁরার মান উন্নত রাখার জন্য তিনি নিজেই এর দেখাশুনা করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই 'কস্তুরী' রুচিশীল মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একারণে তিনি নিজেও এ ব্যবসায় আরো বেশী মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

একজন রোটারিয়ান হিসেবে তিনি এ ব্যবসাটিকে সেবা মূলক কাজ হিসেবে মনে করেন। তার এ মানসিকতার কারণেই ১৯৮০ সালের ছোট্ট সেই কস্তুরী ৪/৫ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের ভোজন বিলাসী মানুষদের কাছে সুনাম ও খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়। এই সুনামের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের কুটনীতিবিদরা যেমন ঃ আমেরিকান এম্বেসীর মাননীয় এইচ, বি শেফার্ড বাংলাদেশ থাকাকালীন তার মিশনের সদস্যদের নিয়ে বহুবার কস্তুরীর খাবার দিয়ে লাঞ্চ সেরেছেন। প্রখ্যাত কুটনীতিবিদ ও প্রাক্তন অষ্ট্রেলিয়ান গভর্ণর জেনারেল স্যার ইষ্টিফেন নিনিয়ান ও লেডি নিনিয়াম তাদের বাংলাদেশ সফরের সময় প্রায়ই কস্তুরীতে খাওয়া দাওয়া সারতেন। অন্যান্য বিদেশী ও ভ্রমণকারীরাও কস্তুরীতে

www.pathagar.com

প্রায়ই খাওয়া দাওয়া করেন। এমনকি হোটেল সোনারগাঁ, শেরাটনে অবস্থানরত বহু বিদেশী মেহমান কস্তুরীর বাঙ্গালী খাবার খেয়ে থাকেন। বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী খাবার বিদেশীদের সামনে তুলে ধরার মূলে পাইওনিয়ার আজকের এই কস্তুরী। বিক্রমপুরের লোক মূলত ভোজন বিলাসী। জনাব আলী আহম্মেদ মনে করেন এটা তার ব্যবসা সাফল্যের অন্যতম কারণ। এছাড়া পরিস্কার পরিচ্ছনতা, রুচিশীল খাবার, মেহমানদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং মানুষকে অন্তর দিয়ে সন্মান করাও এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের আরো কিছু কারণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন গত বিশ বছরেও এ রেঁস্তোরায় কারো সাথে কোন তর্ক বিতর্ক ও বাক বিতন্ডা হয়নি। বরং বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের দেশী-বিদেশী মেহমান এ প্রতিষ্ঠানের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এর মূল কারণ মালিক পক্ষের আত্মীয় স্বজনরাই এর মূল দেখাশুনার দায়িত্বে রয়েছেন।

জনাব আলী আহম্মেদ একজন ভদ্র, মার্জিত ও বিনয়ী স্বভাবের মানুষ। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন মানুষকে আপন করে নেয়ার ক্ষমতা রাখেন।

আব্দুল হাই খান

বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজ সেবক জনাব আব্দুল হাই খান ১৯৪০ সালে ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীনগর থানাধীন বাসাইলভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আব্দুল জলিল খান।

বার্মা ইস্টার্ণ এজেন্সীর মাধ্যমে পেশাজীবন শুরু। এরপর বি, এ, ডি, সি ও জনতা টোবাকোর ডিষ্ট্রিবিউটর। আল আমিন কোল্ড ষ্টোরেজ, জনতা শিপিং লাইনস্ লিঃ সহ বহু ব্যবসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। জনাব হাই খান মূলত একজন সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ। নিজ খরচে তিনি বহু সমাজসেবা ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। শ্রীনগর কলেজের সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিনি ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে কলেজটির উন্নয়নে সময় ও অর্থ ব্যায় করে যান। তারই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সুফিয়া এ হাই খান সরকারী বালিকা বিদ্যালয়। এছাড়া শ্রীনগর পাইলট স্কুলের বিজ্ঞানাগার ও যন্ত্রপাতি তারই অর্থানুকুল্যে গড়ে উঠে। সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি স্যার জে. সি বোস স্মৃতি স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

জনাব খান বহু সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে সমাজসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি গ্রেটার গেন্ডারিয়া সমাজ সংঘ সমিতির সহ-সভাপতি ও নিকেতন সমাজসেবা মূলক সংগঠনের সভাপতি ও বিক্রমপুর-মুন্সীগঞ্জ সমিতির আজীবন সদস্য। এছাড়া বেশ কিছুদিন তিনি গেন্ডারিয়া মনিজা রহমান গার্লস স্কুলের সহ-সভাপতি ও মুন্সীগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

জনাব হাই খান পেশাগত কারণে আমেরিকা, লন্ডন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, মালয়েশিয়া ও ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সদালাপী ও দানশীল মানুষ। পারিবারিক জীবনে সফল পিতা। তার দুই ছেলে চার মেয়ের প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিক্রমপুরের মুখোজ্জল করেছেন।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী

বিশিষ্ট মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী ১৯৪১ সালে শ্রীনগর থানার পূর্ব দেউল ভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোহাম্মদ হাসেন আলী।

জনাব মোহাম্মদ আলী ১৯৬৮ থেকে মিষ্টান্ন ব্যবসার সাথে জড়িত থেকে বর্তমানে প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান 'মুসলিম সুইটস্' এর সেগুন বাগিচা, কাকরাইল, পল্টন ও মিরপুর ১০ নম্বর শাখার স্বত্ত্বাধিকারী। তিনি ঢাকা মহানগরী মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। পূর্ব দেউল ভোগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির আজীবন সদস্য ও সেগুন বাগিচা মসজিদে নূর জামে 'মসজিদে'র প্রাক্তন সম্পাদক।

মিজানুর রহমান সিন্‌হা

বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজ সেবক ও রাজনীতিক মিজানুর রহমান সিন্‌হা ১৯৪০ সালে বিক্রমপুরের লৌহজং থানার কলমা ইউনিয়নের ডহরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মরহুম হামিদুর রহমান সিন্‌হা, চাচা মরহুম হাবিবুর রহমান সিন্‌হা ও দাদা মরহুম আনছার উদ্দিন সিন্‌হা ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। মিজানুর রহমান ম্যাট্রিক পাশ করার পর নারায়ণগঞ্জ সরকারী তোলারাম কলেজে ভর্তি হন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ছাত্র রাজনীতি এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তোলারাম কলেজে পড়ার সময় তিনি তদানীন্তন ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত প্যানেলে ব্যাপক ভোটে ভি পি নিযুক্ত হন। তোলারাম কলেজ থেকে বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর তদানীন্তন হাবীব ব্যাংকে চাকুরীর মাধ্যমে তার চাকুরী জীবন শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপকসহ দীর্ঘ এগার বছর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৭৫ সালে তিনি চাকুরী জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে শিল্প বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে পদার্পন করেন। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান "দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড" এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠিত রপ্তানীমূলক পোষাক প্রতিষ্ঠান জে, কে, ফ্যাশন্‌স লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মিজানুর রহমান সিন্‌হা একজন সমাজসেবী হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত তাঁর নিজ থানা লৌহজংসহ সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ী এবং আশ পাশের অন্যান্য এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন। তিনি বিক্রমপুর সমিতি এবং

www.pathagar.com

বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের উন্নয়নমূলক কাজের পৃষ্ঠপোষক এবং স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার জনহিতকর ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘদিন যাবত সরাসরি ভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কর্মকান্ডের মধ্যে লৌহজং মহাবিদ্যালয়ের একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ, লৌহজং হাই স্কুলের ভবন নির্মাণ, কলমা এল, কে, উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, মেদিনীমন্ডল গার্লস কলেজে আর্থিক অনুদান, জশিলদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্থিক অনুদান, বালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ এবং স্কুলকে কলেজে উন্নীতকরণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান, বাসুদিয়া মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ, ইছাপুরা কলেজের ভবন নির্মাণ ও ইছাপুরা হাই স্কুলের দু'টি কক্ষ নির্মাণ, মালখানগর হাই স্কুলের ভবন নির্মাণ ও কম্পিউটার প্রদান, মালবদিয়া হাই স্কুলের ভবন মেরামতের কাজ, ব্রাহ্মণগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান, বালিগাঁও কলমা সড়ক নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান, কলমা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যুতায়ন ও পুকুর সংস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনাব সিনহা ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সীগঞ্জ-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বিগত দিনের বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি গত ১০ই অক্টোবর ২০০১ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

আহসান হাবিব খান কোহিনূর

বিশিষ্ট শিল্পপতি এ,টি,এম, আহসান হাবিব খান কোহিনুর ১৯৪৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী লৌহজং থানার কলমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলহাজ্জ আবদুল হামিদ খান।

তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৭২ সনে এল,এল,বি, কোর্স সমাপ্ত করেন।

তিনি যে সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রেখেছেন সেগুলো

(ক) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিঃ লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা প্রমিনেন্ট।

(খ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিঃ ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ইউথ ভলানটারী অরগানাইজেশন।

(গ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিঃ জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, মুন্সিগঞ্জ জেলা।

(ঘ) সভাপতিঃ মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি।

(ঙ) সেক্রেটারী জেনারেলঃ মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি-১৯৮৪।

www.pathagar.com

(চ) চেয়ারম্যানঃ কলমা এল,কে,হাইস্কুল, লৌহজং, বিক্রমপুর।

(ছ) ডিষ্ট্রিক্ট চেয়ারম্যানঃ লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল (১৯৮৪-১৯৮৬)।

(জ) জোন চেয়ারম্যানঃ লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল (১৯৮৭-১৯৮৮)।

(ঝ) ডেপুটি ডিষ্ট্রিক গভর্ণর-রিজিয়ন চেয়ারম্যানঃ লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল (১৯৮৯-১৯৯১)।

(ঞ) এডভাইজার টু দি ডিষ্ট্রিক্ট গভর্ণর, লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল (১৯৯২-১৯৯৩)

সমাজ সেবায় বিশেষ অবদান রাখর জন্য তিনি অনেক সংগঠন থেকে "স্বর্ণ পদক" লাভ করেছেন।

(ক) অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদ-১৯৮৫।

(খ) মাওলানা সাংবাদিক আকরাম খান স্মৃতি সংসদ-১৯৮৭।

(গ) বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি সংসদ-১৯৮৯।

(ঘ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গবেষণা পরিষদ-১৯৯২।

লায়নিজমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে জেলা ও আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব থেকে বহু "এওয়ার্ড" লাভ করেন। ব্যবসা প্রসারে, বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, জাপান, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, ব্যাংকক, ভারত, নেপাল ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য। তিনি ক্যাপিটাল বিল্ডারস লিঃ এর স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারী।

আজিজুল হক খান

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক আজিজুল হক খান লৌহজংয়ের নাগেরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ খান। তিনি শুধু শিল্পপতি এবং এককালের ছাত্র নেতাই ছিলেন না সমাজ সেবার অনন্য গুণটিও তিনি ধারণ করেছিলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় নেতা। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ এবং ১৯৬৫ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন। আজিজুল হক খান "খোদাই বাড়ী নূরজাহান খান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়" (তার মা), শ্রীনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের আব্দুল হামিদ খান ছাত্রাবাস, নাগেরহাট হামিদা পল্লী শিশু ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, মসজিদ, ক্লাব ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। দেশ বিদেশের বহু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা কেন্দ্রের সাথে তার ব্যবসা ও যোগাযোগ ছিল। বাংলাদেশের "আজিজ এন্ড কোম্পানী'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

আজহারুল হক ভূঁইয়া

আজহারুল হক ভূঁইয়া একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক। ব্যবসাস্থল চাঁদপুরে চক্ষু হাসপাতাল, বজ্রযোগিনীতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও শিশু হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ তাকে একজন সমাজসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি মেট্রোপলিটন হোটেলের স্বত্বাধিকারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের উন্নয়নমূলক কাজের সাথেও জড়িত।

আব্দুর রাজ্জাক খান

আব্দুর রাজ্জাক খান একজন সফল শিল্পপতির নাম। ১৫ই নবেম্বর ১৯৪৬ সালে লৌহজংয়ের কুমার ভোগ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব আব্দুল হাকিম খান। বিশিষ্ট এই শিল্পপতি রাজ্জাক টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর চেয়ারম্যান, ফনিক্স স্পিনিং মিলস্ লিঃ, আসোয়ান টেক্সাটাইল মিলস্ লিঃ এর ডাইরেক্টর, মডার্ন ড্রেস হাউজ, খান এন্টারপ্রাইজ ও রোজ প্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী। তিনি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ এর প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। এছাড়া তিনি রাসেল স্মৃতি সংসদের প্রেসিডেন্ট।

মোঃ ইসমাইল হোসেন

মোঃ ইসমাইল হোসেন ১৯৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস লৌহজং থানার দক্ষিণ সিংহেরহাটি (কোরহটি) গ্রাম। পিতার নাম একিন সারেং। তিনি আজাদ এন্ড কোম্পানী লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও এবি বিস্কুট কোম্পানী লিঃ ও আজাদ এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিমিটেডের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর।

আবুল হায়াত খান

আবুল হায়াত খান ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম তোরাফ খান। তিনি বিএ পাশ করে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি আল আমিন সাইজিং মিলস্ লিঃ এর চেয়ারম্যান। এছাড়া ডোরা, চয়েস ফুল গার্মেন্টস, মিনি কর্ণার এবং কমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর স্বত্বাধিকারী। হায়াত সুপার মার্কেটের তিনি মালিক। নূর ম্যানশন বণিক সমিতির তিনি প্রেসিডেন্ট, ইসলাম ম্যানশন ব্যবসায়ী সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব ঢাকা মেট্রোপলিটন সোপ ওনার্স এসোসিয়েশনের তিনি ট্রেজারারও। এ যাবত তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

মোফাজ্জল হোসেন

মোফাজ্জল হোসেন খোকার জন্ম মুন্সীগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে। পিতা আবুল হাশেম। মোফাজ্জল হোসেন বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স-এর স্বত্বাধিকারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত আছেন। বর্তমানে টেক্সটাইল মিল এবং

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি নির্মাণের বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে অবদান রাখছেন।

মুহাম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ

জনাব মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ ১৯৫১ সালের ২৯শে আগষ্ট ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে বি এসসি পাস করে কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ২নং সেক্টরের অধীনস্থ বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানা কমান্ডার হিসাবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত উদ্যেগী তরুণ শিল্পপতিদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

তিনি কোন অবস্থাতেই রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িত না রেখে নিম্নলিখিত শিল্প-কারখানা গড়ার পাশা-পাশি সামাজিক ও ক্রিড়া সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন।

১। একজন নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে তার জীবনের সবচেয়ে সফল সংযোজন ১৯৯৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে দেশে সর্ব প্রথম অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে পাঁচটি জেলা থেকে একই সাথে স্বাতন্ত্র্য নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট বর্তমানে সর্বাধিক প্রচারিত ও সর্বজন প্রিয় দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা; যা আজ দেশের একটি যুগান্তাকারী পদক্ষেপ হিসাবে সর্বমহল কর্তৃক স্বীকৃত সত্য।

২। বর্তমানে বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার নির্বাহী সদস্য।

৩। তিনি বিক্রমপুরের লৌহজং মহাবিদ্যালয়ে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত পরিচলানা পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

৪। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেসনের সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন।

৫। ১৯৮৪-৮৬ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের সহ-সভাপতি ও ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

৬। তিনি সাফল্যের সাথে জাপানের কারিগরী সহযোগিতায় (ক) ১৯৭৮ সালে গ্লোব ইনসেকটিসাইডস লিঃ নামে দেশের প্রথম মশার কয়েল প্রস্তুত করার শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। (খ) ১৯৮৬ সালে গ্লোব ইএমকে এন্ড ম্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ নামে মশা নিবারণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ম্যাট ও ইলেকট্রিক ডেষ্ট্রয়ার প্রস্তুতের দ্বিতীয়

www.pathagar.com

শিল্প-কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন। (গ) ১৯৮৮ সালে গ্লোব এ্যারোসল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামে মশা-মাছি নিবারনের তৃতীয় শিল্প-কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৯০ সালে গণচীনের কারিগরী সহযোগিতায় গ্লোব মেটাল কমপ্লেক্স লিঃ নামে আরো একটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মাধ্যমে তিনি নিজস্ব সাংগঠনিক মেধা ও প্রশাসনিক দক্ষতার গুণে প্রতি বছর দেশের প্রায় ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছেন এবং দেশে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে অদ্যাবধি প্রায় ১২০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

নবদ্বীপ ঘোষ

রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতন। ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ, ঘন্টাতলা, উত্তরায়ন, ব্ল্যাক হাউজ, তালধ্বজ, গৌরপ্রাঙ্গন, কলাভবন, নাট্যঘর, সুজাতা, বালের বাশী, গোয়ালপাড়া, প্রান্তিক, খোয়াই, কোপাই এর মতোই দ্রষ্টব্য স্থান কালুর দোকান বা 'নবদ্বীপ' ইত্যাদিও। কালুর দোকান অমর্ত্য সেন এর আড্ডার স্মৃতি বহ। 'কালুর দোকান' আর 'নবদ্বীপ' দুই'ই রতনপল্লীর সমাবেশ স্থল বলা যায়। অবনপল্লী, পিয়ারসন্সপল্লী, পূর্বপল্লী, দক্ষিণপল্লী, গুরুপল্লীর মতো রতনপল্লী যাননি এমোনটি সচরাচর হবার নয়। দুপুর, রাত কিংবা বিকেলে খাবার তল্লাশে রতনপল্লীর 'নবদ্বীপ' খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। "সারবাঁধা সাইকেল আর আরোহীর সমারোহ, থালা বাসনের শব্দ, দই, মিষ্টি বা ভাত তরকারীর জন্য হাক ডাক আর নানা ভাষাভাষীর আড্ডায় মুখরিত সারাক্ষণ নবদ্বীপ মিষ্টান্ন ভান্ডার এর চত্বর।

প্রত্যহ তিন বেলা খাবার, ধার কর্জ দুদন্ড জিরিয়ে নেয়া চলে নবদ্বীপকে ঘিরে। বিশেষত শান্তি নিকেতন পড়ুয়া বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়া দাওয়া, আপদ বিপদ আর উপদেশ সহযোগিতার নির্ভরযোগ্য আশ্রয় 'নবদ্বীপ'।

নতুন কে এল, গেল, কার বাড়ি ভাড়া চাই, খাবার চাই, অর্থ সাহায্য চাই, বর্ডারে পৌঁছে দিতে হবে, কার ডাক্তার চাই ইত্যাকার প্রয়োজনে স্ব-নিয়োজিত নবদ্বীপ।

মুখে পান, ব্যস্ত-মধ্যবয়সী, সুঠাম যুবা নবদ্বীপ ৭ বছর বয়সে পাড়ি দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ। তারপর থেকে কৈশোর, যৌবন পেড়িয়ে এখোন মধ্যবয়সী যুবা। কাধে দই এর ভাড় নিয়ে কিশোর নবদ্বীপ চিনেছিলেন অভিবাসীদের জীবন তথা টিকে থাকার সংগ্রামকে। ভাত নয় রুটি, ডিমের ঝোল নয় ভাজি, তাৎক্ষণিক আবদার দ্রুত হাতেই সারেন তিনি। কখনো ডেকে খোঁজ নেন পূর্ব পরিচিতের, পড়াশুনার, পকেটের খোঁজখবরও। সব মিলিয়ে নবদ্বীপ অনেকেরই প্রিয় জায়গা। চায়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে আড্ডার মুখর সংলাপে চেনা অচেনা জনের ভীড়ে সরগরম 'নবদ্বীপ মিষ্টান্ন ভান্ডার' আর নবদ্বীপ

www.pathagar.com

ঘোষ সমার্থক আজ। কোরিয়ান সান্‌জু, ভূটানের সোনম দর্জি, মরিশাষের বিশাল, অস্ক্রের রবি আর ইংল্যান্ডের আইজায়া বা বাংলাদেশের কনক মতীদের দেখা মেলে এখানেই। ধর্ম, বর্ণ ভাষা দেশ আর নানা ভবন আর পাঠ কার্যক্রমের এমনকি আশ্রমবাসীদের পদচারনা যাতায়াত সর্বদা এই নবদ্বীপকে ঘিরে।

রতন পল্লীর এই নব দ্বীপ মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী নবদ্বীপ ঘোষ জন্মে ছিলেন বিক্রমপুরের শ্রীনগরে।

সুকুমার রঞ্জন ঘোষ

বিশিস্ট চলচিত্র ব্যক্তিত্ব দক্ষ সংগঠক ও সফল ব্যবসায়ী সুকুমার রঞ্জন ঘোস ১৯৫২ সালে শ্রীনগরে জন্মগ্রহন করেন। বাবার নাম বরদা কাণ্ড ঘোষ।

সুকুমার রঞ্জন ঘোষ দেশের একজন প্রথম সারির ব্যবসায়ী। তিনি ঔষধ আমদানীকারক ও পাইকারী বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সিটি ষ্টোরের সত্ত্বাধিকারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ আমদানীকারক, বিপনন ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান সিটি ওভারসিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এছাড়া ভারতের সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ও বাংলাদেশের ওভারসীজ লিঃ এর ৫ (পাঁচ) মিলিয়নমার্কিন ডলার যৌথ বিনিয়োগকৃত প্রস্তাবিত ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ সান ফার্মা বাংলাদেশ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত চলচিত্র প্রতিষ্ঠান আনন্দ সিনেমা লিঃ এবং ঝুমুর থিয়েটার হাউজ এর চেয়ারম্যান।

সুকুমার রঞ্জন ঘোষ একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শ্রীনগর থানা কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য।

ব্যবসা ক্ষেত্রেও তিনি বহু সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। এর মধ্যে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীর পরিচালক, ষ্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভলপমেন্ট, এফ, বি,সি, আই,এর চেয়ারম্যান, সার্ক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্টির সদস্য, বাংলাদেশ ভারত চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ চলচিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় আওতাধীন ঔষধ আমদানী ষ্টান্ডিং কমিটি ও ঔষধ মূল্য নির্ধারন কমিটির সদস্য। বাংলাদেশ চলচিত্র, প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির সর্দস্য, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইম্পোটার্স এসোসিয়েশনের সদস্য, বাংলাদেশ চলচিত্র আমদানী সমিতির সদস্য, ও সি এন্ড এফ এজেন্ট সমিতি, ঢাকা কাষ্টমস এয়ার ফ্রেট ইউনিট এর সদস্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সময়কাল বাংলাদেশ

www.pathagar.com

কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং ১৯৮১-১৯৯২ পর্যন্ত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করে। এক সময় তিনি বাংলাদেশ চলচিত্র পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ চলচিত্র প্রয়োজক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বরত আছেন। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত মুন্সীগঞ্জ-১ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

হারুন উর রশিদ

আলহাজ্ব মোঃ হারুন উর রশিদ ১৯৫২ সালে লৌহজং থানার কলমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলহাজ্ব মোঃ ঈমান আলী। তিনি এস. এস. সি. পাশ করার পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় শিল্প বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস্ ও সাজ ট্রেডিং কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এছাড়া তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সহায়তা দানকারী হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। তিনি ঢাকা চেম্বারের সদস্য, ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য। তিনি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিল্ এন্ড পাওয়ার লুম ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য। তার অক্লান্ত পরিশ্রমেএশিয়ান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ বর্তমানে বাংলাদেশে একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান। শুধু দেশের চাহিদা নয় বিদেশেও এর চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তিনি শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

উল্লেখ্য এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস্ ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় একাধিক বার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

জি এম ফারুকউজ্জামান

মরহুম জি এম ফারুকউজ্জামান ১৯৫৪ সালে টঙ্গিবাড়ী থানার দীঘির পাড়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম সরব আলী মিয়া। ১৯৭৯ সালে ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করে অচিরেই কয়েকটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সুনাম অর্জন করেন।

(ক) স্যামসন্স লিমিটেড, (খ) স্যামসন্স ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, (গ) স্যামসন্স ওয়েল্ডিং এন্ড ইলেকট্রোডস্ লিঃ, (ঘ) স্যামসন্স সুয়েটার্স লিঃ, (ঙ) বাং চীন পাওয়ার টিলার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচারক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর পরিচালক ছিলেন। তিনি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে এক

www.pathagar.com

সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। তার অবর্তমানে তার যোগ্য সহধর্মিনী মারিয়া জামান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশুনা করছেন এবং একজন মহিলা শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে যোগ্য দক্ষ করে গড়ে তুলছেন।

মোঃ মোবারক হোসেন

সফল ব্যবসায়ী, দক্ষ সংগঠক ও দরদী সমাজসেবক লায়ন মোঃ মোবারক হোসেন ১৯৫৪ সনের ২৩ জুন লৌহজং থানার দিঘলী গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা মৃত মনির উদ্দিন বেপারী। মাতা আলহাজ্ব মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন।

চাকুরী দিয়ে কর্ম জীবনের শুরু হলেও অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা ও দক্ষতা দিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শুধু একজন সফল ব্যবসায়ী নন। তার প্রধান পরিচয় তিনি একজন সমাজ সেবক। নিঃস্বার্থ সমাজ সেবাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। যখনই সময় পান তিনি ছুটে যান অসহায় মানুষের পাশে। সমাজের গরীব দুঃখী মানুষের কষ্ট বেদনার পাশে দাঁড়িয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে তিনি আনন্দ পান। সদা হস্যোজ্জল, সদালাপী এবং স্বভাবে প্রানবন্ত এই ব্যক্তির দানশীলতার জন্য শুধু এলাকাবাসীই নয়, দূরদুরান্তের লোকজনও তাঁকে 'একালের মহসীন' বলে অভিহিত করে থাকেন। মানসিক মানবিক তাড়নায় তিনি জড়িত হয়েছেন অসংখ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবী ও গবেষণামূলক সংগঠনের সাথে। সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিশ্বের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'লায়ন্স ক্লাবস্ ইন্টারন্যাশনালে'র সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা প্যারাডাইস-এর প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে জেলা-৩১৫ বি-২ বাংলাদেশ-এর রিজিয়ন চেয়ারম্যান এবং 'লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ লায়ন্স ফাউন্ডেশন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি সহ অসংখ্য সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আজীবন সদস্য। তিনি সিটি ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি, শিশু সংগঠন নোঙর খেলাঘর আসর, বিক্রমপুর জনকল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টাস এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা। একটি দায়িত্বশীল সামাজিক সংগঠন 'ইয়াং ফিফ্টি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি অগণিত সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক সংগঠনের নেপথ্য সংগঠক, পৃষ্ঠপোষক ও দাতা। এসকল পবিত্র কর্মকাণ্ডে প্রেরণা দাত্রী হিসাবে সর্বদা সাহস ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন তার সহধর্মীনি মোসাম্মৎ আছিয়া খাতুন বুলু ও তার সন্তানেরা।

www.pathagar.com

জনাব মোবারক হোসেন ছোট বেলা থেকেই বেড়ে উঠেছেন শিল্পমনা সাহিত্যসেবী সংস্কৃতিপ্রেমী ও ক্রীড়ানুরাগী হিসেবে। স্কুল জীবনে অনেকবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছেন। এক সময় তিনি মঞ্চ নাটকের সাথেও ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। তার অভিনিত মঞ্চ নাটক 'এজন মুন্সীর পোষ্টার', শতাধিক বার মঞ্চস্থ হয়েছে। এছাড়াও তিনি নাট্য সংগঠন 'নাট্য ফৌজ' এর কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অসংখ্য মঞ্চ নাটকে অভিনয় করে দর্শক মহলে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

এলাকার কৃতি সন্তান হিসেবে তিনি তার জন্মস্থানে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, এতিমখানা সহ স্থানীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে থাকেন।

শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি লন্ডন, আমেরিকা, চীন, জাপান, কোরিয়া হংকং, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভারত, পাকিস্তান, মেকাও, মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া, নেপাল বার্মাসহ পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমন করেছেন।

সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৯৮ সালে পালক অ্যাওয়ার্ড', ২০০০ সালে রঙ্গীলা নিত্যকলা একাডেমী কর্তৃক 'গোল্ড মেডেল' অ্যাওয়ার্ড এবং বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টাস এসোসিয়েশন কর্তৃক 'কালচারাল রিপোর্টাস অ্যাওয়ার্ড ২০০০ এবং অতি সম্প্রতি কলকাতা থেকে 'চোখ সাহিত্য সম্মাননা' এবং জাতী সংঘের সহযোগী জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'কমিটমেন্ট পদক ২০০০' অর্জন করেন।

অতি সম্প্রতি তাঁর সার্বিক কর্মের ব্যাপকতা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, মানবিকতা বোধের কারণেই জাতীয় উন্নয়ন ও গবেষণামূলক সংগঠন 'জ্ঞান চর্চা ও প্রতিভা মূল্যায়ন কেন্দ্র' তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে মনোনিত করেছে।

সামসুল আলম (সবজল)

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক সামসুল আলম সবজল ১৯৫৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী শ্রীনগর থানার চারিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করে ব্যবসা শুরু করেন। শ্রম ও আন্তরিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন আইডিয়াল টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, দর্পন এন্টারপ্রাইজ, আর এ এন্টারপ্রাইজ এবং এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তিনি ভাগ্যকুলের হরেন্দ্র লাল উচ্চ বিদ্যালয়ের গরীব ও মেধাবী ছাত্রীদের প্রতিবছর আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছেন। এছাড়া তিনি বহু মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে ওঠার

www.pathagar.com

জন্য নীরবে নিভৃতে সাহায্য করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য তিনি ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে জাপান গমন করেন।

মোহাম্মদ আফজল হোসেন

বিশিষ্ট শিল্প ব্যক্তিত্ব মোঃ আফজল হোসেন ১৯৫৮ সালের ২ জানুয়ারি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব আব্দুল মোতালেব ঢালী। তাঁর গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরের লৌহজং থানার কড়ারবাগ গ্রামে।

জনাব আফজল হোসেন ১৯৭৮ সালে ব্যবসা শুরু করে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মেধা, শ্রম ও নিজ দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির মালিক হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক বলয় পর্যন্ত পরিচিত হয়েছেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরন্তর অবদান রেখে যাচ্ছেন।

মোহাম্মদ আফজল হোসেন সানসিল্ক ফেব্রিক্স লিঃ ও সুপার ফেব্রিক্স, সানসিল্ক ট্রেডিং সোসাইটি ফেব্রিক্স এর সত্ত্বাধিকারী। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল ওনার্স এসোসিয়েশনে ও মাস্টার আবদুর রহমান একাডেমির জেনারেল সেক্রেটারি, আহ্সান মঞ্জিল সুপার মার্কেট বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক, সিরাজদিখান শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্টের আজীবন সদস্য ও ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য।

বাণিজ্যিক কাজে জনাব আফজল হোসেন জাপান, ভারত, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, কোরিয়া, হংকং, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড, আমেরিকা, ইটালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও বন্ধুবৎসল স্বভাবের। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিজ এলাকায় তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সুনাম অনেকটা কিংবদন্তীর মতো। উল্লেখ্য সমাজ সেবায় বিশেষ ভূমিকা রাখায় ১৯৯৫ জাসাস পুরস্কারে ভূষিত হন।

মোঃ বেলায়েত হোসেন ঢালী

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বেলায়েত হোসেন ঢালী ১৯৫৬ সালে শ্রীনগর থানাধীন বাসাইলভোগ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার বাবার নাম আব্দুল খালেক ঢালী।

মেধা, পরিশ্রম, ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। ড্রীম টেক্সটাইল তারই হাতে প্রতিষ্ঠিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

জনাব বেলায়েত হোসেন ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত রয়েছেন। প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজ এলাকায় মসজিদ নির্মাণ, এলাকার রাস্তাঘাট ও স্কুল কলেজের সংস্কার সাধনে তার আর্থিক অনুদান, শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যায় দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরন তার উল্লেখযোগ্য সেবামূলক কাজ। এছাড়া মুন্সিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও শ্রীনগর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

জনাব ঢালী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন ভারত, সিংগাপুর, ব্যাংকক, মালয়েশিয়া ও জাপান ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সদালাপী ও হাসিখুশী মানুষ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত।

মোঃ মিজানুর রহমান দুলাল

বিশিষ্ট শিল্পপতি ও তরুণ সমাজ সেবক মোঃ মিজানুর রহমান দুলালের বাড়ি শ্রীনগর থানার হোগলাগাঁও গ্রামে। ১৯৫৮ সনে তার জন্ম। বাবার নাম শাহজুদ্দিন শেখ।

জনাব মিজানুর রহমান ষোলঘর এ,কে,এস,কে হাই স্কুল থেকে এস, এস,সি ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয় থেকে এইচ,এস,সি ডিগ্রী নেয়ার পর পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি ব্যবসায়ীক সাফল্য লাভ করে বর্তমানে একজন শিল্প ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ডি.এন টেক্সটাইল, ভিক্টরী টেক্সটাইল, বিক্রমপুর প্লাজা ও সুইটেক্স তারই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান।

জনাব মিজানুর রহমান দুলাল শুধু মাত্র শিল্পপতিই নন একজন সমাজ সেবক হিসাবেও তার ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। এলাকার মুসল্লিদের সুবিধার্থে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এবং একই পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকার শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৯৭ সনে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎশাহী হিসাবে নির্বাচিত হন। এছাড়া এলাকার রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ উন্নয়নেও তার প্রশংসিত ভূমিকা রয়েছে।

মোহাম্মদ ইউনুস

মোহাম্মদ ইউনুস ১৯৫৮ সালের ২৫ জানুয়ারী বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব আবদুস সোবহান। শিক্ষা জীবন শেষ করে মাত্র ২২ বছর বয়সে বি এস আর এস এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের অন্যতম কোল্ড ষ্টোরেজ সোবাহান আইস এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপন করেন এবং তিনি এর চেয়ারম্যান। ইউনুস ফিলামেন্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ইউনুস প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এছাড়া অরিক্স পলিমার লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিভিসি পাইপ

www.pathagar.com

ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত। এছাড়া তিনি এফবিসিসিআই এর কনিষ্ঠতম সদস্য।

স্বপন কুমার ঘোষ

স্বপন কুমার ঘোষ বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার নাগরনন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রমেশ চন্দ্র ঘোষ। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। বিশ বছর যাবত মিষ্টান্ন শিল্প ব্যবসার সাথে জড়িত। বিক্রমপুর ডেইরী (প্রাঃ) লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'তৃতীয়ধারা' পত্রিকার পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে দু'বছর দায়িত্ব পালন করেন। জনাব স্বপন বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বাংলাদেশ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির যুগ্ম সম্পাদক, কলাবাগান ক্রীড়া চক্রের সদস্য, ঢাকা লায়ন্স ক্লাব নং ৩১৫ বি-১ এর পরিচালক, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এর সদস্য। এ যাবত তিনি ব্যবসায়িক কাজে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ প্রতিবেশী বেশ কিছু দেশ বেশ ক'বার ভ্রমণ করেছেন।

মোঃ আনোয়ার হোসেন

একজন সফল ব্যবসায়ীর নাম আনোয়ার হোসেন। তিনি বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি ও বিপণনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। 'কার হাউস লিমিটেড'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেনের গ্রামের বাড়ি লৌহজং থানার সিংহেরহাটি গ্রামে। তিনি শুধু একজন সফল ব্যবসায়ীই নন, সমাজসেবক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ব্যাপক। বর্তমানে তিনি লৌহজং-এর ব্রাহ্মণগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতিসহ অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে সমাজ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

জনাব আনোয়ার হোসেন ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

জহিরুল ইসলাম টিপু

জহিরুল ইসলাম টিপু একজন সফল ব্যবসায়ী। মুন্সিগঞ্জ থানার বানিয়াল গ্রামে তার জন্ম। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি ঢাকা স্টেডিয়াম মার্কেটে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা শুরু করেন। অসাধারণ মেধা ও শ্রম দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ব্যবসা সম্প্রসারণ করে দেশের একজন প্রথম সারির ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রিটু ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ অব কোম্পানিজ, বিশ্বের ১৩টি দেশে রয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের ওভারসিজ অফিস। শিপিং, পোশাক, ট্রাভেল, ইলেকট্রনিক্স, এয়ারকার্গো এর প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর দক্ষ পদচারণা।

www.pathagar.com

তাজুল ইসলাম ঢালী

আলহাজ্ব তাজুল ইসলাম ঢালী ১৯৬০ সনে লৌহজং থানার কড়ারবাগ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম আলহাজ আব্দুল মোতালেব ঢালী। শ্রম, মেধা, মননশীলতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে তিনি একজন বিশিষ্টি শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন ।

বাল্যকাল হতেই স্বাধীন স্বত্তার অধিকারী জনাব ইসলাম ব্যবসা ও সমাজ সেবার মনোভাব লালন করে বড় হতে থাকেন এবং পরবর্তীতে স্কুল কলেজের লেখাপড়া শেষ করে তার অগ্রজ আলহাজ্ব আব্দুল সাত্তার সাহেবের সাথে বস্ত্র ব্যবসায় নিজেকে নিয়জিত করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সততা ও একাগ্রতার ফলে তিনি প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র ব্যবসায়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি ফারজানা ফেব্রিক্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন এবং নানাবিধ নুতন নুতন বস্ত্রের উদ্ভাবনের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

ট্রেডিং এর পাশাপাশি তিনি অনুভব করেন কেবল মাত্র ট্রেডিং দ্বারা দেশ ও জাতির প্রতি কোনরূপ অবদান রাখা সম্ভব নয় । তাই তিনি মনোনিবেশ করেন শিল্প স্থাপনে। ১৯৯৩ সনে প্রতিষ্ঠা করেন এইচ ,এইচ, টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। প্রাথমিকভাবে উইভিং দিয়ে শুরু করে পরবর্তীতে সংযোজন করেন অত্যাধুনিক ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং মেশিনারীজ এবং রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবেশ করে উৎপাদিত ১০০% বস্ত্র রপ্তানী করতে শুরু করেন এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে গুন মান ও সঠিক সময়ে সরবরাহের সফলতার ফলে বিশ্বের বাজারে স্থান করে নিতে সক্ষম হন। স্থানীয় পোষাক শিল্পের মাধ্যমে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডায় বিস্তার করে বিরাট বাজার। উত্তোরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে তিনি আরও সম্প্রসারনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় ১২০০ শ্রমিক-কর্মচারী তথা তাদের পরিবারের রুটি রুজির ব্যবস্থায় সহায়তা তথা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজকে এক সহায়ক ভূমিকা রাখছেন। ফলশ্রুতিতে বেকার সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি দেশ ও জাতির উন্নয়নে তিনি যে ভূমিকা পালন করছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব ইসলাম ৪ (চার) সন্তানের জনক। এবং নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত এবং নিজ এলাকায় স্কুল মাদ্রাসা ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়া ও আর্থিক সাহায্য করা তাঁর একমাত্র পরিতৃপ্তি।

ব্যবসার উদ্দেশে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি একজন প্রভূতপন্নমতিত্ব সম্পন্ন সদালাপী সংস্কৃতিবান শিল্পপতি।

www.pathagar.com

শাহজাহান বাচ্চু

প্রকাশনা জগতের পরিচিতি ব্যক্তিত্ব শাহজাহান বাচ্চু ১৯৬০ সালে সিরাজদিখান থানার কাকালদি গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মন্তাজ উদ্দিন মিঞা।

দীর্ঘদিন জাপান থাকার পর দেশে ফিরে তিনি প্রকাশনা ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন এবং শুধুমাত্র কবিতার বই প্রকাশ করার মত একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেন। উল্লেখ্য বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে একমাত্র কবিতার বই প্রকাশনি সংস্থা 'বিশাকা প্রকাশনী' তারই হাতে গড়ে উঠা একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। যেখান থেকে নবীন-প্রবীন মিলিয়ে এযাবত-দু'শর বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে। তার এ সাহসী উদ্যোগের উপর দেশের প্রায় প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে জড়িত। বর্তমানে তিনি বিক্রমপুর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি।

মোঃ আকরাম হোসেন

মোঃ আকরাম হোসেন ১৯৬৫ সনে সিরাজদিখান থানার অন্তর্গত মধ্যপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুর রশীদ মিঞা জনতা ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

জনাব মোঃ আকরাম হোসেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক হিসেবে ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি লায়ন্স ক্লাব অব Dhaka Fedsa এর President, District Chairman of Lions District 315B, Bangladesh. B L F এর Life member এছাড়া Bangladesh Australia Friendship Association এর একজন সম্মানিত সদস্য। উল্লেখ্য জনাব আকরাম হোসেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন সফল ব্যবসায়ী। তার প্রতিষ্ঠান ওয়াভার অপটিকস গুণগত মানের জন্য '৯৮ সনে অনুষ্ঠিত প্যারিস ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড পদক লাভ করে।

ব্যক্তিগতভাবে জনাব আকরাম একজন সমাজসেবক, সংগঠক, সদালাপী ও বিনয়ী স্বভাবের একজন মানুষ।

সিরাজুল ইসলাম খান

সিরাজুল ইসলাম খান বিক্রমপুরের কামারগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই সালে আইনশাস্ত্রে স্নাতক হন। তিনি আলু উৎপাদন, কর্ষণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে হল্যান্ডে এক সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ও সেখান থেকে ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। তিনি এলাইড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অরিয়েন্টাল আইস ফ্যাক্টরী লিঃ এর পরিচালক ও ইউনাইটেড গ্যাস লিঃ-এর পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তিনি লায়ন্সের ঢাকা প্রিমিয়ারের সভাপতি।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির

বিশিষ্ট সমাজ সেবক, সংগঠক ও শিল্পপতি হুমায়ুন কবির লৌহজং থানায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের শিশু কিশোর আন্দোলনের সাথেও জড়িত তিনি। শাপলা দোয়েল-এর সভাপতি। ইউনিসেফের সহযোগিতায় শাপলা দোয়েল শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করে সুনাম কুড়েয়েছেন। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণে এ সমাজসেবী অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি ঢাকা জেলা রোভার স্কাউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, হাবীব জামান কলেজ উন্নয়ন পরিষদের অন্যতম সদস্য, ইব্রাহিমপুর অগ্রণী বয়েজ ক্লাব ও সৃজনী ক্লাবের সভাপতি, মাদক বিরোধী সংগঠন লাইফ এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, মিরপুর ক্রীড়া চক্রের উপদেষ্টা, তারণ্য শিল্পী গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান। সমাজসেবা মূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন সংস্থা থেকে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

লুৎফর রহমান

লুৎফর রহমান একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। তার জন্ম শ্রীনগর থানার মুড়াপাড়া গ্রামে। পিতার নাম মতিউর রহমান। তিনি তার মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছেন লীনা টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড এবং কে, এল, রহমান এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই তিনি চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাছাড়া শ্রীনগরে মুড়াপাড়ার কাছেই রোকেয়া ডাইং ফিনিসিং ইন্ডাষ্ট্রি কোং লিঃ প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করছেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আ লো কি ত

বিক্রমপুর

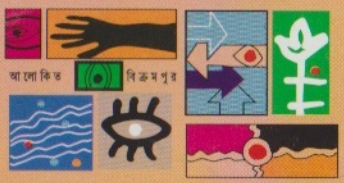

আলোকিত বিক্রমপুর